[আমাদের ছুটি - ১৫শ সংখ্যা]

ডাল লেক, কাশ্মীর - আলোকচিত্রী- শ্রী অরূপ চৌধুরী

বেড়ানোর কথা আর ছবি নিয়ে বাংলা ই-ম্যাগাজিন

আমাদের বাংলা | আমাদের দেশ | আমাদের পৃথিবী | আমাদের কথা

~ ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা - বৈশাখ ১৪২২ ~

মেয়ের ক্লাস টেনের বোর্ড পরীক্ষার পর কুয়াশামাখা দার্জিলিং-এ কয়েকটা দিন কাটিয়ে এসে 'আমাদের ছুটি'র কাজ শুরু করতে বেশ দেরিই হয়ে গেল এবার। ম্যালের পিছন দিকে রাজভবনের কাছে খাদের গায়ে আমাদের হোটেল। বেরিয়ে বাঁহাতে পায়ে চলার পথ গিয়েছে একেবারে ম্যাল পর্যন্ত। নির্জন রাস্তায় মাঝে মাঝে ভিউপয়েন্টে বসার ব্যবস্থা। সন্ধ্যেবেলায় হোটেলে ফেরার পথে নেমে আসত গাঢ় কুয়াশা, সারা শরীরে বুলিয়ে দিত সিক্ত আদর। হঠাৎ লাইটপোস্টের আলোয় আরও মায়াবী সে, অপার্থিবও। মনে হত পথ আর খাদের সীমা মুছে গিয়েছে - যেন ওই কুয়াশায় ভেসে যেতে পারি অনেক গভীরে কোথাও।

আমার অভিধানে ভ্রমণ শব্দের অর্থ নিয়ত পরিবর্তনশীল - একটা অনুভব। ভ্রমণ আনন্দ, ভালবাসা, দুঃখ এমনকী প্রতিবাদও বয়ে নিয়ে আসে। কেমন করে দেখব, কী অনুভব করব - আমার ভ্রমণ একেবারেই তাই। এই সংখ্যায় তেমন কিছু অন্যরকম ভ্রমণের কথা বলেছেন অরূপ, কাঞ্চন, শুদ্ধসত্ত্বেরা তাঁদের 'অন্য ভ্রমণ'-এ। 'আরশিনগর'-এ শ্রাবণীর লেখাও ভাবায় বৈকী। এইসব নানা কিছু ভাবার পাশাপাশি নিজের ছোটবেলা নিয়ে লিখছিলাম একটি পত্রিকার জন্য। লিখতে লিখতে নিজের শিকড় খোঁজার অনুভূতিটা আবার করে তীব্র হল। আমার ছেলেবেলার রূপনারায়ণপুর, ছবির মত স্টেশনটা, ছেলেবেলায় না-ওঠা সেই পাহাড়টা, চেনা ধানক্ষেত, বাড়ির সামনের সেই ঘোড়ানিম গাছটা, চেনা মুখগুলো, চোখে ঝিমধরা রোদ্দুর, ঝমঝম বৃষ্টি আর লেপমোড়া হু হু ঠাণ্ডা। ইচ্ছে হল হঠাৎই একদিন বেরিয়ে পড়ি সেইসবের খোঁজে। কিন্তু আমার শিকড় বোধহয় কোথাও সবটুকু নেই। ছেলেবেলায় রাসবিহারী এভেনিউ-এর উপর গেস্ট হাউসের বারান্দা থেকে দেখা কলকাতার ঘুম-ভাঙা সকাল, চায়ের ভাঁড়ে মাটির গন্ধ, শীতের সবুজ ময়দানে সাদা পোশাকে ক্রিকেটারের দল, শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে ঘোড়ায় চড়া নেতাজি, বাবার সঙ্গে ধর্মতলায় আমিনিয়ার বিরিয়ানি অথবা প্রথম চার্লি-চ্যাপলিনের সিনেমা দেখা লাইট হাউসে, ময়দানে বইমেলা, হাওড়া-শিয়ালদহ স্টেশন থেকে দূরপাল্লার ট্রেনে হোল্ড-অল-জলের কুঁজো সমেত পাড়ি দেওয়া। কিংবা তাও না - বাবা-মায়ের কাছে বারবার শোনা বাংলাদেশের কথা - ঢাকায় বাবার মামাবাড়ি কিম্বা মায়ের চট্টগ্রামের মহামুনি পাহাড়। শপিং মল, মাল্টিপ্লেক্স, বুটিক রেস্তোঁরা, আইপিএল-এর এই কলকাতার পথে আজ আর ছেলেবেলার স্মৃতি মেলাতে পারিনা, জানি আজন্মের চেনা রূপনারায়ণপুরও বদলে গেছে একেবারেই। হয়তোবা পরিচিত মুখগুলোকেও চিনতে পারব না আর। বাংলাদেশে যাব অনেকদিন থেকেই ভাবছি। বাবা-মায়ের চেনা বাংলাদেশ, আমার অনুভূতির বাংলাদেশ হয়তো খুঁজে পাব না, সে দেশে এখন পথে পড়ে থাকে অভিজিত-ওয়াশিকুর-অনন্তবিজয়দের ছিন্নভিন্ন লাশ। তবু শিকড় খোঁজা, সেও এক ভ্রমণ আমার।

ভূমিকম্পে গত কয়েকদিনে বারবার কেঁপে উঠছে মাটি। মারা গেছেন বেশ কয়েক হাজার মানুষ ছোট্ট ওই নেপাল দেশটায় - গুঁড়িয়ে গেছে দরবার স্কোয়ার, ধরহরা মিনারের মত প্রাচীন স্থাপত্য। অজস্র মানুষ সর্বস্ব হারিয়ে আজ পথের বাসিন্দা। ট্যুরিজম নির্ভর অর্থনৈতিক কাঠামোতে ভ্রমণ, ট্রেকিং, পর্বতারোহণ সবই এখন অনিশ্চিত। অভিষেকের অন্নপূর্ণা বেসক্যাম্প ট্রেকিং-এর লেখা পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল নেপালের সেই দিনগুলো কবে ফিরবে? সব-হারানোর পরও স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে আসতে ত্রাণের পাশাপাশি কতটা মনোবল দরকার মানুষের?

এমন দিনে ভ্রমণে আনন্দ খুঁজে পাওয়াটা খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে। তাই ভ্রমণকে নিয়েই একটু অন্যরকম ভাবনা বারবার ভাবতে চাইছি, পৌঁছে দিতে চাইছি 'আমাদের ছুটি'-র পাঠকদের কাছে। গত চার বছর ধরে চলছে সেভাবেই পথচলা। এবারে পঞ্চম বর্ষের হাঁটা শুরু হল।

- দময়ন্তী দাশগুপ্ত

এই সংখ্যায় -

জীবনে প্রথমবার ট্রেকিং করতে গিয়ে ঘুরেছিলেন হেমকুণ্ড, ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স, বদ্রীনারায়ণ, মানা, বসুধারা, ত্রিযুগী নারায়ণ, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী-গোমুখ ও যমুণোত্রী। ফিরে এসে ডায়েরির পাতায় লিখে রেখেছিলেন ভ্রমণের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার কথা।

- সুবীর কুমার রায়ের ভ্রমণ ধারাবাহিক 'হিমালয়ের ডায়েরি'-র চতুর্থ পর্ব - "এবার কাহিনি কেদারনাথের"

~ আরশিনগর ~

রাই সনে রাই সন্দর্শনে
- অরিন্দম মুখোপাধ্যায়

ভালোলাগার মন্দারমনি - শ্রাবণী দাশগুপ্ত

~ সব পেয়েছির দেশ ~

আবার পুরী - তপন পাল

আমাদের ছুটি - ১৫শ সংখ্যা

অমরনাথের পথে - সুদীপ্ত দত্ত

নীল দ্বীপান্তরে - দেবপ্রসাদ মজুমদার

~ ভুবনডাঙা ~

অন্নপূর্ণার চরণতলে - অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজার দেশে কয়েকদিন - শ্রীতমা বিশ্বাস

~ অন্য ভ্রমণ ~

ভয়ঙ্কর পেরিয়ে ভূস্বর্গে – অরূপ চৌধুরী

উত্তর খুঁজছে উত্তরাখণ্ড – কাঞ্চন সেনগুপ্ত

শান্তিনিকেতন থেকে ধাত্রীদেবতার সন্ধানে – শুদ্ধসত্ত্ব ঘোষ

~ শেষ পাতা ~

চিনাই বিলের সন্ধানে – এ.এস.এম. জিয়াউল হক্

একটুকরো ডুয়ার্স – ঔরব দে

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com

© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu

Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

= 'আমাদের ছুটি' বাংলা আ. র্জাল ভ্রমণপত্রিকায় আপনাকে স্বাগত জানাই = আপনার বেড়ানোর ছবি-লেখা পাঠানোর আমন্ত্রণ রইল =

ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনি - হিমালয়ের ডায়েরি (চতুর্থ পর্ব)

আগের পর্ব - বদ্রীনারায়ণ থেকে মানা ও বসুধারা

এবার কাহিনি কেদারনাথের

সুবীর কুমার রায়

পূর্বপ্রকাশিতের পর -

বাইশে আগষ্ট। ঘুম ভাঙল বেশ সকালে। দাঁত মেজে, একতলায় সকালের কাজ সেরে, একবারে সব মালপত্র নিয়ে বেরিয়ে এলাম। পাশের ঘরের সেই মোটা যুবক ও তার বৃদ্ধ সঙ্গীও আমাদের সঙ্গে পথে নামলেন। পঞ্চভাই-এর দক্ষিণা ও ঘরভাড়া বাবদ কুড়ি টাকা, গতকাল রাতেই দিয়ে দিয়েছি। সন্ধ্যাবেলা শোনপ্রয়াগ পৌঁছবার কথা। আগামীকাল কেদারনাথ দর্শন। আগে কেদার গেলে, ধ্বসে আটকে হয়তো ফিরে আসতে হত। আমাদের ভাগ্য ভাল বলেই মনে হল। বাস স্ট্যান্ডে এলাম। কোন বাস যাবে এখনও ঠিক হয়নি। প্যাসেঞ্জার হলে বাসের টিকিট দেওয়া হবে। কথায় কথায় যুবকটি গতকালের বসুধারা যাবার কথা তুলে বলল, "কালকের চায়ের দোকানের চা-টা কী সুন্দর করেছিল বলুন, এখনও মুখে লেগে আছে। ব্যাটাকে গড়তে বললাম ভগবান, গড়ে আনলো হনুমান। বলুন তাই নয়? আচ্ছা, ওই পথটা কি সত্যিই মহাভারতের মহাপ্রস্থানের পথ? সত্যিই কি ভীম ওই পুলটা তৈরি করেছিল"? আমি আর কী বলব, বললাম লোকে তো তাই বলে। যুবকটি বলল, "গতকাল আমরা তাহলে একপ্রকার পঞ্চপান্ডবের ভূমিকায় ছিলাম বলুন"। আমি (তার প্রস্থের দিকে একবার লক্ষ্য করে নিয়ে) বললাম, "অবশ্যই, আপনি দ্বিতীয় পান্ডব ছিলেন"। যুবকটি চুপ করে গম্ভীর হয়ে গেল।

এতক্ষণে কোন বাসটা যাবে জানা গেল। ড্রাইভারের বাঁ পাশে সিঙ্গল সিট ও তার ঠিক পিছনের দু'জনের বসার চেয়ার সিট দখল করে, রাস্তায় নেমে বাসের ছাদে মালপত্র গুছিয়ে রাখলাম। দু'জনে বসার আমাদের চেয়ার সিটটার পিছনের সিটটা, যুবক ও তার বৃদ্ধ সঙ্গীটি দখল করল। এতক্ষণ চারদিক ঘন কুয়াশায় ঢাকা ছিল। ধীরে ধীরে আকাশ পরিস্কার হচ্ছে। বাস স্ট্যান্ডের পিছনে, অর্থাৎ মন্দিরের বাঁপাশে বরফমন্ডিত শৃঙ্গ সূর্যালোকে নিজেকে প্রকাশ করল। এক দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ, কয়েকজন মাঝ বয়সী ভদ্রলোক ও একজন যুবতীকে নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন। বাসের ছাদ থেকে নেমে আসতে, ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমাদের বাড়ি কোথায়, কোথা থেকে এখানে এসেছি, এখান থেকে আর কোথায় কোথায় যাব, ইত্যাদি নানা প্রশ্ন করলে, আমরা সব উত্তর দিলাম। বৃদ্ধের কথায় জানতে পারলাম, তাঁরা সোজা বদ্রীনারায়ণ এসেছিলেন। এখান থেকে এই বাসেই কেদারনাথ যাচ্ছেন। সেখান থেকে দেরাদুন ও মুসৌরী যাবেন। তিনি আরও জানালেন যে, এই নিয়ে তাঁর দু'-তিনবার কেদারনাথ যাওয়া হবে। যদিও দু'বার না তিনবার, স্পষ্ট করে বলতে পারলেন না। তাঁর মধ্যে একটু সবজান্তা সবজান্তা ভাব। যাহোক একটু পরে টিকিট কাউন্টার খুলল। আটষট্টি টাকা নব্বই পয়সা দিয়ে আমরা তিনটে শোনপ্রয়াগের টিকিট কাটলাম। রাস্তার ধারে একটা দোকান থেকে চা-জলখাবার খেয়ে নিয়ে বাসের কাছে অপেক্ষা করছি। বাসও ইতিমধ্যে বাসস্ট্যান্ডের মাঠ মতো ফাঁকা জায়গা থেকে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে। তবে একটু পরেই বাস ছাড়বে বললেও, ছাড়ার কোন লক্ষণ চোখে পড়ছে না। টাটার বেশ বড় ও নতুন বাস। কাল সময় করে বদ্রীনারায়ণ মন্দিরের পূর্ণাঙ্গ ছবি নেওয়া হয়ে ওঠেনি। এখন বেশ ভাল রোদ ওঠায়, ভাবলাম মন্দিরের একটা ছবি তুলে আনি। এখান থেকে মন্দির অনেকটা পথ। দিলীপকে সঙ্গে নিয়ে প্রায় ছুটেই মন্দিরের সামনে, ব্রিজের ওপর গেলাম। খুশিমতো ছবি তুলে খুব দ্রুত বাসের কাছে ফিরে এসে দেখলাম, সেই একই ভাবে ড্রাইভারহীন বাস দাঁড়িয়ে আছে। শুনলাম ওয়ান ওয়ে, অর্থাৎ যোশীমঠে যেরকম দেখেছিলাম, সেইরকম ওদিক থেকে আজ বাস প্রথমে আসবে। যাহোক, অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই লাইন দিয়ে বেশ কয়েকটা বাস, ট্রাক ইত্যাদি এসে হাজির হল। আমাদের বাসও আর সময় নষ্ট না করে ছেড়ে দিল।

খুব ভাল লাগছে, মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে চলেছি। হনুমান চটি যমুনোত্রীর পথে পড়ে জানতাম, এপথেও দেখি আছে। একজন পুরোহিত গোছের লোক, বাসের সবার কপালে লাল রঙের ফোঁটা পড়িয়ে দিয়ে গেল। গোবিন্দঘাটের ঠিক আগের স্টপেজে এসে বাস থামলে নেমে পড়লাম। তীরথের সঙ্গে গোবিন্দঘাট থেকে বদ্রীনারায়ণ যাবার দিনও বাস এখানে অনেকটা সময় দাঁড়িয়েছিল। এখানে একটা আপেল গাছে, হালকা লাল রঙের একটা আপেল দেখে গেছিলাম। আজও একটু খুঁজতেই সেটা চোখে পড়ল। রাস্তার পাশে একটু সমতল জমি, ধান চাষ হয়েছে। আমরা দাঁড়িয়েই আছি, বাস আর ছাড়ে না। খবর নিয়ে জানা গেল, এখান থেকে এই বাসে মেল যাবে। চিঠিপত্র সম্ভবত সর্টিং করা হচ্ছে। বাসের সব যাত্রীদের সঙ্গে আমরাও চেঁচামেচি শুরু করে দিলাম। সব বাসই ছেড়ে গেছে কেবল আমাদেরটাই দাঁড়িয়ে। ড্রাইভারও বিরক্ত হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ডাক না নিয়েই বাস ছেড়ে দিল। বাসটা নতুন, কিন্তু গতি সব সময় সীমিত। আমাদের পিছনের সিটের যুবকটি জানাল, ধ্বস নামার জন্য কেদারনাথ যেতে না পেরে বদ্রীনারায়ণ-এ চলে আসার সময়ও "গৌচর"

নামে একটা জায়গায় তাদের বাস ধ্বসে বেশ কয়েক ঘন্টা আটকে ছিল। একসময় আমরা সেই অভিশপ্ত হেলং শহরের কাছে এসে পৌঁছলাম। আশ্চর্য, এখানে কিছু হয়েছিল বলে মনে হ'ল না। এখানকার পাথরে বোধহয় চুনের ভাগ খুব বেশি। ধ্বসের জায়গায় রাস্তাটাও দেখলাম সাদা হয়ে আছে। তবে এখন সেটা বেশ চওড়া আর পরিস্কারও। গৌচরে বাস আসলে যুবকটি, কোনখানে ধ্বস নেমেছিল দেখাল। শুনলাম গৌচরে নাকি দেখার মতো মেলা বসে। এখানে এসে শুনলাম, বদ্রীনারায়ণে আর কিছুদিন পরেই বিষ্ণুযজ্ঞ হবে। প্রচুর সাধুসন্ত, ভক্ত ও সাধারণ মানুষের আগমন হবে সেই সময়। আমরা ফাঁকায় ফাঁকায় ভালই ঘুরেছি।

একসময় বাস এসে "পিপলকোঠি"তে থামলো। সেই পিপলকোঠি, যেখানে শ্রীনগর থেকে যাবার সময়, দুপুরের খাওয়া সেরেছিলাম। এবারেও বাস থামার সেই একই উদ্দেশ্য, দুপুরের আহার এখানেই সেরে নিতে হবে। আশ্চর্য, জায়গাটা আগে চিনতেই পারি নি। গতবারের বাস ড্রাইভারের সঙ্গে বোধহয় ওই ছোট হোটেলগুলোর কোন কমিশনের ব্যাপার ছিল। তা নাহলে এত বড় বড় দোকানপাট থাকতে, ছোট ছোট দুটো দোকানের কাছেই বা বাস দাঁড় করাবে কেন? এখন দেখছি বেশ বড় শহর, বেশ বড় বড় দোকান আছে। একটা হোটেলে দিব্বি মনের সুখে গরম গরম মাংস আর রুটি খেয়ে চাঙ্গা হয়ে নিলাম। কী ভাল যে লাগল কী বলব। মনে হ'ল যেন অমৃত খেলাম। ড্রাইভার বলেছিল, একটু তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে, নাহলে আজ শোনপ্রয়াগ পৌঁছনো যাবে না। গুপ্তকাশীর পর থেকে ওদিকের রাস্তা একবারে কাঁচা। তার ওপর অনবরত ধ্বসে, রাস্তার অবস্থাও খুবই খারাপ। নিজেদের স্বার্থে আমাদের বাসের যতগুলো যাত্রীকে কাছাকাছি দেখতে পেলাম, ড্রাইভারের কথা বলে বাসে উঠতে বললাম। সেই দাড়িওয়ালা বৃদ্ধের দু'একজন সঙ্গীর জন্য, বাস আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। ড্রাইভার আবার বললো, বিকেল চারটে-সাড়ে চারটের মধ্যে গুপ্তকাশী পৌঁছতে না পারলে, এখানকার ট্রাফিক-রুল মতো, আজ আর শোনপ্রয়াগ যেতে দেওয়া হবে না। যাহোক কিছুক্ষণ পর সবাই ফিরে আসায়, বাস আবার এগিয়ে চলল।

অনেকটা রাস্তা পার হয়ে আবার আমরা রুদ্রপ্রয়াগ এসে পৌঁছলাম। এই জায়গাটাকে জংশন বলা যেতে পারে। এখান থেকে কেদারনাথ ও বদ্রীনারায়ণ যাওয়ার রাস্তা ভাগ হয়ে দু'দিকে বেঁকে গেছে। এখন প্রায় পৌনে পাঁচটা বাজে। আকাশে অবশ্য যথেষ্ট রোদ আছে। কেবল বিকেল হয়েছেও বলা যায়। কিন্তু এখানকার ট্রাফিক আইন অনুযায়ী, আজ আর শোনপ্রয়াগ যাবার কোন সম্ভাবনা নেই। বাস কিছুক্ষণের জন্য এখানে দাঁড়াবে। বাস থেকে নেমে চা খেয়ে নিয়ে, জায়গাটা একটু ঘুরে দেখলাম। দেখা হয়ে গেল সেই অমরনাথ, কেদারনাথ ফেরৎ দু'জন যুবকের সঙ্গে। বলল বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। তাদের পক্ষে এবার আর নন্দন কানন, হেমকুণ্ড যাওয়া সম্ভব হল না। এদের বাকী সঙ্গীদের দেখলাম না। তারা বোধহয় হেমকুণ্ডের দিকে গিয়ে থাকবে। যাওয়ার সময়ও এই জায়গাটা এক চক্কর ঘুরে দেখেছিলাম। সত্যিই খুব সুন্দর। এখানে দাঁড়িয়ে আবার সেই একই কথা মনে হচ্ছে। ভাবছিলাম জিম করবেট যেসময়ে এখানে চিতা মেরেছিলেন, তখন এখানকার অবস্থা কীরকম ছিল? চিতাটাকে উনি মারলেন কী ভাবে? চিতাটা নিশ্চই প্রাণ দেওয়ার জন্য খাদ থেকে রাস্তার ওপর আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেখানে এসে দাঁড়িয়ে ছিল না। যাহোক, বাস ছেড়ে দিল। গন্তব্য স্থান, এখান থেকে সম্ভবত আটষট্টি কিলোমিটার দূরের শোনপ্রয়াগ। একবার মনে হচ্ছে আজই হয়তো শোনপ্রয়াগ পৌঁছে যাব। আবার মনে হচ্ছে এতটা পথ যাওয়ার মতো হাতে সময় কোথায়? এদিকের রাস্তা কিন্তু বেশ ভাল। ড্রাইভার জানাল, গুপ্তকাশীর পর থেকে রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ। আজ বাস নিয়ে শোনপ্রয়াগ যাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। নীচে রাস্তার বাঁপাশে বিরাট একটা সমতল মাঠ। অনেক ছেলে সেখানে সাইকেল চালাচ্ছে। একধারে ভলিবল খেলা হচ্ছে। অনেকদিন পরে সমতল জমি দেখলাম।

গুপ্তকাশী যখন পৌঁছলাম, তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। রাস্তার এদিক থেকে ওদিক, লেভেল ক্রসিং এর গেটের মতো, একটা কাঠের গেট ফেলা। আজ আর এদিক ওদিক, কোন দিকেরই বাস যাতায়াত করবে না। ড্রাইভার জানাল, এখানে হোটেল, ধর্মশালা, পাওয়া যাবে। কাল সকালে আবার বাস ছাড়বে। কিন্তু বাসের কিছু যাত্রী আজই শোনপ্রয়াগ যাওয়ার জন্য, ড্রাইভারকে জোর করতে লাগল। দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ এদের নেতৃত্ব দিতে শুরু করলেন। তিনি বলছিলেন, এপথে অনেকবার এসেছেন। রাস্তা এমন কিছু খারাপ নয়, যে আজ যাওয়া যাবে না। এতক্ষণ বাসের সামনের সিঙ্গল সিটে বসে ঘুম আসছিল। মাধব আমাকে পেছন থেকে ডেকে দিল। ড্রাইভারের পাশের ও ঠিক পেছনের দু'দিকের সিটে বসে ঘুমানো নিষেধ। ঠিক হয়ে বসলাম। ড্রাইভার বলল, সামনের রাস্তা একেবারে কাঁচা। একটু এদিক ওদিক হলে, বাস গভীর খাদে গড়িয়ে যেতে পারে। সবজান্তা বৃদ্ধও নাছোড়-বান্দা। আমরা বললাম ড্রাইভার যখন বাস নিয়ে যেতে ভয় পাচ্ছে, তখন নাহয় আজ রাতটা এখানেই কাটিয়ে যাই। বৃদ্ধ আবারও বললেন, তিনি এপথে অনেকবার এসেছেন। ধ্বস নামলেও কোন ক্ষতি হবে না, বাস ঠিক চলে যাবে। আমাদের অবশ্য ঠিক মত ছিলনা। বললাম, প্রত্যেকবার তো রাস্তা একই রকম থাকে না। ড্রাইভার যখন চাইছে না, কী দরকার অযথা ঝুঁকি নেবার। বৃদ্ধ সেই একই কথা আবার বললেন যে, তিনি আগে এপথে অনেকবার এসেছেন। ভয় পেলে এপথে যাওয়া যায় না। বিরক্ত হয়ে বললাম, বাস খাদে পড়লে, তাদের ও আমাদের একই দশা হবে। কিন্তু মাঝ রাস্তায় বাস কোন কারণে যেতে না পারলে, বিপদ বা ঝুঁকি তাদেরই বেশি, সঙ্গে বয়স্ক লোক ও একজন যুবতী আছে। আমরা একটা রাত অন্ধকারে বাসে বসে কাটিয়ে দিতে পারবো। এখনও প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার পথ যেতে বাকী। অচেনা অজানা রাস্তায়, অন্ধকার বাসে বসে রাত কাটানো, তাদের পক্ষে ঠিক বা নিরাপদ হবে তো? শেষে ড্রাইভার বেচারা অনেকের চাপে পড়ে জানাল, সবাই যদি এই অন্ধকারে যেতে চায়, তবে স্পেশাল পারমিশান নিয়ে সে যেতে রাজী আছে। তবে আজ না গেলেই বোধহয় সবাই ভাল করতো। সবজান্তা বৃদ্ধ জয়ের হাসি হাসলেন। যাহোক, ড্রাইভার নেমে গিয়ে কী ভাবে ব্যবস্থা করে, ফিরে এসে বাসের স্টিয়ারিং -এর ওপর হাত দিয়ে বিড়বিড় করে কী সব বলে, বারকতক নমস্কার করে, আবার একবার রাস্তা খুব খারাপ, আজ না গেলেই ভাল করতেন বলে, বাস ছেড়ে দিল।

চারিদিক ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সামনের জোরালো হেডলাইটের আলোয় বাস এগিয়ে চলেছে। ড্রাইভার বাসের গতিও অসম্ভব বাড়িয়ে দিয়েছে। খানিকটা পথ এগোতেই, একটা বেড়াল রাস্তার একদিক থেকে অপরদিকে চলে গেল। ব্যস, বিল্লি রাস্তা কাট্ দিয়া বলে ড্রাইভার বাস থামিয়ে, ইঞ্জিন বন্ধ করে, সব আলো নিভিয়ে দিল। উঃ, বাসের একবারে সামনে ড্রাইভারের বাঁপাশে বসে দেখতে পাচ্ছি চারদিকে কী ঘন অন্ধকার। কিছুক্ষণ সময় এইভাবে থেকে, বারবার বিল্লি রাস্তা কাট্ দিয়া, বিল্লি রাস্তা কাট্ দিয়া বলতে বলতে, ইঞ্জিন চালু করে, ড্রাইভার আবার বাস এগিয়ে নিয়ে চলল। মনে পড়ে গেল, গত বছরের কথা। আমরা দিল্লি থেকে বাসে হরিদ্বার যাচ্ছি। অসম্ভব গতিতে বাস ছুটছে, হঠাৎ ড্রাইভার প্রচন্ড জোরে ব্রেক কষে, দাঁড়িয়ে পড়ল। আমরা একে অপরের গায়ে গিয়ে পড়লাম। অনেকে বেশ গুরুতর আঘাতও পেল। কী ব্যাপার, না বিল্লি রাস্তা কাট্ দিয়া। এটা সমস্ত রাজ্যে, সমস্ত গাড়ির ড্রাইভারের কাছে একটা অশুভ ইঙ্গিত। বাসের চল্লিশ পঞ্চাশজন যাত্রী আহত হোক ক্ষতি নেই, তবু বাস না দাঁড় করিয়ে, একটু না থেমে, এক ইঞ্চিও বাস এগিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। অনেকে আবার বলে বিল্লিকে চাপা দিয়ে চলে যেতে পারলে নাকি আর কোন বিপদের সম্ভাবনাই থাকে না। যাহোক্, সেই বিল্লি আবার এবারেও রাস্তা কেটে দিল। তা আবার অন্ধকার রাতে এরকম দুর্গম পথে।

ড্রাইভার একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেছে বলে মনে হ'ল। ওকে একটা সিগারেট দিলাম। দুশ্চিন্তা থেকে ওর মনটাকে যদি ফিরিয়ে আনা যায় এই আশায়। প্রথমে নেবে না বলে, পরমুহূর্তেই হাত বাড়িয়ে সিগারেটটা নিল। এবার একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে, আমাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে, ওই গতিতেই বাস নিয়ে এগিয়ে চলল। চোখ যদিও সামনের দিকে, তবু এটা বিপজ্জনক তো বটে। তাই আমরা কথা বন্ধ করলাম। রাস্তার অবস্থা সত্যিই খুব খারাপ। রাস্তার ওপর দিয়ে দু'এক জায়গায় বড়সড় ঝরনাও বয়ে যেতে দেখলাম। কেদারের পথ বিশেষজ্ঞ বৃদ্ধও বোধহয় এবার একটু ভয় পেয়ে চুপ করে সামনের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। বেশ কিছুটা দূরে দেখলাম, রাস্তার ওপর কী যেন রাখা আছে। বাস আরও কাছে আসতে বুঝলাম রাস্তার ওপর গাছের বেশ বড় বড় গুড়ি ফেলে রাখা হয়েছে। ড্রাইভার ব্রেক কষে বাস দাঁড় করিয়ে, আমাদের নামতে বারণ করল। সম্ভবত এই পথে এত রাতে বাস বা অন্যান্য গাড়ি চলাচল

করে না বলেই, সকালে সরিয়ে নিয়ে যাবে ভেবে কেউ গাছ কেটে রাস্তায় রেখেছে। ড্রাইভার তো সেই অদৃশ্য ব্যক্তির উদ্দেশ্যে অশ্রাব্য গালিগালাজ করতে শুরু করে দিল। কন্ডাক্টার নিশব্দে বাস থেকে নেমে একপাশে গুঁড়িগুলো ঠেলে সরিয়ে দিতে লাগল। ড্রাইভার চিৎকার করে গাছের গুড়িগুলো খাদে ফেলে দিতে বলল। কন্ডাক্টার কথা না শোনায়, সে তাকেও গালিগালাজ করতে লাগল। যাহোক, শেষ পর্যন্ত বাস আবার ছেড়ে দিল। মধ্যে মধ্যে রাস্তার পাশে গ্রাম পড়লে, সেখানে বাচ্চা-বুড়ো সবাই দেখি দাঁড়িয়ে, অবাক হয়ে বাসের দিকে তাকিয়ে দেখছে। বোধহয় এত রাতে এ রাস্তায় বাস দেখে, তারাও অবাক না হয়ে পারছে না। শেষ পর্যন্ত রাত প্রায় সাড়ে আটটা নাগাদ আমরা অক্ষত অবস্থায় শোনপ্রয়াগ এসে পৌঁছলাম। একটা উদ্বেগ ও বিপদ কেটে গেল।

নেমে শুনলাম, এখানে ইলেকট্রিক লাইন থাকলেও, যেকোন কারণে গত দু'দিন ধরে আলো জ্বলছে না। চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। দূরে দূরে কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বলছে। কোনদিকে হোটেল বা ধর্মশালা পাওয়া যাবে ভেবে পেলাম না। অন্ধকারেও খেয়াল করলাম প্রচুর বাস দাঁড়িয়ে আছে। মনে হল জায়গাটা বেশ বড়, নিশ্চয় অনেক হোটেল পাওয়া যাবে। অন্ধকারে বাসের ছাদে উঠে হাতড়ে হাতড়ে মালপত্র নামালাম। দিলীপ একজনের সঙ্গে রাতে থাকবার জায়গা নিয়ে কথা বলছে। এত রাতে এপথে বাস আসে না। তাই বোধহয় অনেক কৌতূহলী লোকের ভীড় বাসটার কাছে। খোঁজ পাওয়া গেল বাসগুলো যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে পোষ্ট অফিসে থাকার জায়গা পাওয়া যাবে। একে অন্ধকার, তার ওপর রাত প্রায় ন'টা বাজে। তাই কথা না বাড়িয়ে, নিজেরাই মালপত্র হাতে নিয়ে পোষ্ট অফিসের খোঁজে পা বাড়ালাম। বাড়িটা খুব কাছেই। একটা পোষ্ট অফিসের সঙ্গে লাগোয়া তিনটে ঘর। দশ টাকা ভাড়া। এখানে আবার মালপত্র রেখে যাবার, অর্থাৎ ক্লোক রুমের ব্যবস্থাও আছে। তার ভাড়া মাত্র ছ'টাকা। যুবকটিও আমাদের পিছন পিছন এসেছে। ইচ্ছা, তারা দু'জনেও আমাদের সঙ্গে এক ঘরে থাকে। আমাদের এটা মোটেই ইচ্ছা নয়। দিলীপের ওপর ওদের আলাদা ঘরে থাকার ব্যবস্থা করার ভারটা দেওয়া হল। ও বেশ সহজেই দু'দলের দু'ঘরে আলাদা থাকার ব্যবস্থা পাকা করে ফেললো।

এ বাড়ির মালিকই বোধহয় পোষ্টমাষ্টার বা পোষ্ট অফিসের কোন কর্মচারী। পাণ্ডার কাজও করেন। কথায় কথায় জানালেন, দশ টাকা দিলে তিনি নিজে বা অন্য কোন পাণ্ডাকে আমাদের সঙ্গে ত্রিযুগীনারায়ণ পাঠিয়ে পুজো দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেবেন। মাধব কী করা উচিত জিজ্ঞাসা করলে বললাম, পাণ্ডার কোন প্রয়োজন নেই। নিজেরাই যাব, পুজো দিতে চাইলে, ওখান থেকেই কোন পাণ্ডা ঠিক করে নেওয়া যাবে। তাই ঠিক হল। যুবকটি বলল তারা ত্রিযুগীনারায়ণ যাবে না, কাল সকালে এখান থেকে সোজা কেদারনাথ চলে যাবে। ঠিক করলাম কাল খুব ভোরে ত্রিযুগীনারায়ণ চলে যাব। ওখান থেকে ফিরে ট্যাক্সিতে গৌরীকুণ্ড, এবং সম্ভব হলে হেঁটে কেদারনাথ। শুনলাম এখান থেকে ত্রিযুগীনারায়ণ মাত্র সাড়ে তিন কিলোমিটার পথ। এই ব্যবস্থা পাকা করে, আমরা রাতের খাবার খেতে রাস্তায় এলাম। কোন হোটেল দেখলাম না। দুটো দোকানে বলল, অর্ডার দিলে রুটি তরকারি বানিয়ে দেবে। বাধ্য হয়ে তাই অর্ডার দিয়ে বসে রইলাম। দেখলাম, অনেকটা আটামাখা হাতে নিয়ে, দু'চার বার চাপড় মেরে এক ইঞ্চি মোটা রুটির আকারে পরিণত করে, কাঠের আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দিল। রুটির যে অংশটা আগুনের দিকে রয়েছে, সেদিকটা পুড়ে কালো হয়ে গেল, কিন্তু অপর দিকটা যেমনকার কাঁচা, প্রায় সেরকমই রয়ে গেল। আমরা সঙ্গে করে মাখন নিয়ে এসেছি। ছোট ছোট আলুর তরকারিতে একটু মাখন ফেলে, তাই দিয়ে দুটো করে রুটি খেয়ে, দাম মিটিয়ে নিজেদের ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম। কাল ভোরে আবার উঠতে হবে।

তেইশে আগষ্ট। সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে হাতমুখ ধুয়ে আমরা তৈরি। পোষ্ট অফিসের মালিক এসে উপস্থিত হলেন। দশ টাকা ভাড়া মিটিয়ে দিলাম। কাঁধের তিনটে ব্যাগে টুকিটাকি জিনিসপত্র নিয়ে, ওয়াটার বটল, হোল্ড-অল আর সুটকেসগুলো ভদ্রলোকের হাতে ছেড়ে দিয়ে, মাল রাখা বাবদ ছ'টাকা ভাড়া দিয়ে, বেরিয়ে পড়লাম। শোনপ্রয়াগে মন্দাকিনী ও শোনগঙ্গা মিলিত হয়েছে। এখান থেকে বাঁদিকে ত্রিযুগীনারায়ণ যাবার পথ বেঁকে গেছে। ব্রিজ পার হয়ে ডানদিকে কেদারনাথ যাওয়ার পথ। এখান থেকে গৌরীকুণ্ড পর্যন্ত ট্যাক্সি পাওয়া যায়। গৌরীকুণ্ড থেকে পায়ে হেঁটে কেদারধাম যেতে হবে। ব্রিজের ঠিক আগেই আমরা বাঁদিকে ত্রিযুগীনারায়ণ যাওয়ার পথ ধরলাম। বোর্ডে লেখা– ত্রিযুগীনারায়ণ ৩.৬ কিলোমিটার। গোবিন্দঘাট যাওয়ার পথে ধ্বসে আটকে থাকার সময় দেখেছি বহু লোক পাহাড়ের গা থেকে এক প্রকার গাছের সরু সরু পাতা ছিঁড়ে নিচ্ছে। জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলাম ওগুলো সিদ্ধি গাছ। সিদ্ধি গাছের কাঁচা পাতা খেলে নেশা হয় কী না তারাই বলতে পারবে। এখানেও দেখলাম ঐ সিদ্ধি গাছের জঙ্গল। অনেকে আবার এগুলোকে গাঁজা গাছ বলল। তা গাঁজাই হোক আর সিদ্ধিই হোক, এপথে এই গাছ না থাকাটাই অস্বাভাবিক, কারণ এখানে বামে ত্রিযুগীনারায়ণ ডানে কেদারনাথ। গোটা এলাকাটাই ভোলে বাবার রাজত্ব! অনেক ওপরে দেখলাম বেশ কয়েকজন লাইন দিয়ে উঠছে। মধ্যে মধ্যে ইলেকট্রিকের তার নিয়ে যাবার জন্য মোটা মোটা ইস্পাতের পোষ্ট। পোষ্ট লক্ষ্য করে সোজা রাস্তা ও বাইপাশ দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। পায়ে হাঁটার রাস্তা হিসেবে খারাপ নয়। মধ্যে মধ্যে ওপর থেকে রাস্তার ওপর দিয়ে ঝরনা নেমে এসেছে। মূল ঝরনা বা এই ঝরনাগুলোর উৎস কিন্তু কোথাও চোখে পড়ল না। রাস্তা বেশ খাড়াই। ঝরনার জলে জুতো মোজা ভিজে যাচ্ছে। রাস্তার পাশে সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটে আছে, তবে সংখ্যায় বড় অল্প। সমস্ত রাস্তার পাশে পাশেই সিদ্ধি গাছের জঙ্গল। রাস্তার ওপর বেশ কয়েক জায়গায় কয়েকটা সজারুর কাঁটা কুড়িয়ে পেলাম। এখানে সজারু আছে, না এপথে যাওয়ার সময় কেউ এগুলো ফেলে গেছে, বুঝতে পারলাম না। প্রাকৃতিক দৃশ্য খুবই সাধারণ। ফলে হাঁটতে ভালও লাগছে না, কষ্টও হচ্ছে। আরও আধঘন্টা কী পঁয়তাল্লিশ মিনিট হাঁটার পর, উল্টো দিক থেকে আগত একজন স্থানীয় মানুষকে জিজ্ঞাসা করলাম– আর কত দূর? উত্তর পেলাম, তিন মিল। অর্থাৎ এখনও তিন মাইল রাস্তা। কী করে এতটা পথ হাঁটার পরও তিন মাইল রাস্তা বাকী থাকে, স্বয়ং ত্রিযুগীনারায়ণই বলতে পারবেন। বেশ কিছু পুরুষ ও মহিলার একটা দল দেখলাম রাস্তার ওপর বসে আছে। এখনও অনেকটা পথ বাকী আছে শুনে তারা কেমন মুষড়ে পড়ল। আমরা এগিয়ে চললাম।

হাঁটতে আর ভাল লাগছে না। বেশ কষ্টকর রাস্তা। এবার আমরা একটা ছোট মন্দির, ও মন্দির সংলগ্ন খানিকটা ঘেরা জায়গা দেখতে পেলাম। খুব খুশি হলাম শিবদুর্গার বিবাহ স্থানে এসে গেছি ভেবে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ওখানে পৌঁছলাম। অবাক হয়ে গেলাম যখন শুনলাম, এটা মোটেই ত্রিযুগীনারায়ণ মন্দির নয়। আরও অবাক হলাম যখন শুনলাম, এখান থেকেও মন্দির মাত্র তিন মিল রাস্তা। এটা "শাকোম্বরী" মন্দির। ইনি স্বর্গের কোন বিভাগের ভারপ্রাপ্তা জানি না। জানার ইচ্ছাও এখন আর নেই। খোলা ঘেরা জায়গাটায় দেখলাম একজন বৃদ্ধ সাধু গোছের লোক একটা বই পাঠ করছেন, এবং রাস্তায় দেখা সেই দলটার মতো অনেক ভক্ত, মন দিয়ে তাঁর পাঠ শুনছে। যতদূর মনে হ'ল, রামায়ণ পাঠ হচ্ছে। সামনে একটা বোর্ড লাগানো। তাতে লেখা আছে– ত্রিযুগীনারায়ণ ৩.৬ কিলোমিটার পথ। একবারে নীচে ব্রিজের কাছে যত দূরত্ব দেখেছিলাম, সকাল থেকে এতটা পথ হেঁটে এসে, এখানেও দেখি সেই একই দূরত্বই লেখা আছে। সত্যি সত্যি আরও ৩.৬ কিলোমিটার পথ যেতে বাকী আছে কী না কে জানে! এখানে সবই সম্ভব। আমরা আবার এগিয়ে চললাম।

রাস্তার পাশে একটা ঝরনার জলে জাঁতা ঘুরিয়ে সম্ভবত গম ভাঙ্গা হচ্ছে। কোন লোকজনকে অবশ্য দেখলাম না। হঠাৎ কানে তালা লাগানো আওয়াজ। প্রথমে একটু ভয় পেলেও, পরে হেলং-এর কথা মনে পড়ল। বুঝলাম কোথাও ব্লাষ্টিং হচ্ছে। সকালে সামান্য চা বিস্কুট খেয়ে বেরিয়েছি। খিদেও পেয়েছে খুব। সঙ্গে গতকালের কেনা কিছুটা ঝুড়িভাজা ছিল। নরম হয়ে গেলেও, তাই সামান্য করে খেয়ে, আবার এগিয়ে চললাম। উল্টোদিক থেকে একজন স্থানীয় যুবককে কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে আসতে দেখলাম। তাকে আর কত দূর জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পেলাম, "দুই-ঢাই মিল্ হোগা"। যাক, তবু আধ কিলোমিটার পথ অন্তত কমানো গেছে। আবার এগিয়ে চলা। আরও বেশ কিছুক্ষণ পরে দূরে, বহু দূরে, একটা মন্দিরের সাদা পতাকা নজরে এল। দেখে বেশ আনন্দ হলেও ভয় হ'ল, কাছে গিয়ে হয়তো দেখব কোন কাদম্বরী বা ধন্বন্তরী দেবীর মন্দির। আজই আমাদের কেদারনাথ যাওয়ার ইচ্ছা, তাই সময় নষ্ট না করে গতি বৃদ্ধি করলাম। অবশেষে ওদের কথামতো ৩.৬ কিলোমিটার পথ পার হয়ে মন্দিরে এসে পৌঁছলাম।

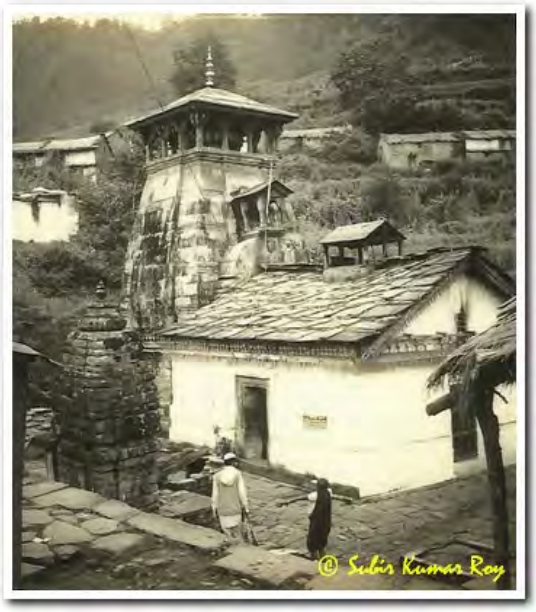

উড়িষ্যার পুরী বা আশেপাশের অন্যান্য মন্দিরগুলোর মতো অনেকটা দেখতে হলেও, মনে হয় যেন সিমেন্টের তৈরি। আসলে যদিও পাথরেরই। মন্দিরের বাইরে উঁচু চাতালে গোটা দু'-তিন চায়ের দোকান। বাদবাকী, দোকানের মতো অনেকগুলো ঘর। তবে সবকটা ঘরেই পাণ্ডার ভিড়। একটা কল থেকে একভাবে জল পড়ে যাচ্ছে। যদিও তার চারপাশে ভীষণ নোংরা, তবু খানিকটা করে জল খেয়ে, মন্দিরে যাবার জন্য তৈরি হলাম। মোটা মোটা লাল কাপড়ে বাঁধানো চিত্রগুপ্তের খাতা হাতে পাণ্ডারা এসে হাজির হ'ল। তাদের প্রয়োজন আমাদের নাম, ধাম, বাবার নাম ইত্যাদি। আমরা পুজো দিতে আসিনি, কাজেই এ সবের আমাদের কোন প্রয়োজন নেই, ইত্যাদি বলতে বলতে, আমরা সিঁড়ি দিয়ে নীচে মন্দিরের চাতালে এলাম। মন্দিরে ঢুকবার আগে জুতো মোজা খুলে, ব্যাগ তিনটে ও লাঠিগুলো এক জায়গায় রেখে গেলাম। মন্দিরের ভিতর সব সময় একটা প্রদীপ জ্বলে। শিবদুর্গার বিবাহের সাক্ষী হিসাবে, নারায়ণ তিন যুগ ধরে এখানে অবস্থান করছেন বলে শুনলাম। নারায়ণের কী অন্য কোন কাজ নেই, না শিবের বিয়ের সময় ভাল বিয়ে বাড়ি পাওয়া যেত না জানি না! ডানপাশে বাঁধানো চৌবাচ্চা মতো। সেখানে স্নান সেরে বহু হিন্দুস্থানী পুণ্যার্থী, গোল হয়ে বসে আছে। পাণ্ডারা তাদের লাল খাতা খুলে, নাম ধাম ইত্যাদি খুঁজে বার করে, মন্ত্র পাঠ করাচ্ছে। আকাশে বেশ মেঘ করেছে। রোদের জন্য ক্যামেরা হাতে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে শেষে রোদের আশা ছেড়ে দিয়ে মেঘের মধ্যেই বেশ কয়েকটা ছবি তুলে নিলাম। এবার ফেরার পালা। জুতো মোজা পরে, ব্যাগ ও লাঠি নিয়ে বাইরে এলাম। আবার সেই কান ফাটানো ব্লাষ্টিং-এর আওয়াজ - শোনপ্রয়াগ থেকে ত্রিযুগীনারায়ণ, বাস রাস্তা তৈরির কাজ চলছে। সামনের চায়ের দোকানে বসে তিনজনে চা খাচ্ছি, দু'জন পাণ্ডা এসে বললো পুজো না দেবেন তো কী হয়েছে, প্রসাদ নিন। তারা সামান্য প্রসাদ দিয়ে গেল। কথা না বাড়িয়ে প্রসাদগুলো ব্যাগে রেখে দিলাম। এবার সত্যিই ওঠার পালা। আমরা পুরানো রাস্তা ধরে নামতে শুরু করলাম। আমাদের কাছে ইউ.পি.হিলস্ এর যে গাইড ম্যাপ ছিল, তাতে দেখলাম শোনপ্রয়াগ থেকে ত্রিযুগীনারায়ণের দূরত্ব, মাত্র পাঁচ কিলোমিটার পথ। মনে হয় এ ম্যাপটাই ঠিক। এর আগেও অনেক হেঁটেছি। ৩.৬ কিলোমিটার পথ এটা যে নয়, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আসবার সময় যে বাইপাসগুলো ব্যবহার করিনি, এবার সেগুলো দিয়ে নেমে আসায়, খুব দ্রুত নীচে নেমে আসতে শুরু করলাম। সেই ঝরনা, গাঁজা বা সিদ্ধির জঙ্গল পেরিয়ে, একসময় আমরা নীচের ব্রিজের কাছে এসে পৌঁছলাম।

গতকাল রাতে যেখানে খাবার খেয়েছিলাম, সেই দোকানেই খাবার খেতে গেলাম। মাখনের প্যাকেটটা নিয়ে আসা হয় নি। তাছাড়া মাধবের পায়ে ব্যথার জন্য নী-ক্যাপটাও আনা প্রয়োজন। মাধব ও দিলীপ আমাদের আস্তানায় গিয়ে ওগুলো নিয়ে ফিরে এল। রুটি আর আলুর তরকারি খেয়ে, আমরা গৌরীকুণ্ড যাওয়ার জন্য একটা ট্যাক্সি ঠিক করলাম। এখানে প্রচুর ট্যাক্সি শোনপ্রয়াগ-গৌরীকুণ্ড যাতায়াত করে। দূরত্ব মাত্র পাঁচ কিলোমিটার। তিনজনের ভাড়া পড়ল বার টাকা। গৌরীকুণ্ড জায়গাটা দেখে মনে হ'ল, শোনপ্রয়াগের থেকে ছোট হলেও অনেক উন্নত। এখানেও ইলেকট্রিক আলো আছে, তবে কোথাও কিছু খারাপ হওয়ায় শোনপ্রয়াগের মতোই জ্বলছে না। শোনপ্রয়াগে শুনেছিলাম, গৌরীকুণ্ডে মন্দির কমিটির বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা নাকি ভাল। গৌরী দেবীর মন্দির ছেড়ে একটু এগিয়ে রাস্তার ডানপাশে মন্দির কমিটির ঘর। আজই কেদারনাথ চলে যাবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু স্থানীয় লোকেদের উপদেশ, অনেক বেলা হয়ে গেছে, আজ আর কেদারনাথ যাওয়া ঠিক হবে না। এখান থেকে চোদ্দ কিলোমিটার হাঁটা পথ। ঠিক করলাম আজ গৌরীকুণ্ডে থেকে, কাল সকালে কেদারনাথ যাব। মন্দির কমিটির একটা ঘর ষোল টাকা দিয়ে ভাড়া নিলাম। কাঠের মেঝে। কম্বল ও লেপ পাওয়া গেল। আমরা সঙ্গে কিছুই নিয়ে আসি নি। ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে একটু বিশ্রাম নেব ভাবলাম।

মাধব শুয়ে পড়ল। আমি আর দিলীপ ক্যামেরা হাতে জায়গাটা এক চক্কর ঘুরে দেখতে বেরোলাম। গৌরীদেবীর মন্দিরের সামনে একটা চৌবাচ্চা মতো আছে। তাতে অবশ্য ঠাণ্ডা জল। সামনেই গৌরীকুণ্ড, গরম জলের কুণ্ড। এখানেই পূজা, তর্পণ, পিন্ডদান ইত্যাদির ব্যবস্থা আছে। এখানেই একটা দোকানে রাতের খাবারের অর্ডার দিয়ে ঘরে ফিরে এসে, আমরাও লেপ চাপা দিয়ে পরম আরামে শুয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙ্গল বেশ বিকেলে। দুপুরে ঘুমিয়ে শরীরটা খারাপ লাগছে। মাধবের ইচ্ছা কেদারনাথে একদিন থাকার। আমরা ভেবেছিলাম যেদিন যাব, সেইদিনই সন্ধ্যায় ফিরে আসবো। শেষ পর্যন্ত কেদারনাথে রাতে থাকার ব্যবস্থাই পাকা হ'ল। দুপুরের দিকে খুব হাল্কা এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। রাস্তা এখনও অল্প অল্প ভিজে আছে। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে এল।

আটটা নাগাদ আমরা রাতের খাবার খেতে নির্দিষ্ট দোকানে গেলাম। দোকানদার ভদ্রলোক খুব ভাল মানুষ, নাম প্রতাপ সিং। বললেন, তাঁর দোকানের ওপরে দোতলায় থাকার ব্যবস্থা আছে। সিজনের সময় ভাড়া বাবদ সামান্য কিছু টাকা নেন। এখন অফ্-সিজন এর সময়, থাকার জন্য কোন চার্জ লাগে না। এরকম প্রস্তাব যে কেউ, কোথাও, কোনদিন দিতে পারে, স্বপ্নেও ভাবিনি। এখানে থাকলে আমাদের সুবিধাও হ'ত। টপ্ করে দোতলা থেকে এক তলায় নেমে রাতের খাবার খাওয়াও যেত, ঠান্ডায় এতটা আসার প্রয়োজনও হ'ত না। আর ষোল টাকা ভাড়া তো বেঁচে যেতই। যাহোক, পুরী, তরকারী খেয়ে, পরের দিন সকালের জন্য জলখাবারের অর্ডার দিয়ে, আমরা ঘরে ফিরে এলাম। রাতে খুব আরামে লেপের তলায় ঘুমালাম।

চব্বিশে আগষ্ট। ঘুম ভাঙ্গল খুব সকালে। হাত মুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে ঘরের ভাড়া মিটিয়ে, কাঁধের ঝোলাব্যাগ সঙ্গে নিয়ে, আমরা সেই দোকানে খাবার খেতে গেলাম। গরম গরম পুরী, তরকারি আর লাড্ডু দিয়ে প্রাতরাশ সেরে, হাঁটার জন্য প্রস্তুত হলাম। দোকানদার বললেন, ফেরার সময় গৌরীকুণ্ডে রাত কাটালে, তাঁর ওখানে থাকলে খুশি হবেন। সম্মতি জানিয়ে কেদারনাথের রাস্তা ধরলাম। আকাশ পরিস্কার। একদিন অনেকটা সময় বিশ্রাম পাওয়ায়, শরীরও বেশ চাঙ্গা। হাঁটতে কোন কষ্ট হচ্ছে না। পাশ দিয়ে ঘোড়া ও কান্ডিতে বুড়োবুড়ি এমন কী যুবক যুবতীদেরও, কেদারনাথের দিকে যেতে দেখলাম। বেশ কিছুটা পথ এগিয়ে, বদ্রীনারায়ণের সেই যুবক ও তার বৃদ্ধ সঙ্গীটিকে ফিরতে দেখলাম। তারা বলল, কেদারনাথে বিড়লা গেষ্ট হাউসে গতকাল রাতে ছিল। পথে একটা বিরাট ঝরনা পেলাম। প্রাণভরে ঠান্ডা জল খেয়ে আবার এগোলাম। সামনেই "রামওয়াড়া" চটি। এখানে রাত কাটাবার ভাল ব্যবস্থা আছে। পৌঁছে দেখি, বেশ কিছু লোক শোনপ্রয়াগ যাবার জন্য তৈরি হচ্ছে। গতকাল রাতে তারা এখানেই ছিল। দূরে বরফ ঢাকা শৃঙ্গ দেখা যাচ্ছে। ঝুড়িভাজা ও চা খেয়ে, সামনের রাস্তা ধরলাম। প্রাকৃতিক দৃশ্য বেশ সুন্দর। রাস্তাও বেশ চওড়া ও ভাল। ফলে মনের আনন্দে চলেছি। আর কিছুটা পথ এসে, "গরুড়" চটিতে হাজির হলাম। এখানে আলাপ হ'ল হাওড়া কদমতলার চারজনের সঙ্গে। একজন একটা স্কুলের শিক্ষক, বাকী সবাই ব্যবসা করে। চেনাশোনা অনেকের কথাই তারা জিজ্ঞাসা করল। বলল, হাওড়া থেকে মোটরে গৌরীকুণ্ডে এসে, ওখানে গাড়ি রেখে, হেঁটে কেদারনাথ এসেছে। এখন আবার ফিরে যাবে গৌরীকুণ্ডে। হাতে কেদারনাথের পূজার ব্রহ্মকমল। বললাম, আমরা ব্রহ্মকমলের রাজত্ব পার হয়ে এসেছি। সব শুনে তারাও হেমকুণ্ড-নন্দন কানন যাওয়ার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠল। বললাম, অনেক হাঁটতে হবে। বলল, সঙ্গে গাড়ি আছে। মনে মনে ভাবলাম সঙ্গে গাড়িই থাক আর টাকাই থাক, সৌন্দর্য কুড়োতে গেলে, হাঁটতে তোমাদের হবেই। অবশ্য ঘোড়া বা কান্ডি নিতে পার।

কেদারনাথের উচ্চতা ৩৫৮৪ মিটার। গৌরীকুণ্ড মাত্র ১৯৮১ মিটার। কিন্তু কেদারনাথের রাস্তা খুব ধীরে ধীরে ওপর দিকে ওঠায়, হাঁটার কষ্ট বেশ কম। বহুদূরে বরফ ঢাকা শৃঙ্গ দেখা যাচ্ছে। শুনলাম ওই শৃঙ্গের পাদদেশেই কেদারনাথ মন্দির। অনেকক্ষণ হাঁটছি, পথের যেন আর শেষ নেই। ডান্ডি বা কান্ডিগুলোকে পিছনে ফেলে, জোর কদমে আমরা এগিয়ে চলেছি। অবশেষে বহুদূরে ছোট্ট মন্দির চোখে পড়লো। মনে হ'ল যেন ছাই-এর গাদার উপর একটা ছোট্ট মন্দির, নির্জন পরিত্যক্ত একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। পরে শুনলাম এই জায়গা থেকে মন্দিরটা প্রথম দেখা যায়, তাই এই জায়গাটাকে "দেওদেখনি" বলা হয়। একসময় আমরা উত্তর প্রদেশ সরকারের ট্রাভেলার্স লজের কাছে এসে পৌঁছলাম। পাশেই হোটেল "হিমলোক"। এখানে খাওয়ার ব্যবস্থাও বেশ ভাল। সম্ভবত এটাও উত্তর প্রদেশ সরকার দ্বারাই পরিচালিত। সামনে সামান্য দূরেই, কেদারনাথ মন্দির। দূর থেকে যেটাকে ছাইয়ের গাদা ভেবেছিলাম, সেটা আসলে হাল্কা কুয়াশা। মন্দিরের পেছনে কিন্তু কোন বরফ ঢাকা পাহাড় দেখলাম না। চারদিক মেঘ আর কুয়াশায় ঢেকে গেছে। এই মুহূর্তে বরফ দূরে থাক, মন্দিরের পেছনে যে পাহাড় আছে, তাও বুঝবার উপায় নেই। ট্রাভেলার্স লজে একটা ঘর, আঠের টাকা ভাড়ায় বুক করলাম। ভাল বিছানা, প্রত্যেকের জন্য তিনটে করে মোটা ভাল কম্বল। ঘরে ব্যাগ রেখে, দরজা বন্ধ করে, মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। মন্দিরের একটু আগে একটা ব্রিজ পার হতে হয়। এখানে দুধগঙ্গা, মধুগঙ্গা, স্বর্গদুয়ারী, সরস্বতী, ও মন্দাকিনী, বোধহয় এই পাঁচটা নদী এসে মিশেছে। মন্দিরের সামনে রাস্তার দু'পাশে পরপর দোকান। মন্দির এখন বন্ধ, সন্ধ্যা নাগাদ খুলবে। কয়েকটা ছবি তুলে, কিছু খাওয়ার ধান্দায় একটা দোকানে গেলাম। রাস্তার দু'পাশে দু'টো মিষ্টির দোকান মতো আছে। একমাত্র এখানেই কিছু খাবার মিলতে পারে। একটা দোকানে একটা ছেলে বসে আছে। সে জানালো, লুচি, তরকারি ও মিষ্টি পাওয়া যাবে, তবে লালাজী না আসলে হবে না। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও লালাজীর দর্শন পেলাম না। বাধ্য হয়ে অপর দিকের দোকানটায় গেলাম। এটা অপেক্ষাকৃত অপরিস্কার। এই দোকানের মালিকের বেশ গরম মেজাজ। সে জানাল, লুচি হবে না, পুরীও হবে না। আগের থেকে অর্ডার না দিলে পাওয়া যায় না। বললাম আমরা এইমাত্র এখানে এসে পৌঁছলাম, আগের থেকে অর্ডার দেব কী ভাবে? আমাদের কথায় তার মন গললো না। সে বলল, নিমকি আছে খেতে পারেন, লুচি এখন পাওয়া যাবে না। অপরদিকে তখনও লালাজীহীন দোকানে, তুলনামুলক ভাবে একটু ভাল মিষ্টি ও অন্যান্য খাবার শোভা পাচ্ছে। শেষে বাধ্য হয়ে কবেকার ভাজা কে জানে, ঠান্ডা নিমকি, গরম মেজাজের দোকানদারের থেকে পয়সা দিয়ে কিনে ধন্য হলাম। সঙ্গে লাড্ডু আর চা। কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে ঘরে ফিরে এলাম।

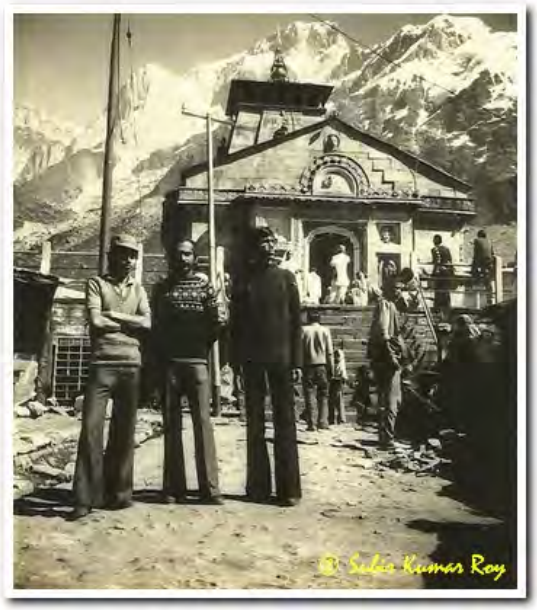

ট্রাভেলার্স লজের সামনে অনেকটা ফাঁকা মাঠের মতো জায়গা, রেলিং দিয়ে ঘেরা। সামনের খোলা জায়গাটায়, কয়েকটা চেয়ার ও একটা বেতের টেবিল পাতা আছে। লজে আমাদের অপর দিকের ঘরে একটা মাদ্রাজী পরিবার আছে তারা সমস্ত চেয়ারগুলো দখল করে বসে, আরামে চা খাচ্ছে। বাইরে বেশ ঠান্ডা। আমরাও চায়ের অর্ডার দিলাম। রেলিং এর কাছে, রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে, গলা ছেড়ে গান জুড়ে দিলাম। মনটা বেশ খুশি খুশি। হেমকুণ্ড, নন্দন কানন, বদ্রীনারায়ণ, ত্রিযুগীনারায়ণ দেখা হয়েছে। কেদারনাথও দেখা হ'ল। আগামীকাল বাসুকীতাল দেখতে যাবার ইচ্ছা আছে। হিমলোক হোটেলের ছেলেগুলো জানালো, বাসুকীতাল মাত্র পাঁচ-ছয় কিলোমিটার পথ। এই সামান্য রাস্তা হাঁটার ভয় এখন আর নেই। মনে শুধু একটাই চিন্তা, গঙ্গোত্রী, গোমুখ, যমুনোত্রী যাওয়া হবে তো? আস্তে আস্তে সন্ধ্যা নেমে এল। ঘরে এসে দেখলাম, পাশের ঘরে মিটমিট করে ইলেকট্রিক লাইটগুলো জ্বলছে। আমাদের ঘরের বালবটা বোধহয় কেটে গেছে। কেয়ারটেকারকে বালবটা বদলে দেবার কথা বলে, আমরা মন্দিরে গেলাম। চা জলখাবার খেয়ে কিছুক্ষণ মন্দিরের চাতালে ঘুরে, ঘরে ফিরবার কথা বললাম। দিলীপের খুব ইচ্ছা সন্ধ্যা আরতি দেখে যাবার। আমার কিন্তু ঘরে ফিরে যাবার ইচ্ছা ছিল, কারণ আমরা হাওয়াই চটি পরে ঘর থেকে মন্দিরে এসেছি। অনেকটাই পথ, তার ওপর অসম্ভব ঠান্ডা পড়েছে। আমার সঙ্গী দু'জনেরই আবার একটু ঠান্ডার বাতিক আছে। ফলে ওদের শরীর খারাপ হবার সম্ভাবনাও যথেষ্ট। কিন্তু মাধবও দিলীপের সাথে যোগ দিয়ে, আরতি দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করল। এরপর আর আমার না বলার কোন জায়গা নেই। তাই তিনজনে একটা দোকানে আরতি আরম্ভ হবার অপেক্ষায় বসে থাকলাম।

এখানে বেশ কয়েকজনের কাছ থেকে বাসুকীতাল সম্বন্ধে খোঁজখবর নিলাম। বাসুকীতালের দূরত্ব সম্বন্ধে এক একজনের এক একরকম বক্তব্য। কেউ বলে বার মাইল, কেউ বলে ছয় মাইল, কেউবা আবার অনেক বেশি বলে জানাল। তবে সকলেই কিন্তু একটা কথা বলল, ওখানে পর্বতারোহণের অ্যাডভান্সড ট্রেনিং হয়। কাজেই যাওয়াটা সাধারণ মানুষের পক্ষে সহজসাধ্য নয়। তার ওপর যাওয়ার কোন নির্দিষ্ট রাস্তাও নেই। একটু মেঘলা করে এলে, রাস্তা চিনে ফিরে আসা খুব সহজ কাজ নয়। ভাল গাইড সঙ্গে নিলে অবশ্য আলাদা কথা। শুনলাম ওখানকার লেকের আয়তন নাকি এখনও হিসাব করা যায় নি। বাসুকীতাল সম্বন্ধে বিশেষ জানাও ছিল না, আসার আগে খোঁজখবরও নিয়ে আসা হয় নি। ফলে একটা কথা বেশ বুঝতে পারছি যে, আগামীকাল শোনপ্রয়াগ ফিরতে হলে, এবার আর বাসুকীতাল দেখা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। সন্ধ্যা আরতি শুরু হল প্রায় রাত সাড়ে সাতটা নাগাদ। ঠান্ডাও বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। এই ঠান্ডাতেও অনেক লোকই মন্দিরে এসে হাজির হয়েছে। লাইন দিয়ে সামনের দরজা দিয়ে ঢুকে, ডান পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে হয়। আস্তে আস্তে হাঁটার ফলে যেটুকু দেখা যায়। দর্শনার্থীর সংখ্যা যত কম হবে, তত বেশি সময় নিয়ে ভালভাবে দেখা যাবে। অবশ্য পুজো দেওয়ার সময় মূর্তি স্পর্শ করতে দেওয়া হয়, যেটা বদ্রীনারায়ণে করা যায়না। তবে এখানে আবার বদ্রীনারায়ণের মতো ঘটা করে আরতি হয় না, অন্তত এখন তো হতে দেখলাম না। খালিপায়ে এইটুকু পথ হাঁটতে হয়। আমরা মন্দিরের বাইরে এসে চটি পরে ঘরের পথে পা বাড়ালাম। এখানকার স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী সম্বন্ধে কোন ধারণা পাওয়া গেল না, পাওয়া যাবে বলেও মনে হল না। ওদের হাবভাব দেখে বরং মনে হল, যেন এখানকার কেউ কোনদিন এদিক থেকে ওপথে যায়ও নি। একটা ধারণা পেলে যদিও সুবিধাই হত। যাহোক, ফিরে দেখলাম ঘরে নতুন বালব লাগায়নি। পাশের হিমলোক হোটেলে রাতের খাবার খেতে গেলাম। আধা ভাত, আধা রুটি, দু'রকম তরকারি, বেশ ভাল ডাল ও পাঁপড় ভাজা দিয়ে গেল। কায়দা কানুনও আধুনিক হোটেলের মতো। দাম লাগলো মাথাপিছু চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা। বালবের কথা জিজ্ঞাসা করতে জানা গেল বালব আনতে গেছে, আপাতত মোমবাতি দিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বাস হল না। ঘরে ফিরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। বালব বা মোমবাতি কোন কিছুই দিয়ে না যাওয়ায়, বাইরে মেন সুইচের কাছ থেকে একটা বালব খুলে এনে নিজেদের ঘরে লাগিয়ে নিয়ে, দরজা বন্ধ করে, আলো জ্বেলেই শুয়ে পড়লাম। মনে হচ্ছিল বিছানা যেন ভিজে গেছে। তিনটে কম্বলও যথেষ্ট বলে মনে হ'ল না।

পঁচিশে আগষ্ট। বেশ ভোরেই ঘুম ভেঙ্গে গেল। বাড়ির পিছন দিকে হাত, মুখ ধুতে গিয়ে প্রথম নজরে পড়ল একবারে হাতের কাছে সূর্যালোকে লাল-হলদে রঙের বরফের চুড়া। তাড়াতাড়ি চা খেয়ে তৈরি হয়ে মন্দিরে গেলাম। ভোরের মন্দিরের রূপ একেবারে অন্যরকম। মন্দিরের ঠিক পিছন থেকে বরফের চাদর ঢাকা পাহাড় উঠেছে। প্রাণভরে ছবি তুললাম। মাধব ও দিলীপ পি. শুক্লা নামে এক পাণ্ডার খোঁজ করে পুজো দিতে গেল। আমি মন্দিরের পিছনে শঙ্করাচার্যের সমাধি দেখতে গেলাম। একপাশে শ্বেত পাথরের শঙ্করাচার্যের দণ্ড। একটা সাদা পাথরের হাত, দণ্ডটা ধরে আছে। সমাধিটা বাঁপাশে। একটা ছোট মন্দিরের মতো ঘরে, শঙ্করাচার্যের মূর্তিটা রাখা আছে। চারপাশের দেওয়ালে শ্বেত পাথরের ফলকে, সম্ভবত তাঁরই বাণী লেখা। ঘুরে ফিরে ছবি নিয়ে ফিরে এলাম। বন্ধুরাও তৈরি। এবার ফেরার পালা। হোটেলে এসে, বিল মিটিয়ে, ব্যাগ কাঁধে নিয়ে, ফেরার রাস্তা ধরলাম। আমাদের সাথে বদ্রীনারায়ণ থেকে এক বাসে আসা সেই সবজান্তা দাড়িওয়ালা বৃদ্ধের দলের সাথে দেখা হল। তারাও আমাদের মতোই ফেরার পথে।

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

আগের পর্ব – বদ্রীনারায়ণ থেকে মানা ও বসুধারা

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের অবসরপ্রাপ্ত অফিসার সুবীর কুমার রায়ের নেশা ভ্রমণ ও লেখালেখি। ১৯৭৯ সালে প্রথম ট্রেকিং – হেমকুন্ড, ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স, বদ্রীনারায়ণ, মানা, বসুধারা, ত্রিযুগী নারায়ণ, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী-গোমুখ ও যমুনোত্রী। সেখান থেকে ফিরে, প্রথম কাগজ কলম নিয়ে লিখতে বসা। ভ্রমণ কাহিনি ছাড়া গল্প, রম্য রচনা, স্মৃতিকথা নানা ধরণের লিখতে ভালো লাগলেও এই প্রথম কোনও পত্রিকায় নিজের লেখা পাঠানো। 'আমাদের ছুটি' পত্রিকার নিয়মিত লেখক, পাঠক, সমালোচক এখন নেমে পড়েছেন কীবোর্ডে-মাউসে সহযোগিতাতেও।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

= 'আমাদের ছুটি' বাংলা আন্তর্জাল ভ্রমণপত্রিকায় আপনাকে স্বাগত জানাই = আপনার বেড়ানোর ছবি-লেখা পাঠানোর আমন্ত্র

রাই সনে রাই সন্দর্শনে

অরিন্দম মুখোপাধ্যায়

নীলচে ধুসর পাহাড়ের আউটলাইন, জঙ্গলের সোঁদা গন্ধ, থেকে থেকেই মন্দিরের পূজারীর ঘন্টা, সব মিলিয়ে উধাও হওয়া মনটা আর আমরা। সান্দাকফু ছাড়াও এ রাজ্যের অসংখ্য ট্রেকিং রুটের একটির যাত্রী। উদ্যোগী অনুজপ্রতিম তমাল। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোয় যার অগাধ আস্থা। সঙ্গে ধুনোর গন্ধ তার ভালো অর্ধেক অমৃতা। আর পঞ্চবর্ষীয়া কুর্চি। পরিচয় জানাতে পারলে কোনো পুরস্কারের ব্যবস্থা নেই। আলিপুরদুয়ারে সপরিবার অভ্যর্থনা পার্টি। অতিথি অবশ্যই ভালো আর খারাপ অর্ধেক সমন্বিত এই প্রতিবেদক।
ওইটুকু মেয়েকে নিয়ে ট্রেকিং!!! উত্তরটা ভবিষ্যতের গর্ভেই ছেড়ে রাখলাম।
সান্তারাবাড়ি মোটরযানের শেষ ঠিকানা। এরপর চরণযুগলই ভরসা। যাত্রাপথের একটা আগাম আভাস দেওয়া যাক। সান্তারাবাড়ি থেকে বক্সা, চুনাভাটি, লামনা, আদমা, কালিপোখরি হয়ে সেই যেখানে রাই থেকে ছিলেন। পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক কোনো সমর্থন নেই কিন্তু নামকরণে আছে। রাই মিয়া টুঙ। রাই যেখানে ছিলেন। আমরা চিনি রায়-মা-টাঙ নামে। নামে কিছু কিছু যায় আসে বৈকি।
শাল, অর্জুনে ছাওয়া পথের চরিত্র পরিবর্তন হতে থাকে দ্রুত। উচ্চতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। চাপ, চেপ্টি, চিলুনি, চিপরাশিরা ঘনিয়ে আসে দুপাশ থেকে। গায়ে হাত বুলিয়ে যায় ব্লুমরমোন, প্যান্জি, কমন বাটারফ্লাইয়ের দল। আবহকে ঘন করে নিরন্তর ঘন্টির আওয়াজ। আসলে যা ঝিঁঝিঁর ডাক ছাড়া কিছু নয়। হঠাৎ হাল্কা মেঘ আলিঙ্গনবদ্ধ করে মাঝে মাঝেই। সতর্ক পদক্ষেপে সাড়ে চারজনের ছোট্ট দলটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা বাড়াতে থাকে।
পাহাড়ি বাঁকের চমকে হঠাৎ লুকোচুরিতে ডিমা, বক্সা, জয়ন্তী নদীদের ঝাঁকি দর্শন। সঙ্গীনী চোদ্দ বছরের পুরনো স্ত্রী প্রকৃতির ব্যাকড্রপে অচেনা নারী। যার দিকে অপাঙ্গে চাইতে মন চায়, হাঁটার ছলে ছুঁতে চায় হাত, ফিসফিসিয়ে জানতে চাইতে ইচ্ছে করে, কষ্ট হচ্ছে কি না।
বক্সা টাইগার রিজার্ভের মধ্যে দিয়ে হলেও বন্যপ্রাণ চোখে পরেনি। তারই অভাব মেটাচ্ছে কুর্চি। হরিণীর মতো চপল চরণে দিব্বি পাহাড়ের ঢাল বেয়ে তার দ্রুত চলা। অবশ্যই বাবা তমালের সতর্ক তত্ত্বাবধানে।

দুহাজার দুশো ফিট উচ্চতায় বক্সা গ্রাম। প্রথম রাতের ঠিকানা। ঠিক উল্টোদিকে দুহাজার আটশো চুয়াল্লিশ ফিট উচ্চতায় বক্সা দুর্গ। বেলা শেষের আলো আঁধারিতে আরও বেশি ইতিহাস জর্জরিত। রহস্যময়তার অমোঘ আহ্বান। পা ও-দিকে যেতে উৎসুক হলেও তমালের পিছুটানে নিয়ন্ত্রিত। সাপ খোপ আছে, দিনের আলোয় যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। অগত্যা তমালের কেঠো ডেরায় কেজো পায়েদের সে-দিনের মতন বিশ্রাম।
কলকাকলিতে ভোর না হতেই শয্যাত্যাগ। বাইরে বের হতেই পাখির বদলে চোখে পড়ল একদল কচিকাঁচা। সবাই স্থানীয়। প্রবল উৎসাহের কারণ দুটি। কুর্চির আগমন। আর সামনে খাটানো তাঁবু। আমাদের সঙ্গে যাবে। পরের দিন তাঁবুতেই রাত্রিবাস। তাই পাঁচ সকালেই তমাল লেগে পড়েছে সব ঠিকঠাক আছে কিনা পরখ করে নিতে।
এত কলতানে চোখ নেই দুই সখীর। নরম আলোয় ভিজতে ভিজতে অনাবিল হাস্য রসে মশগুল তারা। পেশায় মাস্টারনি অমৃতার পেশাগত মুখোশ হারিয়েছে বক্সার জঙ্গলে। সঙ্গে রাতারাতি পাহাড়ি হয়ে ওঠা আমার ঘরণি।
বক্সা দুর্গ নিয়ে এত লেখা হয়েছে তাই এ লেখার ভার নাই বা বাড়ালাম। গ্রামের আশপাশে প্রকৃতির পরশে প্রাকৃতিক ফোটোশুটে বের হলাম সদলবলে। বন্ধু তমাল এ বার দার্শনিক তথা পথপ্রদর্শকও। নানান রঙবেরঙের প্রজাপতির চরিত্র ব্যাখ্যা করে যাচ্ছে অবলীলায়। আমার কাজ শাটার টেপা।

আলাপ হল তিন প্রজাতির তিন মাকড়শার সঙ্গেও। প্রথমেই নেফিলা। সবুজ, হলুদ আর লালের ফোঁটায় কি তার রূপের বাহার। জানা গেল কোনো এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় নাকি ট্যারেন্টুলা। কিঞ্চিৎ অ্যারাকনোফোবিক আমার ভাল অর্ধেক আমাদের এই মাকড়শা প্রীতিতে যারপরনাই বিরক্ত এবং আতঙ্কিত। এরপরেই আলাপ করা গেল ব্ল্যাক স্পাইডারদের সঙ্গে। তবে প্রেমে পড়ে গেলাম চশমা পরা মাকড়শা দেখে। স্প্রীং-এর মতন পা। সাদা মুখে কালো চশমা সদৃশ দাগ। পরিচিত নাম সিগনেচার স্পাইডার। বৈজ্ঞানিক নাম অ্যার্গিওপি অ্যানিসুজা।

প্রাতঃরাশ শেষ করার আগেই দল আরও ভারী হল। আমার এক চিত্রগ্রাহক ভ্রাতৃপ্রতিম বন্ধু সস্ত্রীক হাজির। আমারই নেমসেক। অরিন্দম এবং পারমিতা। দল অবশ্য আরও ভারী হল। অসীম, বিজয় আর বিনয়ের কল্যাণে। এরা সকলেই ভূমিপুত্র তথা তমালভক্ত। আমাদের পোর্টারের অভাব মেটানো এবং, না, সেটা যথাসময়ে প্রকাশ্য।

সমগ্র যাত্রাপথে ছোটবড় মিলিয়ে মোট বাইশটি পাহাড় পার হতে হবে। তবে সেটা কখন ঘটেছিল বোঝা যায়নি। গোটা পাঁচেকের হিসেব কষে উঠতে পেরে ছিলাম। যাত্রাপথের আশি শতাংশই বক্সা টাইগার রিজার্ভের ভিতর দিয়ে। যার অনেকটাই কোর এরিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

দুর্গের ঠিক উল্টোপথে ক্রমাগত চড়াইয়ে বক্সা গ্রাম অতিক্রম। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুপাশের ঝোপঝাড় নিবিড় হতে থাকে। আবার ঘনিয়ে আসে মেঘ। ঝাপসা হয় চারিপাশ। শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে যায় ঠাণ্ডা হিমেল পরশ। নির্বাক যাত্রীরা প্রকৃতিতে বুঁদ হয়েই ঘনিষ্ঠ হয় চলনে। হঠাৎ কিছু টুপফোঁটাদের আসা এবং আরও দ্রুততায় যাওয়া। তমালের সাথে কয়েক পা এগিয়ে ছিলাম। নারীকণ্ঠের চিৎকার পা টেনে ধরে।

সমস্যা বিশেষ কিছু না। জোঁক। তার যেমন রঙের বাহার তেমনই আকৃতির বৈচিত্র্য। তমালের নির্দেশে জোঁক নিবারণী ব্যবস্থা। প্যান্টকে প্রায় হাঁটুর কাছে গুটিয়ে নিয়ে প্রচলিত মশক নিবারণী মলম পায়ে লাগানো হল। তার যে এমন জোঁক প্রতিরোধী ক্ষমতা জানা ছিল না। যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি।

অনুভবে প্রথম পাহাড়ের মাথায়। শতাধিক বছর প্রাচীন নির্মাণ। দুর্গ পাহারা দেওয়ার দুর্গম এক ওয়াচ টাওয়ার। এরকম আরও তিনটি আছে উল্টোদিকের পর্বতচূড়ায়। এর পরের পথ ভারী বিপজ্জনক। একদিকে দেওয়াল সদৃশ পাহাড়, অন্যদিকে খাড়া খাদ। ভয়ঙ্কর সুন্দরের মানে আরও একবার হৃদয়ঙ্গম হল। সঙ্গে নাছোড়বান্দা ঘ্যানঘ্যানে জোঁকের দল। তখনও কামড় দিতে পারেনি অবশ্য। বোধহয় ঔষধিগুণেই।

দিনের প্রথম বিরতি। গ্রামের নাম চুনাভাটি। পালা আহারের। পালা মহিলাদের প্রকৃতি অনুষঙ্গের। পালা ছবির মতন ছিমছাম পার্বত্য গ্রামটির সৌন্দর্য উপভোগের। গ্রামের একপ্রান্তে নির্জন এক গুম্ফা একাকিত্বে মগ্ন। যত ছোটই হোক গাম্ভীর্যে আবহে ভক্তিরস। যতদূর চোখ যায় হঠাৎ জমাটবদ্ধ সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন পাহাড়ের সারি। তার মাঝে কুমারীর আঁকাবাঁকা সিঁথির মতন চিকচিকে ডিমা। দেখা হবেই তার সাথে পথের কোনো অচেনা বাঁকে। মেঘেদের মিনারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা যাত্রীদের অবয়বে যেন আবছা ধোঁয়াশা। সময় থমকে যায়। ছোট্ট এক পশলা বৃষ্টি শেষে আবার পথে। পাকদণ্ডি। পায়ে পায়ে সৃষ্টি সে পথের। কোথাও বেশ খাড়াই। শহুরে ফুসফুস আর্তনাদ করে। রেহাই চায়। কুর্চির সাবলীল গতি দেখে আবার শহুরে ভন্ডামির মুখোশেই মুখ ঢাকে। আর গণ্ডগোলটা বাঁধে তখনই। কুর্চির আর্তনাদে চমকে ওঠে প্রকৃতি। থমকে যাই আমরা। ককিয়ে কাঁদছে মেয়েটা। সঙ্গে বাবা আছে। কাছে যেতে রহস্য পরিষ্কার হয়।

কখন বা একটা জোঁক ধরে ছিল কুঁচকির কাছে। রক্ত খেয়ে পড়েও গেছে অনেকক্ষণ। হঠাৎ সেই রক্তাক্ত দৃশ্যে চোখ পড়তেই বিপত্তি। কিছুটা সময় দাঁড়ানো হল। দুধ খাওয়ানো হল কুর্চিকে। দেখে নেওয়া হল রক্ত বন্ধ হয়েছে কী না। সবার আগে সেই তাড়া লাগালো। চরৈবেতি, চরৈবেতি।

বারে বারে অরিন্দম আর পারমিতা পিছিয়ে পড়ায় তমাল বিরক্ত হচ্ছিল। ওদের সদ্য বিবাহ হওয়ার প্রসঙ্গ মনে করিয়ে শান্তি ফেরায় অমৃতা। কপোত কপোতী যথা উচ্চ পাহাড়চুড়ে ওদের প্রেমের কাবাবে হাড্ডি হতে ঘোরতর আপত্তি জানায় দুই মহিলাই। অগত্যা।

প্রকৃতি প্রেমেই দুধের স্বাধ মেটাই তমাল আর আমি। কয়েক পা এগোতেই মুগ্ধতা গ্রাস করে। নিচে চঞ্চলা পাহাড়ি তন্বী কিশোরীর মতন এক ঝরনা নেচে নেচে যায়। আহ্বান করে আলিঙ্গনে যেতে। তমাল জানায় ওর বাহুলগ্না হয়েই রাত্রিবাস। তাঁবু পড়বে ওখানেই। নিরন্তর ছন্দের সাহচর্যে থাকার এমন অভিজ্ঞতা আগে হয়নি। উত্তেজনা জড়িয়ে ধরে।

লামনা। ঝরনার নাম। তার পাশেই চারটি তাঁবু। তাঁবু ঘিরে জ্বলে ওঠে আগুনের প্রাকার। ভালুক জল খেতে আসতে পারে। ভোজবাজির মতন অসীমের হাতে হাজির স্প্যানিশ গিটার। ঝরনার তালে আর অসীমের সুরে জমে ওঠে ক্যাম্প ফায়ার। এক অবর্ণনীয় সাঙ্গীতিক সন্ধ্যা। হঠাৎ কয়েকজন মানুষের আগমন। কাছেই আদমা গাঁয়ের বাসিন্দা। তমালের পরিচিত। রঙ লাগে প্রাকৃতিক জলসায়। দেশি মুরগি কাঠের আগুনে গনগনে। সঙ্গে পাহাড়ি তরল অনুষঙ্গ। গানের তাল, কাঠ ফাটার আওয়াজ, ঝরনার সুর আর ঝিঁঝিঁর ঐকতান। পারফেক্ট কোলাজ। রাত বাড়ে। গ্রামবাসী ঘরে ফেরে। সুর নেতিয়ে পড়ে। আগুন স্তিমিত হয়। বাড়ে নিঃঝুম পাহাড়ি রাতের শব্দ। মিইয়ে পড়া আলোয় হঠাৎ নতুন করে প্রেমে পড়ি ঘরনীর। তার চোখেমুখে খেলা করে আলোছায়ার আহ্বান। অচেনা লাগে। যেন শতযোজন দূরের অচেনা নারী। গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে মাখনের পেলবতা। শিথিলতা নামে ধমনীতে, চেতনায়। কালো কম্বলে বুকে তুলে নেয় হিমালয়।

উপত্যকার তিনদিক ঘেরা পাহাড়ের মাথায় আবির হয় গোলাপি। গোলাপি হয় গলানো সোনা। গান শোনায় পাখি। আগের রাতের রহস্যময়তা হারিয়ে নতুন প্রাণ জাগে শরীরে। ঝরনার জলে শরীরের প্রতিটি কোষের ক্লেদ মুক্তি ঘটে। গরম বাটি ভর্তি নুডলস ফেরে হাতে হাতে। অনেক দূরের পথ। পেটের সঙ্গে কোনো আপস নয়।

পাহাড়ে সুস্থ থাকার নিয়ম। ড্রিঙ্ক মোর, পিস মোর। গত দেড় দিনে মাঝে মধ্যেই গ্রাম থাকায় দ্বিতীয়টা নিয়ে মহিলাদের সমস্যা ছিল না বিশেষ। আজ রায়মাটাঙ অবধি কোনো গ্রাম নেই। তাই অমৃতা আর তার সখীর জন্য মাঝমধ্যেই প্রহরীর ভূমিকায় তমাল বা আমি। অরিন্দম অবশ্য সুযোগ নেয়নি। পারমিতার দায়িত্ব একাই সামলেছে। শুধু প্রকৃতি অনুষঙ্গই নয়, যেখানে যেখানে হাত বাড়ানোর প্রয়োজন পথ পাড় করতে সেখানেও। আর বিজয় বেচারা মুষড়ে পড়েছে এখানেই। প্রথমদিন থেকেই শিভ্যালরির একক ধারক এবং বাহক বিজয়। যে কোনো দুর্গম পথের হদিশ মিলতেই ভাবিজানেদের জন্য জান হাজির তার। হাত ধরে নিয়ে যাওয়ার একমাত্র সখা। খালি পারমিতা ভাবির জন্য কিছু করতে না পারায় বেজায় মন খারাপ। সে জন্যই কি না জানি না, আমার ভাল অর্ধেককে একটি সমস্যাসঙ্কুল ঝরনা, যা পাথরে পা ফেলে পার হতে হয়, পার করাতে গিয়ে নিজেই সখাত সলিলে। আমার রাই!!! জীবনে আমার তোয়াক্কাই করেননি, তো বিজয় কোন ছাড়.... বেচারা বিজয়। শিভ্যালরির সাইড এফেক্ট।

পথের বাঁকে হঠাৎ দেখা। ভাবিনি সম্ভব হবে কোনোদিন.... সুন্দরী ডিমা। বার বার লুকোচুরি খেলেছে আবেগ নিয়ে। এখন ছোঁওয়া দিয়ে যায়। বুঝিনি আসলে সাবধান বাণী। সামনে বিপদ। সত্যিই তাই। এক লহমায় ডিমার নিম্নগমন। আমাদের উর্দ্ধ। কমবেশি হাজার দেড়েক ফিটের ব্যবধান। আর সেখানেই নাকি পথ নাই ওগো পথ নাই! না, ভুল বললাম। আছে। কিন্তু ওটা কি পথ! খাড়া স্লেট পাথরের মতন মসৃণ পাহাড়ি দেওয়াল। অন্যদিকে একেবারে নিচে চিকচিকে ডিমা। রাস্তা! ছয় ইঞ্চির এক ফালি পাথর প্রায় পঞ্চাশ মিটার। বেশিও হতে পারে। টিকটিকির মতন দেওয়ালে আটকে শুধু টো এর উপর ভর করে পার হতে হবে। আমি চিন্তিত আমার রাইকে নিয়ে। (প্রসঙ্গত তাঁর নাম রাই বলে যেন না ভাবেন পাঠককুল)। তাঁর প্রথম ট্রেকিং। না তিনি অবশ্য বিন্দুমাত্র বিচলিত নন। তমাল আর বিজয়ের হাত না ধরেই, শুধু ভরসা করেই পার হলেন। আমি কী করছিলাম? পতন হলে ভাগ্যবান আর না হলে ফোটোগ্রাফার.....শাটার টিপছিলাম।

সবুজে জড়ানো পাহাড়ি পথে নিরন্তর চলে যাওয়া। বিরক্তি বা ক্লান্তির লেশমাত্র নেই। মাঝে মাঝে খানিক জিড়েন। জলপান। আবার চলা। হঠাৎ রুদ্ধ হল গতি। সামনে পাহাড়। বেশ খাড়াই। তমাল জানালো আমাদের শেষ চড়াই। কিন্তু পথ কই? যে পথ দেখালো তমাল, সবার চোখ কপালে। এতো বৃষ্টি দিনের ঝরনা। এখন শুকনো। কিন্তু এছাড়া উপায় নেই। অগত্যা। প্রায় মিনিট পঁয়তাল্লিশের চেষ্টায় আজানুলম্বিত জিহ্বা আর ফুসফুসের হাহাকারকে সঙ্গী করে পর্বতারোহণ সম্পন্ন হল।

পাহাড়ের উপরটা ফ্ল্যাট। সুন্দর চাষ জমি। সবুজ ভুট্টা চারায় চোখের আরাম। আমাদেরও। শুকনো আহারে মধ্যাহ্নভোজন। কিছুটা বিশ্রাম তার পর আবার চলা। বাকি পথটা পুরোটাই গহীন অরণ্য। তবে ওঠা নেই, নামা। অরিন্দম-পারমিতা অসীম আর বিনয়ের সঙ্গে রওনা দিয়েছে। আমরাও সঙ্গী হতে যাচ্ছিলাম। বাধ সাধল কুর্চি। প্রকৃতির সাথে তার বেশ বড়সড় অ্যাপয়েন্টমেন্ট। খানিক অপেক্ষা করার পর তমাল তাড়া দিল। অনেক দূরের পথ অতএব আমি আর আইভি (আমার গৃহিণী) যেন এগিয়ে পড়ি। ভালই হল। জঙ্গলপথে এতক্ষণে মিলব মোরা দোঁহে। টুকরো-টাকরা ছবি তোলা, একটু থামা একটু চলা, জঙ্গলের গল্প বলা। বেশ একটা রোমান্টিকতার ছোঁয়া। ভাল লাগা। নিজেদের নতুন করে পাওয়া। হঠাৎ বাঁদিক থেকে একটা আওয়াজ। বার্কিং ডিয়ার ভেবে সামান্য চোখ চালিয়ে হাল ছাড়লাম। এই জঙ্গলে শহুরে চোখে খুঁজে না পাওয়ারই কথা। একটু পরে আবার সেই ডাক। পিছন থেকে। তারপর আবার। এ বার উৎস ডানদিক। প্রায় একই সাথে বাঁ দিকেও। শিরদাঁড়ায় হিমস্রোত। এক হাতে স্ত্রীর হাতটা ধরে গতি বাড়ালাম চলার। ক্রমশই আমাদের বুনো কুকুরের দল ঘিরছে বুঝতে বন্যপ্রাণ বিশেষজ্ঞ হওয়ার দরকার নেই। যত এগোই ডাকগুলো ততই কাছে আসে। ইন্ডিয়ান ওয়াইল্ড ডগস। বনের রাজাও এড়িয়ে চলে,

আমরা তো কোন ছাড়। সামনে অসীমদের টিকিও নেই। পিছনে তমালরা ঠিক কত দূরে জানা নেই তাও। রীতিমতন বিপন্ন বোধ করতে শুরু করলাম। ডাক এত কাছে যে কোনো মুহূর্তে সাক্ষাৎ মিলতে পারে শমনের। হঠাৎ সামনে নদী খাত। ছুটে নামলাম দুজনে। অল্প জল। মুখে হাসি ফুটলো। না এ জলে রোখবার পাত্র সারমেয়কুল নয়। জলে বোঁটকা গন্ধ। কাছাকাছি হাতির পালের উপস্থিতি টের পাচ্ছি। বুনো কুকুর শুধু হাতির পালকেই সমঝে চলে। সাক্ষাৎ গণেশের আশীর্বাদ। কুকুরের ডাকও বন্ধ। ধীরে সুস্থে নদী পার হলাম।
সামনেই একটা পাথরে বসা পারমিতা। পাশে অরিন্দম। দুজনের মুখ শুকিয়ে আমসি। বেজায় ভয় পেয়েছে। জানা গেল, হাতির পাল সদ্য গেছে। ওদের সামনে দিয়েই। সেই দেখে পায়ের জোর হারিয়েছে দুজনে। অসীমরা ঢের আগেই চলে গেছে। না, বুনো কুকুরের হদিশ ওরা পায়নি বলেই মনে হল। ওদের আতঙ্ক যাতে না বাড়ে তাই তখনই সে কাহিনি আর শোনালাম না। বরং পড়ন্ত আলোয় জঙ্গলপথে পা চালালাম চারজনে। পৌঁছতে হবে রায়মাটাঙ। যথা সম্ভব দ্রুত।
রাইয়ের সঙ্গে রাইয়ের দেশে পৌঁছতে লেগেছিল আরও ঘন্টা খানেক। তবে নির্বিঘ্নই ছিল বাকি পথ।

বর্তমানে আনন্দবাজার পত্রিকার মুম্বই এডিশনে মুক্ত সাংবাদিক রূপে যুক্ত অরিন্দম মুখোপাধ্যায়ের পরিচিতি মূলত টেলিভিশন জার্নালিস্ট হিসেবেই। এর আগে 'আকাশ বাংলা', 'কলকাতা টিভি', 'তারা নিউজ', 'চ্যানেল টেন' ইত্যাদি বিভিন্ন চ্যানেলে কর্মরত ছিলেন দীর্ঘদিন। ভ্রমণ এবং বন্যপ্রাণ বিষয়ক কাজ নিয়েই মেতে আছেন ইদানীং। টেলিভিশনের বিভিন্ন চ্যানেলের জন্য তৈরি করেছেন একাধিক ট্রাভেলগ। পুরস্কারও মিলেছে ডকুমেন্টারি ছবি করে।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

আমাদের ছুটি
ইচ্ছে হলেই...
বেড়ানোর কথা আর ছবি নিয়ে বাংলা ই-ম্যাগাজিন
আমাদের বাংলা | আমাদের দেশ | আমাদের পৃথিবী | আমাদের কথা
= 'আমাদের ছুটি' বাংলা আন্তর্জাল ভ্রমণপত্রিকায় আপনাকে স্বাগত জানাই = আপনার বেড়ানোর ছবি-লেখা পাঠানোর আমন্ত্রণ রইল =

ভালোলাগার মন্দারমনি

শ্রাবণী দাশগুপ্ত

~ মন্দারমনির আরও ছবি ~

দুপুর দুটো পনেরোয় কাপ্তারী এক্সপ্রেসে হাওড়া থেকে দিঘা ফ্ল্যাগ স্টেশন। মাঝে কাঁথি, এখনও সেই কন্টাই লেখা - ছোট্ট এক টুকরো থামা এক মিনিটের জন্যে। দিনে চারবার যাতায়াত করা ভারতীয় ট্রেন সময়ে পৌঁছল দেখে, ভয়ানক অবাক হলাম। পাঁচটা দশেই সাঁঝের আভাস। স্টেশন চত্বর ছাড়িয়ে রাস্তাটা হাইওয়ে হলেও, চওড়া নয়। কালীপুজোর দিন, এদিক ওদিক দুচারখানা ছোট প্যাণ্ডেল আলোয় সাজানো। বাজী পুড়ছে, পয়সা নয়। উদ্দন্ড অসভ্যতা নেই। ভালো লাগছিল। দুধারে ম্যানিকিওর না করা সহজ সবুজ। অন্ধকার চেপে এসে অস্পষ্ট ও ছায়াময়। গায়ে গায়ে খুপরি দোকান, আলো টিমটিম। আধখেঁচড়া ইঁটের বাড়ি। গাড়ি যতো এগোয়, সড়ক শীর্ণ, এক আধটা গাড়ি, ট্রেকার, ভুটভুটি, মন্দারমনি-কাঁথি বা দিঘা-কাঁথি বাস। আরও কয়েকটা আঞ্চলিক নাম লেখা (শুনিনি আমি)। বেঁকে টেরে চলেছে পাশ কাটিয়ে, যেন বনপথ ধরে চলেছি। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট চলার পরে, সঙ্কীর্ণ কাঁচা রাস্তা - দুধারে জলা, লম্বা ঘাস। ওই ঘোর আঁধারে গা-শিরশিরে ভৌতিক অনুভূতিতে বিভোর হয়ে, আধঘন্টা আরও। তারপরে গুটিকয় হোটেল, আলো জ্বলে না। চালক বলেন, ওধারে লাইট নেই কোথাও। বড় হোটেলরা জেনারেটর চালিয়ে নিজেরা বন্দোবস্ত করেছে। নজরে এলো 'সান সিটি' লেখা সাইনবোর্ড, ছোট করে লেখা 'রোজ ভ্যালি'। বিঘে বিঘে জমির ওপরে বিলাসবহুল সৈকতাবাস। এখন প্রায় জনশূন্য। পাঁচিলের আড়ালে ওয়াটার পার্ক থেকে রোপওয়ে, সব বন্ধ। গৌরী সেনের দল বিপাকে পড়েছেন যে! আলো জ্বলছিল অবশ্য। উজ্জ্বলতার পাশে বাকি অন্ধকার আরও গাঢ়।

প্রতিটা অতিথি আবাস সৈকতের ওপরে। মূল দরজার বাইরে পা ফেলতেই বালি, পরের সকালে দেখলাম। অমাবস্যা রাতের মোটা চাদর, তাই দেখতে পাই নি। সৈকতাবাসের আলোয় যতটুকু দৃশ্যমান ছিল, ব্যাস। কারণ বুঝলাম না ঠিক, শুনলাম সরকারের সহৃদয় আনুকূল্য মন্দারমনির ভাগ্যে জোটে নি এর্পযন্ত। তাই এ আঁধারে...। তা হোক্, তবু বেশ লাগছিল। চটকহীন প্রকৃতির অবিকল রূপ দেখে 'দিঠি জুড়ন গেলা'। বাইরে বসি। অবিরল ঢেউ গড়িয়ে আসার চেনা শব্দ কান ভরে। রিসর্টের গেটের বাইরে চারচালা দোকান। চটচটে শক্ত বেলাভূমির ওপর দিয়ে দৌড়চ্ছে গাড়ি, ট্রেকার, স্কুটার। তাদের আলো যতটুকু ও যতক্ষণ - ছুমন্তরে কিঞ্চিৎ দৃশ্য। আমরাও ওভাবে এসে পৌঁছেছি। জল এগিয়ে পায়ের পাতা ছোঁয় ছোঁয়। গোরু একপাল এদিক ওদিক ভূমিশয্যায়। জানি না কেন ওরা থাকে ওভাবে।

ভেবেছিলাম সূর্যোদয় দেখব, ঘর ছেড়ে কোথাও বেড়াতে গেলেই যেমন ঘন বাসনা জাগে। অথচ ক্লান্তি মেটানো আরামের ঘুম চোখ ছেড়ে যেতে চায় না বড়। তাই একটু দেরিতেই, প্রায় সাতটা বাজে তখন। সূর্য আমাদের প্রস্তুতির জন্যে 'গ্রেস টাইম' দেয় নি। তবু জুড়িয়ে গেল চোখ। ঢেউয়ের খেলা খেলছে সমুদ্দুর, যেমন আবহমান খেলে থাকে। অযথা আসা যাওয়া, ছুঁয়ে দিতে চাওয়া। সে তো এক রকম। কিন্তু এই সৈকত! কত দূর অবধি মাটির আঁচল বিছিয়ে। তাতে সোনারঙ রোদ্দুরের নিভৃত আরাম। শুধু তাকিয়ে থাকা, তাকিয়ে দেখা। দুহাত আকাশে ছুঁড়ে উদার হওয়া, আর কিছু নেই। পেছনে ঝাউসারি সবুজ পাড়ের সীমানা গেঁথে। আমরা তিনটি অবধূতের মতো ভালো লাগা মেখে ঢেউ ছুঁয়ে বাতাসের গলায় কথা বলি।

'কি, যাবেন না কি মোহনার দিকে?' এক মানুষ পাশ থেকে এসে দাঁড়ালেন ভুটভুটি নিয়ে। লুঙ্গি-পরা। বেশ পরিপাটি চুল। আন্তরিক, পরিশীলিত কথক, যেমন গ্রামীণরা হন। শহর থেকে 'বেড়াতে আসা'দের ছোঁয়াচে আধুনিকতার লেপনটি যথার্থ হয়েছে, অনেকখানি জীবিকার তাগিদেও। সেই ভোরে উনিই প্রথম - 'আর্লি বার্ড'। ভাড়া ঠিক করে ওঠা গেল। গজগমনের মতো পা দোলাতে দোলাতে চলেছি। গমগমে সমুদ্দুর বাঁদিকে। অন্যদিকে অসামান্য বিস্তার নির্জনতার, সেইটেই আমাকে বেশি টানছিল। বালির ওপরে সূক্ষ্ম দানার আলপনা বালি দিয়েই, কাঁকড়া আর ঝিনুকের দেহনিঃসৃত। মানুষটি দেখালেন হাত ছুঁড়ে - 'ওই যে দেখুন লাল কাঁকড়া।' আমরা নেমেছি যান থেকে। ছুটোছুটি করে হামলে পড়েছি, 'ও মা! ও মা! তাই না কি? কই কই?' আমাদের অভিজ্ঞতায় বিশ্বের দ্বাদশ আশ্চর্য... ক্যামেরা রেডি-ই - এ্যাকশন, শুট্! ধরি ধরি মনে করি ধরতে গেলেম... ওরা মোটেই পোজ দিল না। অসংখ্য পালাচ্ছে দৌড়াচ্ছে - দেখছি অদূর থেকে। কাছে যেতে না যেতেই নিমিষে গুহাবাসী। আমাদের পরিচালক নিজের কথা শোনাচ্ছেন মনোরম টোনে... পয়সাকড়ি বেশ আছে ওঁর, জমিজমা কাছে, গ্রামে। দুই মেয়ের তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়েছেন, ওঁদের গ্রাম্য মুসলমান সমাজের রীতি দস্তুর। ছেলেরা পড়ছে। শুনছি আলাপন। আমরা শহরবাসী গুটিয়ে থাকি, এক হই না, আত্মীয় হই না। শুনি, ভালো লাগে, নিজেদের ভাঙি না।

দূর সবুজের প্রান্ত থেকে বালিতে পায়ের ছাপ রেখে একটি অপু আসছে ছুটে... হাতে-ধরা লাল কাঁকড়া, আমাদের দেখাবে। সামনে এসে তুলে ধরে, 'কিচ্ছু করে না, দেখ দেখ।' আমরা বোকা বোকা বিস্ময়ে মূক! 'কী দারুণ। দাঁড়া ছবি তুলি এবারে, একটাকে তো পাওয়া গেল।' কাঁকড়া ছেড়ে দিয়েছে বালিতে, সেটি লজ্জায় আত্মহত্যার কথা ভাবছিল কি না, জানি না। দেখা হল, ফোটো হল, সব হল। 'অপু' বলল, 'পয়সা দেবে বাবু, বিসকুট খাব?' আমাদের গুজগুজ - অস্বস্তি - দশ-বিশ টাকা রাস্তায় 'ছুঁড়ে ফেলতে'ও পারি, তা বলে বাচ্চাটার এই ভিক্ষে শিক্ষে? 'এ্যাই, ইস্কুলে যাস না?' যেন ইস্কুলে গেলে সব সমাধান... সব ভালো, সব আলো জ্বলে জ্বলে উঠবে। 'যায় যায়, ওই যে দুপুরে খাবার দেয়', আমাদের পরিচালক বলেন, 'দ্যান বাবু বড্ড গরীব, ওর

বাপের জমিটমি নাই কিছু।' দেখে নিয়েছে আরও কয়েকটি অপু দুগ্‌গা পটু বিনি! ওদের কাছেও লাল কাঁকড়া। এসেছে এক সাথে, 'পয়সা দেবে, বিসকুট খাবো?' পিছু ছাড়ে না কিছুতেই! খুচরো শেষ হয়ে আসে। বিস্কুটই তো? প্রশ্ন খোঁচায় - শৈশব...এই শৈশব...! এভাবেই শুরু? বিশাল উদার প্রকৃতির প্রান্তে এসে অনুদার হতে ইচ্ছে করে না। নিজেরাই তো কত খরচ করে রিসর্টে...। অদূরে নদীর মোহনা, বালির ওপরে দাঁড়িয়ে দেখি। অন্ধকার, কালো আর সমস্যাগুলো ভাসিয়ে দেবার মন নিয়ে আলো চোখে দাঁড়িয়ে থাকি। সপ্তডিঙা মধুকর চলেছে সারি সারি জলের ওপরে। মাছ-ধরা জেলে ডিঙি। কী অপরূপ প্রশান্তি সবখানে।

উলটো রাস্তা ধরে ফেরে ভুটভুটি। রিসর্টের সামনেই কারা ওয়াটার স্পোর্টস্-এর সরঞ্জাম গুছিয়ে বসেছে - এও ব্যবসা। আকাশে ওড়ো বেলুন চেপে, জলে নেমে স্কুটার চালিয়ে ভেজো, মোটর বোটে ঢেউয়ের মাথায় চড়ে নাচো! ইচ্ছে করছিল, একটু ভীতিও যে...। আপাতত চিন্তাটুকু যেন টলমলে, আমাদের যান এগোতে থাকে। সমুদ্দুরও 'এই খেলবি? খেলবি না কি?' করে পাড়ের দিকে ঢেউ ছুঁড়ে দিচ্ছে। সুজ্যিঠাকুর হেলাফেলায় আঁচ বাড়াচ্ছেন, কমাচ্ছেন। মেঘগুলো ভারী নেকী কি না! ওপাশ জুড়ে বৃহৎ মানে বিস্তৃত, মানে আলিশান ক্যাম্পাস 'রোজ ভ্যালি সান সিটি'র। সব ভুলে তাকিয়ে, চোখ যায় ধাঁধিয়ে। উঁ-চু পাঁচিলের ভেতরে যন্তরমন্তর, খেলাখেলি। বাইরে বোল্ডার বসানো(যদিও ঢেউ কদাপি অত দূরে পৌঁছায় না)। সমুদ্রমুখী সারি সারি দোতলার বারান্দা। মন্দারমনি যে আদ্যোপান্ত পশ্চিমবঙ্গীয় গ্রাম ভুলিয়ে দেওয়ার যৎপরোনাস্তি চেষ্টা। মন্দির আছে, ঢুকে দেখার অনুমতি দিলেন না সিকিউরিটি, বাইরে থেকে 'নমো নমো গৌরী সেন' বলে কপালে হাত ঠেকালাম।

পাকস্থলী জানান দিচ্ছে, জাবনা দেওয়ার আয়োজন করা দরকার। বিরতি দিয়ে রিসর্টে ফিরি। তার বর্ণন না করি, তবে এটুকু বলি, সামগ্রিকভাবেই প্রকৃতি-নির্ভর, বাহুল্যহীন ও অতি মননশীল পরিকাঠামো। ভালো লাগাটা সহজ হয়ে আপনা থেকে উঠে আসে। বাঙালি মালিকানা, সৌহার্দ্য ও অতিথিপরায়নতা কর্মীদের। কে বলে বাঙালি ব্যবসাবিমুখ? গত রাতে এখানে পরিচয় হয়েছিল এক নিবিড় আত্মমগ্ন মৃৎশিল্পীর সঙ্গে। এক দলা এঁটেল মাটি, দুহাতের দশ আঙুল আর ছোট্ট এক ছেনি - একের পর এক সৃষ্টির মহিমায় মিশে আছেন। রাষ্ট্রপতি পুরষ্কার পেয়েছেন, জানালেন বিনা অহমিকায়। কলকাতায় অবারিত গতায়াত - 'সৃষ্টি'র দুর্গামূর্তি গঠন করেন। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জেনে নিলাম আর দু'চার কথা। শুনলাম চুপচাপ... দেখলাম ক্যাম্পাস জুড়ে তাঁর কাজ, মন জুড়নো।

পায়ের যা অবস্থা আমার, ধকল সয় না। একটু পরেই জিরোন চায়। খানিক পরে বের হলাম, সমুদ্রস্নান করতেই। সমুদ্রের ঢেউ দেখে দূর থেকে ভাবি, ভারী হম্বিতম্বি - 'এইও, আমাকে ভয় পাস না নাকি?' এরকম করে চোখ পাকাচ্ছে গাল ফুলিয়ে। এক পা এক পা সাহস করি আমরা। শক্ত মাটি পায়ের নিচে, বালি ভুসভুস না। এই ডুবল গোড়ালি, ওই দূর থেকে ঢেউ পাকাচ্ছে, আমরা পায়ের নিচে বালিমাটি আঁকড়ে। যেমন হয় পুরীতে - মাটি কখন সরে যায় পায়ের নিচ থেকে - ধরণী দ্বিধা, স্নানার্থীর তোয়াক্কা না করে! দূর, ও রকম কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। বাচ্চা বাচ্চা ঢেউ, গায়ে জোর নেই একফোঁট্টা। আবার পদক্ষেপ একটুকু, ইস্, জল হাঁটুও ছোঁয়নি! কিন্তু দেখাচ্ছে যেন একটা বিষম গোলমাল পাকাতে আসছে প্রায় সুনামির মতো। তীরের কাছে আহ্লাদীপনা, 'এই চ', কুমীরডাঙা?' অতএব বেশ দুর্দম নাবিকের সাহসে, হারিয়ে যাব অকুল অচিন্ পাথারে - ভেবে নেওয়া যাক। ব্যাপারটা প্রায় তেমন, এত নীরব এত নিশ্চিন্দি, এত জনবিরল - এই স্বাভাবিক। যত ভাবি, দিক্ না দুএক ধাক্কা, দিক্ না ফেলে, আছড়ে - নাঃ অনেক দূর অবধি শুধু কোমর জল। কলকাতার বর্ষাকালে একবার এরকম - ভেবেই রোমাঞ্চিত! এভাবেই তিনটি ঘন্টা নিশ্চিন্তে - খেলা খেলা সারা বেলা। বালিতে কালচে পলি, কাদা ঘুলিয়ে ওঠে জলের সঙ্গে। পায়ে সুড়সুড়ি জলজ লতাপাতার, স্টার ফিশ, শঙ্কর মাছের লেজ। অসংখ্য দেখেছি ভেজা বালিতে, অবশ্যই ক্ষুদ্রাকৃতি। আমার তনয়া আবার 'pisces' খুব জলবিলাসী। অনেক কষ্টে টেনেটুনে...।

খাওয়ার পর দিবানিদ্রাটি ভেঙে বেরিয়ে দেখি, দিনের আলো নিভে এল সুজ্যি ডোবে ডোবে। ঘোর ঘোর আঁধার নামছে। যেহেতু তীরে একফোঁটা আলো নেই, মানে কোনও ল্যাম্পপোস্টও, একটু পরে ঠিক 'খাব তোকে ঘচাং ফু'! আকাশ দেখে মনে হচ্ছে দশমীর সিঁদুর খেলা হয়ে গেছে একটু আগে - 'ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ'। আমরা ফাঁকতালে সান্ধ্য ভ্রমণ সেরে নিই - হঠাৎ স্বাস্থ্য সচেতনতা। কতটুকু সময় আর? জল ছুঁয়ে চলে আসি, পাড়ে দাঁড়িয়ে চলমানতার আওয়াজ শুনতে পাই। ব্যাস। ট্রেকার, গাড়ি, স্কুটার নির্ভয়ে বালি পার হয়ে যায়, আসে। দেখি, তারপর রিসর্টে ঢুকে আসি। ঝাউবনে পাতা ঝিরঝির, অন্ধকারে তারা আকাশ, দূর থেকে গড়িয়ে আসা ঢেউ। মানুষ কতভাবে যে প্রকৃতির কাছে ঋণী!

যেখানে ছিলাম, বেশ কুঞ্জবন কুঞ্জবন ভাব। মৃৎশিল্পীর কাজ টেরাকোটার মূর্তি, ঝাউবন, মায়াময় আলো, এমন কী শান্তিনিকেতনী নাম দিয়ে অঞ্চল বিভাজন - 'শ্যামলী', 'উদীচী' - এরকম। রাত্তিরে প্রতিজ্ঞা নিয়ে শোয়া গেল, সূর্যোদয় দেখবই দেখব।

সাড়ে পাঁচটায় দিগন্ত ছাপিয়ে আলো ফুটছে, ঢেউয়ের আনাগোনা তেমনই। তড়িঘড়ি গেটে এসে ন্যাকার মতো শুধোই, 'এখানে কখন সূর্য ওঠে ভাই?' চরাচরে কোথাও সূর্য ওঠে, কোথাও ডোবে, এই দৈনন্দিন যতটা স্বাভাবিক, ভুরু কুঁচকে ভাবতে বসলে, তার চেয়ে কোটি গুণ রহস্যাবৃত। আমরা দুটো ঘটনার সমন্বয় ঘটিয়ে সমস্তটুকু সহজ করে, আপন করে নিয়ে বলি, 'ওঠ ওঠ, ভোর হল যে!', সূর্য উঠে পড়ে। খোলা নীলের দিকে তাকিয়ে থাকি, 'ক-খ-ন?' আরও অল্প দুচার মানুষ ক্যামেরা নিয়ে...। কত জায়গায় কতভাবে এই দেখা, এই ভালো লাগা, ক্যামেরাবন্দী করে রাখা। অথচ ভাবছিলাম, সে কি আজ দেখা দেবে, না দেবে না? শেষ অবধি একটু একটু করে... ওই ওই ওই যে! ওঁ জবাকুসুমসংকাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্। জলে রঙ, আবার মুগ্ধ হওয়া, যেমন শহুরেরা চিরকাল হয়ে এসেছে।

এদিকে এপাড়ে, আগের সকালে যা যা দেখেছিলাম, ঠিক তেমন করে জাগছে জগৎ, গ্রাম, সমুদ্রতীর। ভুটভুটি, জল খেলার আয়োজন।

চায়ের জন্যে প্রাণমন আকুলি বিকুলি। বেরোনোর আগে খাইনি। বালির ওপরে ছোট্ট চালাঘর, আপ্যায়ন দুহাত ছড়িয়ে। আশা করেছিলাম মাটির খুড়ি, বদলে কাগজের কাপ। আর দুপুরে খাওয়ার আমন্ত্রণ (অবশ্য নিখরচায় নয়)। সে যাই হোক, 'জানাবাবু' জানাতে বলেছেন সকলকে - যদি কেউ মন্দারমনি বেড়াতে যান, ওঁর কাছে খাবেন। আমরা মৎস্যলোভী। মাছের ফিরিস্তি নিলাম। টাইগার প্রন খাওয়াবেন, অথবা পমফ্রেট বা ভেটকি, যেটা পছন্দ। সঙ্গে কি? মানে, তরিতরকারি? বাচন শুধু মৌখিক নয়, শারীরিকও, হাত নেড়ে দেখালেন, 'সরু চালের ভাত, মুগের ডাল, আলুভাজা।' বারে বারে বললেন, 'হোটেলে তো রোজই খেলেন, দেখেন না আমি কেমন খাওয়াই!' ভালো লাগল, তবু অনিশ্চিত, 'মাছ টাটকা দেবেন তো?'

আমার হাজারি-ঠাকুরের কথা মনে পড়ছিল কেন কে জানে!

যে যেমন দেখে, স্থান মাহাত্ম্য তার কাছে তেমন, এই স্বীকৃত সত্য। গোলাপের দিকে চেয়ে বললে গোলাপ সুন্দর, গোবর দেখে নাক সিঁটকে বোঝাই, ওটা গোবর। আমার হল, ওই নীরব মুক্তিটুকুর আমেজ খুঁজে বুঁদ হয়ে থাকা। তবে, আমাদের দেশটা নির্জনতার কদর করে কই? অখ্যাত, অবিখ্যাত কোনও এক জায়গা সন্ধানী পর্যটকের আবিষ্কারে সার্থক হওয়ামাত্র হৈহৈ রৈরৈ, যতক্ষণ পর্যন্ত নাক মুখ কুঁচকে না উঠছে, 'ছিঃ দিঘা! ওখানে কেউ যায় আজকাল?' ঘটনা এরকম। পর্যটকের ধাক্কাধাক্কি আর অশালীন ভীড়ে বেড়ানো মাটি। সৌন্দর্য ভোগের ত্র্যহস্পর্শ। আর যে জায়গা সরকারি দাক্ষিণ্য বঞ্চিত, সম্বল শুধু পর্যটক। যাক্ কচকচি। এরাজ্য তো আরও চমৎকার - দলনীতি, ভয়নীতি এবং 'বরাভয়'-নীতির আঁতুড় তথা উপবন।

রোদ্দুর বড্ড তেজী। এমনিতেও সমুদ্রে নামার পরিকল্পনা নেই, কারণ ফিরতে হবে। রিসর্ট চত্বরে এলোমেলো পদচারণা, বিল মেটানো, ইত্যাদি। এক প্রান্তে ওয়াচ টাওয়ার আছে, সেখানে উঠে আশপাশ দেখি। যারা জলে গেছে, হিংসে করি, ইস কি মজা! দোপহর কা খানা - 'হাজারি ঠাকুরে'র হোটেলে। পরিপাটি ডাল-ভাত-ভাজা, লেবু-লঙ্কা-নুন। চিংড়িগুলো অসম্ভব টাটকা, যেমন বলেছিলেন, ফাঁকি দেন নি। চমৎকার ঝাল ঝাল রান্না - একেবারে ঘরোয়া। চালাঘরের মধ্যে রন্ধনশিল্পী, খুব সম্ভব পত্নী। উনুনে লোহার কড়াতে, কাঠের জ্বালে, বাটা মশলার রান্না... বাহুল্য নেই, কিন্তু এমন স্বাদু কেন, কারণ বুঝতে অসুবিধে হল না। কি বলব ভেবে পাই না। 'আবার যখন আসব, আপনার চালাঘর পাকাপোক্ত ও বড়ো হোটেল হয়ে যাবে,' শুনে বললেন, 'সবাই বলেন এমনটা... আট বছর ধরে এখানেই আমি।'

দিঘা থেকে ফিরতি ট্রেন। দুটো নাগাদ বেরিয়ে পড়া হল। শুরুতে একই পথ ওদিকে। ঝাঁ ঝাঁ দুপুর, সব স্পষ্ট, খুল্লম খুল্লা ভালো ও মন্দ। দুপাশে জলার মধ্যে দিয়ে মাটির সরু পথ দৃশ্য। সে রাতে গাড়িতে বসে ভয়ভয় করছিল, এবারে চোখ সরে না। কুঁড়ে, গোরু, মুরগি, ধানক্ষেত, ভাঙা কোঠাঘর যথাযথ। কিন্তু সুরে তালে মেলে না! ঘন বাঁশঝাড়ে বাধা পেয়ে মাটিতে আসার সুযোগ খুঁজছে রোদ। বিভূতিভূষণের গ্রামবাংলা মনে পড়ে, এমনটাই যেন। দুপা এগোতে না এগোতে বদলে যায় ছবি, 'ভোডাফোনের' বা ফেয়ারনেস ক্রিমের হোর্ডিং। ভাঙা পাঁচিলে বিজ্ঞাপন। বিতৃষ্ণায় জ্বলি।

চুপ কর্, স্যাডিস্ট নাকি? বকুনি দিই নিজেকে। তাও ভাবনার ঘরে তালা পড়ে কই? শহর যবে থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসতে শুরু করেছে, অনেক কিছু খোয়া গেছে গ্রাম থেকে - 'বুক-ভরা মধু বঙ্গের বধু' এখন টেলিভিশনের অখাদ্যি সিরিয়ালে। শহর গ্রামকে কুমীরের মতো আধা গিলে ছিবড়ে করে রেখেছে। উহার নাম 'মফঃস্বল'! সব মালামাল এখন। বিরক্ত লাগে, ভালো লাগা উবে যায়, যত রাস্তা এগোতে থাকি।

ভর দুপুরে দিঘা। আকার প্রকার দেখে টের পাওয়া যায় সরকারী নেক নজর। দিঘা আগে বার দুই এসেছি, ঠিক আছে... উঁহু... মানে, ওই আর কি! থিকথিক বড্ড বেশি। দিঘা স্টেশন ছাড়িয়ে এগোয় গাড়ি। নিউ দিঘা - বিস্বাদ খিচুড়ি পরিবেশ। ভাঙাচোরা খোবলানো পাকা রাস্তা, চালাঘরে ঝিনুকের উপহার সম্ভার। একপাশে হোটেলগুলো, তাদের বিজ্ঞাপন পোস্টার, এই সব। দুঘন্টার ওপরে বসে থাকতে হবে। তারপর ট্রেন। পাড় বাঁধানো সমুদ্রের রাস্তার ধারে বেঞ্চিতে বসি। লাউড স্পিকারে 'আমার পূজার ফুল' ইত্যাদি আরও সব গান প্রবল সরব - রসভঙ্গ আর নির্জনতার রক্তাক্ত বলিদান। চুপচাপ আমরা সমুদ্রমুখী। সিঁড়ি বেয়ে ভেজা বালিতে গেছেন অনেক মানুষ। আরও বাড়ছে। আইসক্রিমের গাড়ি, আইস-গোলা, কুলফির গাড়ি। রোদের দাপট কমে আসে ক্রমে। লাল গোলাটি কখন লুকিয়ে পড়ে ল্যাম্পপোস্টের আর ছোটো দোকানের আড়াল খুঁজে।

দিঘা স্টেশন। অবাক হই! ছোট্টমতো, শিশু স্টেশন। ঝকঝকে তকতকে - অবিশ্বাস্য লাগে যেন। লোকসংখ্যার বাড়াবাড়ি না থাকলে সব সুন্দর, সব পরিচ্ছন্ন, সব পরিমিত। ট্রেনের অপেক্ষায় আমরা... ব্যাক টু হাওড়া।

~ মন্দারমনির আরও ছবি ~

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী শ্রাবণী বর্তমানে স্বামীর কর্মসূত্রে রাঁচিতে থাকেন। কিছুদিন স্কুলে চাকরির পর বাড়িতে থিতু হয়ে এখন লেখালেখিই আর বই পড়াই ভাললাগার বিষয়। বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিন এবং ই-ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে ছোট গল্প। পাহাড় আর জঙ্গল খুব প্রিয়। বেড়াতে ভালোবাসলেও ভ্রমণ কাহিনি লেখায় হাত পাকানো অল্পদিন।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

= 'আমাদের ছুটি' বাংলা আন্তর্জাল ভ্রমণপত্রিকায় আপনাকে স্বাগত জানাই = আপনার বেড়ানোর ছবি-লেখা পাঠানোর আমন্ত্রণ রইল

আবার পুরী

তপন পাল

~ পুরীর তথ্য ~ পুরীর আরও ছবি ~

অবশেষে এই পূজোতেও পুরী যাওয়া সাব্যস্ত হলো। বিবাহের ত্রিংশত বর্ষে সপ্তদশতম বার পুরী ভ্রমণ। হিসাবটি যুগল ভ্রমণের; কারণ সমুদ্র দেখতে মধ্যে মধ্যে একদিনের জন্য - শ্রীজগন্নাথে গমন, পরদিন সকালে পৌঁছে এবং সেই দিন রাতেই উহাতেই প্রত্যাবর্তন - পুরী আমি একা হামেশাই যাই।

কিন্তু যুগল ভ্রমণের হ্যাপাই আলাদা। ভোর ভোর পুরী পৌঁছতে ভালো লাগে। ভালো লাগে হোটেল যাওয়ার পথে মুখে নোনা হাওয়ার ঝাপটা। কিন্তু শনিবার শিয়ালদহ-পুরী দুরন্ত এক্সপ্রেস নেই। একটি বিশেষ রেলগাড়ি (০৮৪০২) শনিবার সাঁত্রাগাছি ছেড়ে দুরন্তর মতোই পরদিন ভোর চারটেয় পুরী পৌঁছোয়। অগত্যা পর্বতসম ওভারব্রীজ পেরিয়ে অগতির গতি সেই রেলগাড়ি।

যাত্রা - ৩০ আগষ্ট শনিবার রেলগাড়িতে চেপে বসা গেল। বারবার যাতায়াতের সূত্রে জানি - এই গাড়িটিতে খড়্গপুর থেকে মনোরম আমিষ আহার্য মেলে। কিন্তু দিনটি শনিবার - অগত্যা গৃহপালিত আলুচচ্চড়ি পরোটা।

১ম দিন – পরদিন প্রবল বৃষ্টির মধ্যে পুরী। সপ্তদশতমবার সৈকতের সেই একই বাঙালি হোটেল। আমি একা গেলে ওই হোটেলের পিছনের একটি হোটেলে উঠি। তার কর্মচারীর সঙ্গে এই সকালে দেখা - দেখা আমাদের দীর্ঘকালীন পাণ্ডা মহারাজের সঙ্গেও।

স্নান, আহারের হ্যাপা নেই। সাতটার মধ্যে মন্দিরে, সঙ্গী যথারীতি বৃষ্টি। তবে দেখা গেল আমাদের কালীঘাটের মতো জগন্নাথ মন্দিরে কদাচ জল দাঁড়ায় না। পড়ামাত্র হু হু করে সিঁড়ি ও ঢাল বেয়ে সিংহদরজার নীচের নালা দিয়ে সমুদ্রে চলে গেল। যথাবিহিত দর্শন, পূজা..... জগন্নাথ তো অপরাপর দেবতার মতো পিতা নন; গনেশের মতো জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও নন, সখা। তা সখাসন্নিধানে, সখা সন্দর্শন করে কার না আনন্দ হয়! জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ...

কিন্তু আমাদের বেড়াতে যাওয়ার মূল উদ্দেশ্য তো বিশ্রাম, আহার ও নিদ্রা। দুপুরে ভূরিভোজন। তৎপরে অকালনিদ্রা-অপরাহ্নে সায়াহ্নে ঘরের বারান্দা থেকে বৃষ্টিস্নাত সমুদ্রদর্শন।

তবে শুয়ে বসে দিন কাটালে তো চলবে না। চরৈবেতি। কে না জানে - যে শুইয়া থাকে তাহার ভাগ্যও শুইয়া থাকে! তাই হোটেলে বলি, কাল সকাল সাতটায় আমাদের একটা গাড়ি লাগবে। বার বার যাতায়াতের সূত্রে পুরী শহরটি এবং শহরস্থিত তথা শহর থেকে দূরের দ্রষ্টব্যগুলি চেনা। পুরীকে ঘিরে চারপাশের দর্শনীয় স্থান - যেমন রামচন্ডি, বলিহারিচন্ডি, অলরনাথ, সাতপড়া, পিপলি, কোনার্ক, চন্দ্রভাগা, শিশুপালগড়, হিরাপুর, বেলেকাটি, অত্রি, বালিঘাই, কুরুমা, বেলেশ্বর, রঘুবাজপুর, ধৌলি, ধবলেশ্বর, কাকতপুর, অন্তরঙ্গ... ভুবনেশ্বর ও পুরীর অগণন মন্দিররাজি - এ সবই কোনও না কোনোবারে দেখা।

বেশ কয়েকবছর আগে, মেদিনীপুরের এক প্রত্যন্তগ্রামে পটচিত্র ও পটচিত্রীদের ছবি তুলতে গিয়ে একটি ইতালীয় মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। মেয়েটি জননাট্যের (Folk Theatre) গবেষক। সেই সূত্রেই তাঁর ভারতে আগমন ও দীর্ঘকালীন অবস্থিতি। কথা প্রসঙ্গে তিনি আমাকে ভুবনেশ্বরের নিকটবর্তী হিরাপুরের চৌষট্টি যোগিনী মন্দিরের কথা বলেন। মেম দিদিমণির মনে হয়েছিল তন্ত্র রীতির এই মন্দিরটি নারীর বহুমুখী প্রতিভা ও ব্যসনের প্রতীক। পরের বার পুরী গিয়ে হোটেলের ট্রাভেল ডেস্কে ওই কথা বললে তাঁরাও অবাক, ওমত কোন মন্দিরের কথা তাঁরা কস্মিনকালেও শোনেননি। শেষে চলো তো, খুঁজে নেব বলে বেরিয়ে অবশেষে খুঁজে পাওয়া গেল। সঙ্গে শিশুপালগড়। সব দেখেশুনে শ্রীমতী পালকে সারথি বাবাজীবনের অবাক জিজ্ঞাসা- "দিদি - আপনি কি প্রফেসর"?

কিন্তু এই বছরটা তো শ্রী জগন্নাথের নবকলেবর। আর এই কলেবরের কাঠ কোথায় পাওয়া যাবে সেই নির্দেশ দেন নাকি কাকতপুরের দেবী মঙ্গলা। ফলে এইবার কাকতপুর না গেলেই নয়।

দ্বিতীয় দিন – সকাল সাতটার মধ্যে তৈরি হয়ে নিয়ে গাড়ির লোককে ফোন করি। ফোন পেয়ে তিনি অবাক! সত্যিই কি তোমরা এই বৃষ্টির মধ্যে বেরোবে! তোমরা হোটেলে আছ বলে বুঝতে পারছ না, সারা শহর জলময়। তবু আমরা বেরোবই। অগত্যা গাড়ি এল পৌনে আটটায়। বৃষ্টিস্নাত আবহাওয়ায় বর্হিগমন মাত্র মিনিট দশেকের মধ্যেই শহরের সীমানা ছাড়িয়ে মৌসুমীদাক্ষিণ্যসিক্ত সবুজ ভূচিত্রের মধ্য দিয়ে প্রশস্ত রাজপথ ধেয়ে ছুটে চলা। তখন পাতায় পাতায় বিন্দু বিন্দু ঝরে জল...

শহরের উপকণ্ঠে, জাতীয় সড়কের ওপরে বটমঙ্গলা মন্দিরটি আমার বড় প্রিয়। ওড়িয়া ভাষায় বট শব্দের অর্থ পথ। অর্থাৎ পথের দেবী। অনেকটা আমাদের নাচিন্দা (পূর্ব মেদিনীপুর) ধরনের - সেখানে নতুন গাড়ি কিনে লোকে পুজো করাতে আসেন - এমনকি ড্রাইভিং লাইসেন্স পেয়ে পুরোহিতকে বলেন একটু মায়ের ঘটে ছুঁইয়ে দিতে। নিচু ছাদের ছোট মন্দির- মাথা নিচু করে ঢুকতে হল - কিন্ত ভারী জমজমাট। অনর্গল মন্ত্রোচ্চারণ আর ঢোকার মুখে ঝোলানো অসংখ্য পেতলের ঘন্টার সম্মিলিত ধ্বনি, ধূপ ধোঁয়া-ফুল মালা...

তারপর পুরী কোণার্ক মেরিন ড্রাইভ। কেয়া ঝোপ আর কাজু বাগিচার মধ্যে দিয়ে সংরক্ষিত অরণ্যের গা বেয়ে পথ। পথে নুয়ানই ও ভার্গবী নদী। পরবর্তী বিরতি রামচন্ডি মন্দিরে। পূর্বে রামচন্ডি ও পশ্চিমে বলিহারিচন্ডি; এই দুই শাক্ত দেবী নাকি বৈষ্ণব জগন্নাথের মেন্টর - সমুদ্রের আগ্রাসন থেকে জগন্নাথ মন্দিরকে রক্ষা করতে সদাসতর্ক।

রামচন্ডি মন্দিরটি কুশভদ্রা নদীর মোহনায়। বোটিং এর ব্যবস্থা আছে - নদীর শান্ত জল পেরিয়ে তারপর একটি সৈকতে যেতে হয়; সমুদ্র সেখানে শুরু। জায়গাটি জনপ্রিয় পিকনিক স্পট, এবং নিসর্গ তথায় অতি মনোরম।

কিন্তু এবারে কপাল মন্দ। তাতার সৈন্যের মত ধেয়ে আসছে উপসাগরীয় বৃষ্টি, সঙ্গে এলোপাথাড়ি হাওয়া। ছাতা, দুরবীন, ক্যামেরা, কিছুই বার করা যাচ্ছে না। অগত্যা মুঠিফোনে ছবি।

সমুদ্রের গা দিয়ে রাস্তা, অভয়ারণ্যের মধ্য দিয়ে। চন্দ্রভাগা সৈকতে নেমে দেখি সমুদ্র উত্তাল। জলের নীল রং বদলে কালো। ঢেউয়ের ভেঙ্গে পড়া ফেনা তুলোবীজের মত উড়ে যাচ্ছে হাওয়ায়। সঙ্গে প্রবল বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ। সৈকতের পাশেই জয়দেব পার্ক। গীতগোবিন্দের জয়দেবকে নিয়ে বাংলা-ওড়িশার দ্বন্দ্ব অনেকদিনের।

বহুচর্চিত কোণার্ক মন্দিরকে পাশ কাটিয়ে কোণার্ক-কাকতপুর রাস্তা ধরে কাকতপুর। ওড়িশার রাস্তা আমাদের কাছে সততই এক বিস্ময়। আমাদের মতই বৃষ্টিপ্রবণ এলাকা হওয়া সত্ত্বেও কোন মন্ত্রবলে তাঁরা তাঁদের সমুদয় রাস্তা বছরভর পরিপাটি রাখেন ঈশ্বর জানেন। পথেই দয়া ও কাদুয়া নদী। মন্দিরটি বিস্তৃত। মূল বিগ্রহের মন্দিরের পাশাপাশি আরও অনেকগুলি মন্দির। নানাবিধ মাতৃমূর্তির দেওয়াল চিত্র, তন্মধ্যে আমাদের দুর্গা ও কালী বিরজমানা।

ওড়িশা মন্দিরময়। পথে ঘাটে মন্দির ছড়ানো অধিকাংশই সুবৃহৎ। সর্বসময়ের জন্য এক বা একাধিক পুরোহিত সম্পন্ন। পুরোহিত মশাইরা অধিকাংশই দ্বিচক্রযানারুঢ়, হাতে স্মার্টফোন। মন্দিরগুলির রক্ষণাবেক্ষণও যথাযথ। এই মন্দিররাজির অর্থনৈতিক চালিকাশক্তিটি কোথায় জানতে বড় আগ্রহ হয়। আমাদের মন্দিররাজির মতো তাঁরা যে দু পাঁচ দশ টাকার প্রণামী নির্ভর নন, তা মন্দিররাজির রক্ষণাবেক্ষণ ও নিত্যপূজার আয়োজন দেখলেই বোঝা যায়। সম্ভবত পারিবারিক দাক্ষিণ্য, ট্রাষ্ট মারফৎ, এবং বাঁধা আয় তাদের সজীব রেখেছে।

তারপর অনেকখানি পথ গিয়ে অন্তরঙ্গ। ছোটখাট একটি গঞ্জ বলা যেতে পারে। সেখান থেকে গ্রামীণ রাস্তা ধরে, ধানখেতের মধ্য দিয়ে এঁকে বেঁকে অনেকখানি পথ গিয়ে জাহানিয়া পির সাহেবের মাজার। ওড়িশার প্রত্যন্ত গ্রামে অন্য সম্প্রদায়ের একটি ধর্মস্থান অবাক করে। ধরাবাঁধা ইসলামের প্রান্তবর্তী এই ধরনের পির, সুফি, আউলিয়াদের ধর্মস্থানে সাধারণত উভয় সম্প্রদায়েরই মানুষজন যাতায়াত করেন। মাজারে প্রণাম ঠুকে সৈকতে। বৃষ্টি তখন শরবৃষ্টি করে চলেছে; সৈকতে যতদূর চোখ যায়, ডাইনে ও বামে আমি একা। সমুদ্রের জল ঘন কালো- সে যেন অতিশয় জ্যান্ত, বাস্তব, আগ্রাসী এক অস্তিত্ব। তার সেই মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে বাস্তবিকই ভয় করে। অন্তরঙ্গে সমুদ্র দেখা জীবনের একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়ে থাকবে।

দীঘার নিকটবর্তী বিচিত্রপুরের মত এখানেও ম্যানগ্রোভ অরণ্য সৃষ্টির কাজ চলছে। গোলিয়াথ হেরণ, ব্ল্যাক হেডেড জাকানা, স্নাইপ, পার্পল মুরহেন পাখিদের আনাগোনা।

ফিরতি পথে আরও কয়েকটি জায়গায় যাওয়ার পরিকল্পনা ছিলো - কিন্তু ভিজে কাপড়ে বেড়াবার ইচ্ছা তখন উবে গেছে। ফেরার পথে কোণার্কে মধ্যাহ্নভোজ। বেলা তিনটেয় হোটেল।

তৃতীয় দিন – পরদিন, অর্থাৎ মঙ্গলবার, সকাল থেকে আকাশের মুখ ভার। জলে নামতে স্থানীয় প্রশাসন বারণ করছিলেন। তাই সৈকতে বসে ঢেউয়ের ঝাপটা খাওয়ার ইচ্ছা হল। কিন্তু গোটা দুয়েক ঝাপটা খেয়েই মালুম হল যে আমার বয়স বেড়েছে, অগত্যা সুবোধ বালকের ন্যায়

গৃহকোণে। মন্দিরে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কোন গূঢ় কারণে মন্দিরে আধুনিক ছাতার প্রবেশ নিষেধ। পুরোহিত কুলের শিরে লাঠির ডগায় তালপাতার সদাখোলা ছাতা শোভা পেলেও পেতে পারে; কিন্তু ভক্তকুলের ছত্রধারী হওয়া নৈব নৈব চ। অপরাহ্নে আকাশ একটু পরিস্কার হতে পশ্চিমে রিক্সায় মোহনায় - সৈকত সেখানে নির্জন; রিভার টার্ন আর দাঁড়কাকদের রাজত্ব। সৈকতে শঙ্খ ও ঝিনুকের সমাহার।
মঙ্গলবার অপরাহ্নে আকাশ পরিস্কার হতে মনে কিঞ্চিৎ আশা জেগেছিল। কিন্তু রাত তিনটেয় হোটেল ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখতে দেখতে দূর দিগন্তে দেখলাম নীল আলোর আস্ফালন। মুহুর্মুহু বিদ্যুৎচমকে ছিঁড়ে যাচ্ছে রাত্রির গাঢ় তমসা।

চতুর্থ দিন – পরদিন বুধবার সারাদিন বাদলের ধারাপাত। শোনা গেল নতুন এক নিম্নচাপ দ্বারে সমাগত। আমরা গৃহবন্দী। এবং বৃহস্পতিবারও তাই।
বিগত চার দশকে বহু বার পুরী যাতায়াতের সূত্রে হারানো কয়েকটি জিনিষ মনকে নাড়ায়। প্রথমত, তথাকথিত হরিণের চামড়ার চটি - জলের ছোঁয়ায় যার গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটত। দ্বিতীয়তঃ কাগুজে বাঘ। কাগজের মন্ডের বাঘ, হাওয়ায় যার মাথা নড়ত। তৃতীয়তঃ সৈকত বরাবর স্বর্গদ্বার পর্যন্ত রাস্তায় অগনিত লেটার বক্স তীর্থযাত্রীরা পোষ্টকার্ডে পৌঁছ সংবাদ বাড়িতে জানাবে, সেই প্রত্যাশায়। সেই পোষ্টকার্ড সর্বদাই সেই তীর্থযাত্রীদের স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের পর গিয়ে পৌঁছাত- সে কথা বলাই বাহুল্য। কালক্রমে লেটার বক্স এর জায়গা নেয় এস.টি.ডি. বুথ। এখন তাও ইতিহাস। তারকেশ্বরে কুমড়ো কেনার মত, তখন যেই পুরী যেতো হাঁড়ি কিনতো। তখন যৌথ পরিবারের কাল, হাঁড়ির দরকারও পড়তো গেরস্তবাড়িতে। তখন পুরীর হাঁড়ি হতো দুরকম। প্রথমত উজ্জল সাদার ওপর ফোঁটা ফোঁটা - স্বর্গদ্বারের প্রায় প্রতিটি দোকানে অদ্যাবধি যা উপলব্ধ। দ্বিতীয় হাঁড়িটি ছিলো অপেক্ষাকৃত মোটা চাদরের, আদৌ উজ্জল নয়, বরং কিঞ্চিৎ ম্যাড়ম্যাড়ে, যার ঘেরের তুলনায় উচ্চতা বেশি হতো। সেই বিস্তৃত হাঁড়িটির জন্য আজও আমার দীর্ঘশ্বাস পড়ে!

শেষতঃ বহুকথিত পুরীর লাঠি। বর্ষীয়ানরা পুরী গেলে কচিকাঁচাদের জন্য নিয়ে আসতেন। তখন যৌথ পরিবারগুলিতে কাঁড়ি কাঁড়ি বাচ্চা-কাচ্চা তাদের পেটাতে ও মারপিটে চমৎকার ভূমিকা নিতো হেঁতালের লাঠিগুলি। যৌথ পরিবার অবলুপ্ত, পরিবার পিছু বাচ্চাও এখন হাতে গোনা - তার ওপর তাদের পিতামাতার সদাসতর্ক উদ্বিগ্ন নজর, সেই দুঃখেই বোধহয় পুরীর লাঠি বাজার হারাল। নচেৎ বিচিত্রপুর, অন্তরঙ্গ প্রভৃতি জায়গায় ম্যানগ্রোভ আবাদের পর হেঁতাল গাছ কম পড়ার কথা নয়।
পঞ্চম দিন – বৃহস্পতিবার, প্রত্যাবর্তন। সকালে ভিজে ভিজে স্বর্গদ্বারে গিয়ে আত্মীয় প্রতিবেশী সহকর্মীদের জন্য বাধ্যতামূলক খাজা ক্রয়। নমস্কার সেই মহাপুরুষটিকে, যিনি ব্যাগের নিচে প্রথম চাকা লাগিয়েছিলেন। চাকা ব্যাগ না থাকলে আমরা কি আর বস্তা বস্তা খাজা নিয়ে আসতে পারতাম!
দুপুরে বাঁধাছাঁদা করে সন্ধ্যায় হোটেলের পিছনে দৃশ্যমান - জগন্নাথ মন্দিরের আলোকিত চূড়া ও সম্মুখের সততচঞ্চল সমুদ্রকে প্রণাম করে, স্টেশন।
কিঞ্চিৎ অপেক্ষার পর চার নম্বর প্ল্যাটফর্মে গাড়ি এল। ২২২০২ পুরী শিয়ালদহ দুরন্ত এক্সপ্রেস, আমাদের কামরা এ ওয়ান, ইঞ্জিন থেকে ষষ্ঠ। গোটা কামরায় মোট এগারো জন লোক, অথচ স্লিপার শ্রেণী সব ভর্তি। আমরা দুজন বাদে সবাই ষাটোর্ধ-রিবেটে ভ্রমণরত। রেলের সাম্প্রতিক ভাড়াবৃদ্ধি বাতানুকূল শ্রেণীর নিভৃতি কিছুটা হলেও ফিরিয়ে এনেছে দেখে ভালো লাগল। পৌনে আটটায় গাড়ি ছাড়ল। পরদিন তিনটে পঞ্চান্ন। নির্ধারিত সময়ের দশ মিনিট আগে - শিয়ালদহ।

~ পুরীর তথ্য ~ পুরীর আরও ছবি ~

পশ্চিমবঙ্গ অডিট ও অ্যাকাউন্টস বিভাগের কর্মী তপন পাল বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি এবং ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ফ্যান ক্লাবের সদস্য। ভালোবাসেন বেড়াতে আর ছবি তুলতে।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

আন্তর্জাল ভ্রমণপত্রিকায় আপনাকে স্বাগত জানাই = আপনার বেড়ানোর ছবি-লেখা পাঠানোর আমন্ত্রণ রইল =

অমরনাথের পথে

সুদীপ্ত দত্ত

~ অমরনাথের তথ্য || অমরনাথের ছবি || অমরনাথ যাত্রার ট্রেক রুট ম্যাপ ~

২৪ জুন ২০১৪, দুপুর ২টো
ট্রেন ঠিক সময়েই কলকাতা স্টেশন ছাড়ল। জম্মুতাওয়াই এক্সপ্রেস।
আমাদের টিকেট আর.এ.সি. ছিল, শেষ মুহূর্তে রিজার্ভেশন চার্টে দেখলাম কনফার্মড, কিন্তু আমার আর অলিম্পকদার সিট একই কামরার দুই প্রান্তে। ওদিককার এক প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে সিট অ্যাডজাস্ট করে চলে এলাম অলিম্পকদার ব্লকে। একটু পরে অলিম্পকদা (AD) খবর দিল ট্রেনে একটা ছুঁচো ঘুরে বেড়াচ্ছে। জানি না ছুঁচোর বিস্কুট কতটা প্রিয়, ব্যাগের বিস্কুটগুলো নিয়ে একটু চিন্তাই হল।
AD কে অনেকক্ষণ ধরে তাসের রামি খেলা শেখানোর চেষ্টা করলাম, সব মন দিয়ে শুনল, তারপর কমেন্ট করলো, "খুব কমপ্লিকেটেড। এর চেয়ে ক্যান্ডি ক্রাশ ভালো"!
রাত ১০ : ৩০
বিকেলে বোকার মত ঠকে গেলাম। কীভাবে ঠকলাম, কেন ঠকলাম তার ব্যাখ্যা আমার কাছেও নেই। ট্রেনে মোবাইলের সোলার চার্জার বিক্রি করছিল একটা ছেলে। কী ইচ্ছে হল একটা চেয়ে নিলাম। টেস্ট করলাম। দেখলাম কাজ করছে। মোবাইলে দেখাচ্ছে "চার্জিং"। দাম বলল ৩৫০ টাকা! আমি নেবনা বলেই ঠিক ছিল। ছেলেটা বলল, "কত দেবেন?" বলে নিজেই ৩০০ টাকা বলল। আমি খানিকটা মজা করেই বললাম ১৫০। ও মা, দেখি তাতেই রাজি হয়ে গেল! বাধ্য হয়েই কিনেই নিলাম। ছেলেটা আমাকে চার্জার গছিয়েই কামরা থেকে হাওয়া! পাশের ব্লকের লোকজন তখন বলল ওই চার্জারের দাম ৫০ টাকাও না। মজার ব্যাপার হল এই ফালতু চার্জার আমি আগেও দেখেছি। ভালো ভাবেই জানি কোনও কাজের নয়। সোলার সেলও লাগানো থাকে না। তবুও সময় সময় কেমন যেন গোলমাল পাকিয়ে যায়। অন্যকে কিনতে দেখে নিজে কতবার মনে মনে হেসেছি! আজ হঠাৎই সামান্য সময়ের মতিভ্রমে নিজেই ঠকে গেলাম!
এর মধ্যে অনেকের সঙ্গেই আলাপ হল যাঁরা অমরনাথ যাচ্ছেন। ব্যানার্জী দাদা-বৌদি - দেবাশীষদা আর জয়ন্তী বৌদি, বর্ধমান থেকে আসছেন - গত বছরও অমরনাথ গেছিলেন। আমাদের অভয় দিলেন - "প্রথম দু' দিন সিওর যেতে দেবে। যদি আটকায় তবে তারপর"। আসলে শুরুতেই শুনেছিলাম রাস্তায় প্রচুর বরফ জমে আছে।
আর দত্ত দাদা-বৌদি, দুলালদা আর বিপাশা বৌদি, এসেছেন উত্তর দিনাজপুর থেকে। বিপাশা বৌদি ভীষণ হাসিখুশি। মোটামুটি একাই জমিয়ে দিলেন আসরটা। প্রথমবার অমরনাথের পথে। কাস্টমসে কাজ করেন। হাই সুগার, কোলেস্টেরলের পেশেন্ট। ইনসুলিন ইঞ্জেকশন নিতে হয় প্রায়ই। তার মধ্যেই হেঁটে পহেলগাঁও - চন্দনবাড়ি হয়ে অমরনাথ যাবেন।

২৫ জুন সকাল ৮ টা
ট্রেনে এমনিই আমার ঘুম কম হয়। সকালে ঘুম ভাঙল সাড়ে চারটে নাগাদ। আপার বার্থে ছিলাম। খানিকক্ষণ চুপচাপ শুয়ে রইলাম। একটু পরে হাত-মুখ ধুয়ে নিলাম। ফাঁকা মাঠের মধ্যে দিয়ে ট্রেন ছুটে চলেছে। এ যেন আমাদের গ্রাম বাংলারই চেনা ছবি। হঠাৎ কয়েকটা ময়ূর দেখে বেশ আনন্দ লাগল। ময়ূর এখানে খুবই সাধারণ দৃশ্য, কিন্তু আমাদের অনভ্যস্ত চোখে নতুন ঠেকে। ট্রেন যখন অযোধ্যা ছেড়ে আচার্য নরেন্দ্রদেব নগরে পৌঁছল দেখতে পেলাম স্টেশনে অসংখ্য বাঁদর - বাচ্চা, বুড়ো, মা সবাইকে নিয়ে বাঁদরের ভরা সংসার । স্টেশনে ঢুকতেই সবাই দলবেঁধে ট্রেনটাকে ঘিরে ধরল। বাঁদরের বাঁদরামোর অনেক কাহিনি জানা আছে । তাই ওদের ঘাঁটাতে সাহস পেলাম না । এরই মধ্যে বিপাশা বৌদি গুড মর্নিং জানিয়ে গেলেন । এখন ব্রেকফাস্ট টাইম ।

২৭ জুন সকাল ১০ টা
কাল ডায়েরি লেখার সময় পাইনি। আসলে যখন সময় পেয়েছিলাম তখন আর এনার্জি বা ইচ্ছে কোনওটাই ছিল না। কাল জম্মুতে ট্রেন থেকে নামলাম তখন মনে হয়নি যে সারা দিন এতটা ঘটনাবহুল হবে।
স্টেশন থেকে বেরিয়ে এলাম, সঙ্গে দুলালদা, বিপাশা বৌদি, দেবাশীষদা আর জয়ন্তী বৌদি। জম্মু নেমেই লক্ষ্য করলাম আমাদের মোবাইল ফোন কাজ করছে না। প্রি-পেইড মোবাইল জম্মু-কাশ্মীরে অচল। পোস্ট পেইড কানেকশন কাজ করে, কিন্তু কারো কাছেই পোস্ট পেইড কানেকশন ছিল না। অবশ্য অমরনাথ যাত্রার পারমিট নেওয়ার পর যে কোনও যাত্রা ক্যাম্প থেকে সাময়িক ফোন কানেকশন পাব। তবে জম্মুতে এখনও সেই কানেকশন নেওয়ার কাউন্টার খোলা হয় নি। দেবাশীষদার এক আত্মীয় জম্মুতে থাকেন। তাঁকে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছিল। জম্মুতে নেমে একটা বুথ থেকে সেই আত্মীয়কে ফোন করা হল। তিনি বললেন "আজ জম্মুতে থেকে যান, কাল গাড়ির ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এমনিতেও আপনারা আজ যেতে পারবেন না"। দেবাশীষদা বুঝলেন গাড়ির ব্যবস্থা হয়নি, নিজেদেরই জোগাড় করতে হবে। কাছেই ট্যাক্সি স্ট্যান্ড। স্টেশন থেকে বেরিয়ে এসে একদম সামনে বেশ কতগুলো কাউন্টার খোলা আছে। সেখানে কাটরা যাওয়ার কোন গাড়ির কত ভাড়া তার বিস্তারিত চার্ট দেওয়া আছে। কিন্তু কোথাও পহেলগাঁও, বালতাল বা শ্রীনগরের ভাড়ার কথা লেখা নেই। জিজ্ঞাসা করতে শুনলাম - নতুন চার্ট কয়েক দিনের মধ্যে এসে যাবে। বুঝলাম এই রুটে ভাড়া ইচ্ছেমত ওঠানামা করে। যাই হোক, একটা গাড়ি বুক করা হল, পড়ল ৬৫০০ টাকা, অবশ্য টাকাটা আমরা সবাই শেয়ার করে নেব। প্রথমে যাব পহেলগাঁও। সেখান থেকে কাল চন্দনবাড়ি পৌঁছে অমরনাথের পথে হাঁটা শুরু। সকাল ১০টা নাগাদ জম্মু থেকে রওনা দিলাম। সঙ্গে ড্রাইভার বিজয় শর্মা। প্রথমে তাওয়াই নদী আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। পরে সেই দায়িত্ব পড়ল চিনাব নদীর ওপর। ছানি বলে একটা জায়গায় দুপুরের খাওয়া দাওয়া সারলাম। এদিকে আকাশটা একটু মেঘলা হয়ে এল দেখে ড্রাইভারকে বললাম গাড়ির মাথার ওপরে থাকা ব্যাগ-পত্তরগুলোকে ঢেকে দিতে। সে বলল - ঢাকার মত কোনও ত্রিপল থাকলে তবে তো ঢাকবে! কুদ থেকে ত্রিপল কিনে নেওয়া হল। পথে খুনীনালা বলে একটা জায়গা পড়ল। আগে এখানে ওপর থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ে প্রায়ই দুর্ঘটনা হত - অনেকে মারাও

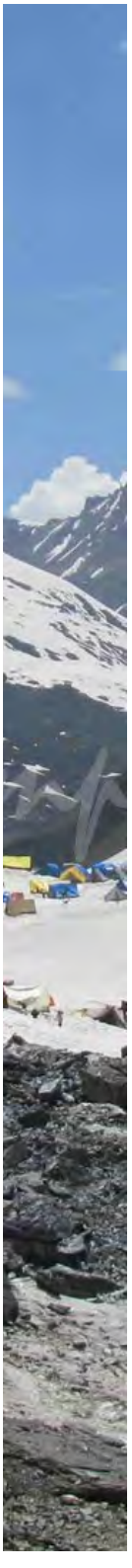

গেছে। এখন রাস্তাটা পাহাড়ের থেকে একটু সরিয়ে বানানো হয়েছে। পাশে তৈরি হয়েছে একটা মন্দির। এখন নাকি আর পাথর পড়ে না। রামসু পৌঁছলাম দুপুর বারোটায়। দেখি সামনে সার বেঁধে গাড়ি দাঁড়িয়ে। শোনা গেল বানিহালে কোথাও একটা অয়েল ট্যাঙ্কার উল্টে গেছে। গাড়ির সারি প্রায় ৫০ কিলোমিটার পথ জুড়ে রয়েছে! রামসু-তে একটা সরু নালা বয়ে গেছে। আমি ঢালু পথ ধরে নেমে গেলাম নালার ধারে। পরিচয় হল গুজরাতের পীযুষ প্যাটেলের সঙ্গে। কাশ্মীর ঘুরতে এসে আমাদের মতই আটকে পড়েছে। প্রায় চার ঘন্টা আটকে থাকার পর আস্তে আস্তে গাড়ি চলা শুরু করল। বানিহালে গিয়ে আবার গেল থমকে। বানিহাল শহরটা বেশ জমজমাট। জায়গায় জায়গায় গরম জামাকাপড়ের দোকান। প্রচুর ব্যাঙ্ক আর ATM, কিন্তু একটাও STD বুথ খুঁজে পেলাম না। প্রায় সাতটা বেজে গেল ট্রাফিক জ্যাম থেকে ছাড়া পেতে। জম্মু ও কাশ্মীরের যোগাযোগের একমাত্র রাস্তার ওপর জওহর টানেলে গাড়ি পৌঁছলে মনে হল হয়তো এতক্ষণে সমস্ত সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া গেল। তাই শুনে বাবা অমরনাথ অলক্ষে হাসলেন।

জওহর টানেল, প্রায় আড়াই কিলোমিটার লম্বা। পাহাড় ভেদ করে পাশাপাশি দুটো টানেল, দুদিকে গাড়ি যাতায়াত করার জন্য। চারদিকে নিরাপত্তার বেষ্টনী। সন্ত্রাসবাদীরা কতবার চেষ্টা করেছে ভারতবর্ষের এই গর্বকে ধ্বংস করার। কিন্তু আমাদের বীর সেনাবাহিনী প্রতিবার সেই চক্রান্ত ব্যর্থ করেছে। জওহর টানেল থেকে একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি আবার গাড়ির লম্বা লাইন। তখন ঘড়িতে রাত আটটা। অথচ তখনও দিনের আলো রয়েছে। এখানে সন্ধ্যা হয় অনেক দেরিতে। শুনলাম সামনে টোল প্লাজা। সেখানেই নাকি অয়েল ট্যাংকারে গোলযোগ। এভাবেই কেটে গেল ঘন্টা দু'য়েক। এখান থেকে দু'টো রাস্তা পহেলগাঁও গেছে। একটা সোজা রাস্তা আর দূরত্বও কিছু কম। অন্যটার দূরত্ব প্রায় ২০-৩০ কিলোমিটার বেশি। ড্রাইভার বিজয়জি প্রায় উদ্‌ভ্রান্তের মত চেষ্টা করে গেলেন দুটো রাস্তার কোনও একটা দিয়ে যাওয়ার। তাঁর কথায় - "ইয়ে জাগা বহৎ খতরনাক হ্যায়"। কিন্তু একটা রাস্তার টোল বন্ধ করা হয়েছে, অন্যটা দিয়ে কোনও গাড়ি যাচ্ছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম অথচ একটা গাড়িকেও যেতে দেখলামনা। আমাদের গাড়িটা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল তার থেকে দোকানপাট একটু দূরে। মনে হচ্ছিল হয়তো সারারাত গাড়িতেই কাটাতে হবে। বিজয়জি গাড়ির মুখ ঘোরানোর একবার চেষ্টা করলেন যদি কোনও থাকার জায়গার ব্যবস্থা করা যায়। অন্ততঃ রাতটা গাড়িতে বসে কাটাতে হবে না। এদিকে বাইরে ঠান্ডা বাড়ছে। গাড়ির ছাদ থেকে ব্যাগপত্র নামিয়ে গায়ে জ্যাকেট চাপিয়ে নেওয়া হল। গাড়ি উলটো দিকে ঘুরিয়েও বিশেষ লাভ হল না। শ'দুয়েক মিটার গিয়েই দাঁড়িয়ে গেল। অসংখ্য গাড়ির মাঝে ফেরত যাওয়ার রাস্তাও প্রায় বন্ধ। গাড়িকে যেখানে দাঁড় করানো হল সেখানে কিছু দোকানপাট আছে। চা, বিস্কুট আর পানীয় জল পাওয়া গেল। ঠিক কত রাত হবে বলা মুশকিল - ঘড়ি দেখার ইচ্ছেটাও তখন চলে গিয়েছিল।

খানিক পরে আবার গাড়ি এগোল। খুব সম্ভব তখন রাত দশটা কি সাড়ে দশটা। টোল-এর কাছে পৌঁছলে বিজয়জি খুব তাড়াতাড়ি কুপন কেটে, গাড়ি বের করে নিয়ে এলেন। কোথাও কোনও খারাপ হওয়া ট্যাঙ্কার দেখতে পেলাম না। যা দেখা গেল সেটা হল টোল-এ কুপন কাটার জন্য ড্রাইভারদের লম্বা লাইন। কে জানে "খতরনাক" হওয়ার জন্য হয়তো নিরাপত্তার কারণেই রাস্তা বন্ধ করা হয়েছিল। টোল পেরিয়ে গাড়ি পৌঁছল কাজিগুন্ডে। আপার বাজার কাজিগুন্ডে এসে ড্রাইভারজি খাওয়া দাওয়া করে নিলেন। আমাদের তখন আর খিদের অনুভূতি নেই। হয়তো থাকার একটা ব্যবস্থা করা যেত, কিন্তু পহেলগাঁও না পৌঁছে এখানে থাকতে কেউই রাজি হলাম না। বাজারটা একটু ঘুরে দেখলাম। এখানে খুব ভালো কাঠের জিনিসপত্র পাওয়া যায়। ক্রিকেট ব্যাট, হকি স্টিক, কাঠের ঘড়ি, হরেক রকম কাঠের শো-পিস ছাড়াও দেখলাম শীতের কাপড়, আখরোট, খোবানি, কাজু, কিস্‌মিস্‌ এমনকি আমসত্বও। বাজার ঘুরে এসে গাড়িতে পৌঁছে আবার এক নতুন খবর পেলাম। পহেলগাঁও থেকে অমরনাথ যাত্রা বন্ধ রাখা হয়েছে। অন্ততঃ ২৮, ২৯ ও ৩০ তারিখ যেতে দেওয়া হবে না। ১ তারিখ আবার পুনর্বিবেচনা করা হবে। আমি আর অলিম্পকদা যেন একটা প্রচন্ড শক্‌ খেলাম। প্রায় ৫ মাসের প্রস্তুতি, তিল তিল করে গড়ে তোলা অমরনাথ দর্শনের আশা, স্বপ্ন সব ধুলিসাৎ হয়ে যাবে! মনে পড়ল, সেই কবে পাশের বাড়ির মেজদা প্রথম বলেছিল অমরনাথ যাত্রার পরিকল্পনা। মেজদা আগে একবার অমরনাথ দর্শন করেছিল, আবার মন টানছিল পথে নামার। কথাটা সৌরভদাকে বলতে সেও এক কথায় রাজি হয়ে গেল। মানবদা আর অলিম্পকদা যখন জানতে পারল, এক মুহূর্ত না ভেবেই আমাদের সঙ্গী হওয়ার কথা জানিয়ে দিল। তারপর ফেব্রুয়ারি-মার্চে যখন ফিটনেস টেস্টে মেজদা আর সৌরভদা পারমিশন পেল না, সেটা ছিল আমাদের কাছে প্রথম বড় ধাক্কা। তা সত্ত্বেও আমরা তিনজন যাওয়ার জন্য মনে প্রাণে প্রস্তুত ছিলাম। যাত্রার মাত্র দিন চার-পাঁচেক আগে সিঁড়ি থেকে পড়ে, লিগামেন্টে চোট পেয়ে মানবদার যাওয়াও বাতিল হল। আমরা দু'জন শেষ পর্যন্ত আশা জিইয়ে রেখেছি। বন্ধু আত্রেয়ী বারবার সতর্ক করেছিল পথে বিপদের কথা জানিয়ে। বলেছিলাম - "কোনও চিন্তা নেই। ঠিক চলে যাব অমরনাথ"। আর এখানে এসে শুনছি যাওয়ার রাস্তা বন্ধ! ফেরার ট্রেনের টিকিট কাটা চার তারিখের। তাই ইচ্ছে থাকলেও যাত্রা শুরু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারব কী না জানি না।

দেবাশীষদা একটু পরে খবর এনে দিলেন যে বালতাল হয়ে অমরনাথ যাওয়ার রাস্তা খোলা আছে। আর ২৮ তারিখ যাদের চন্দনবাড়ি হয়ে যাওয়ার পারমিট করা আছে তাদের বালতাল দিয়ে যেতে দেওয়া হবে। খবরটাই যেন কোথায় আবার একটা আশার আলো দেখতে পেলাম। আসলে সমস্ত ব্যাপারটা আমরা আগেই জানতে পারতাম যদি জম্মুতে নেমে কোনও খবরের কাগজ কিনতাম বা যদি ফোন কানেকশন কাজ করত। দেবাশীষদার আত্মীয়ও এটাই বলার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু শেষের কথাগুলো আর শুনে ওঠা হয় নি।

কাজিগুন্ড থেকেই আমরা নতুন করে যাত্রাপথ ঠিক করলাম। ঠিক হল, পহেলগাঁও নয় - আমরা সরাসরি চলে যাব শ্রীনগর। পহেলগাঁওতে আমাদের দু'দিনের হোটেল বুক করা ছিল, সেই বুকিং ক্যানসেল করারও কোনও উপায় এখন নেই।

শ্রীনগর যখন পৌঁছলাম তখন প্রায় রাত দু'টো। বিজয়জির যোগাযোগে অত রাতেও আমরা শ্রীনগরে একটা হোটেল পেলাম, মাত্র ১৩০০ টাকায়। হোটেল কর্তৃপক্ষের আতিথেয়তায় আমরা সত্যিই অভিভূত হয়ে গেলাম। আমাদের সমস্ত ব্যাগ-পত্তর হোটেলের লোকরাই ওপর পর্যন্ত তুলে নিয়ে এল। অত রাতেও খাবারের ব্যবস্থা করল। হোটেল ম্যানেজার নিজেই তাঁর মোবাইল এগিয়ে দিলেন বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য। সত্যিই জানি না কিভাবে ড্রাইভার বিজয়জি ও হোটেল কর্তৃপক্ষকে কৃতজ্ঞতা জানানো যায়। বিজয়জি শ্রীনগর পর্যন্ত আসায় অতিরিক্ত ২২০০ টাকা চাওয়ায় দেবাশীষদা বিশেষ অসন্তুষ্ট হলেও অতটা অতিরিক্ত পথ, অত রাত্রে আমাদের নিরাপদে শ্রীনগর নিয়ে আসার যে দায়িত্ব নিজে থেকে নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন শুধু মানবিকতার খাতিরে, তা অস্বীকার করি কি করে? বলা বাহুল্য আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে যে তরতাজা, ঝরঝরে লাগছে তার পুরো কৃতিত্বই তো বিজয়জির।

সকাল সাড়ে ৬টায় ঘুম থেকে উঠে স্নান সেরে ফ্রেশ হয়ে নিলাম। সেই কবে বাড়ি থেকে স্নান করে বেরিয়েছিলাম! তারপর একটু হাঁটতে বেরোলাম। জানতে পারলাম জায়গাটার নাম শিবপুরা। পাশে একটা পাহাড় দেখা যাচ্ছে। তার আড়ালেই নাকি বিখ্যাত ডাল লেক। এখানকার সব বাড়িতেই দেখলাম লেখা BBC। কৌতুহল চাপতে না পেরে একজন স্থানীয়কে জিগ্যেস করেই ফেললাম এর মানে। ভদ্রলোক হেসে জবাব দিলেন এর সঙ্গে ব্রিটিশ সম্প্রচার সংস্থার কোনও যোগাযোগ নেই। B B C হল বাদামি বাগ ক্যান্টনমেন্ট। সামনেই একটা সেনা চৌকির অন্তর্গত এলাকা এটি। আরও জানা গেল, পাশের আপাত নিস্তরঙ্গ নদীটিই ঝিলম, যার উৎপত্তি ভেরিনাগ হ্রদ থেকে, গিয়েছে পাকিস্তানে। নদীর ওপর ভেসে বেড়াতে দেখলাম কতগুলো ক্যানো জাতীয় নৌকা - এগুলোই "শিকারা"। আরেকটু এগিয়ে যেতে একটা বাজার এলাকা দেখতে পেলাম, নাম বাটওয়ারা। কাছেই একটা ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে গুলমার্গ, সোনমার্গ আর জম্মুর ভাড়া জানতে চাইলাম। জানা গেল ২২০০, ২৫০০ আর ৬৫০০ টাকা। সামনে একটা ফেয়ার টেবিলে দেখলাম অনেক কম ভাড়া লেখা আছে। প্রশ্ন তুলতেই জানানো হল - ওটা বহু পুরানো লিস্ট, ২০১২ সালের। দু'এক দিনের মধ্যেই নতুন লিস্ট আসবে। মনে ধন্দ রয়েই গেলো, একই উত্তর কি জম্মু, শ্রীনগর সব জায়গাতেই পাওয়া যায়!

২৭ জুন বিকেল ৫টা

দুপুরে আবার একটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটল। মোবাইলটা চার্জে বসিয়েছিলাম। হঠাৎ একটা ফট্‌ করে শব্দ করে চার্জারটা নষ্ট হয়ে গেল। অতঃপর ভরসা সেই "সোলার চার্জার"। হাতে দুটো অতিরিক্ত ব্যাটারি আছে ঠিকই কিন্তু কদিন চলবে জানি না। আর সোলার চার্জারেই বা কতটা ভরসা করা যায় কী জানি! দুপুরে দুলালদা একটা তরমুজ কাটল। এটা আসার সময় রামবন থেকে কেনা হয়েছিলো। তরমুজ খাওয়ার পর অবশিষ্ট অংশ আমরা ফেলেছিলাম ডাষ্টবিনে। কিন্তু দেবাশীষদা ফেলছিলেন হোটেলের লনে। পরে অলিম্পকদার কাছে শুনেছিলাম, সেগুলো হোটেল মালিক নিজে হাতে পরিস্কার করেছেন। দেবাশীষদাকে জিজ্ঞাসা করায় নাকি বলেছেন - "আমি ফেলিনি । কে যে করে এমন কাজ ... " ! ভোর রাতে আমাদের বেরোতে হবে বালতালের উদ্দেশ্যে। চেষ্টা করব ক্যাম্প থেকে একটা মোবাইল সিম জোগাড় করার।

২৯ জুন, রাত ৯টা

প্রায় দেড়দিন ডায়েরি লিখতে পারি নি। লেখার মত পরিস্থিতিই ছিল না। পুরো সময়টাই ঘটনাবহুল। গতকাল ভোর চারটে নাগাদ হোটেল থেকে গাড়ি রওনা দিয়েছিল বালতাল। যাত্রী আমরা ছ'জন। বালতাল পৌঁছতে পৌঁছতে সকাল ছ'টা। আমাদের সঙ্গের মালপত্রগুলো চেক করা হল। ব্যাগে একটা স্টীলের ফ্লাক্স ছিল, এক্স-রে তে সেটাও ধরা পড়ল। আবার ব্যাগ খুলে দেখাতে হল যে ওটা জলেরই বোতল, বিপজ্জনক কিছু না। যাত্রা পারমিট দেখিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম মেন গেটের (Access Control) দিকে। পথে দেখি এক ঘোড়াওয়ালা ঘোড়াকে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। ঘোড়াটার মাথায় হাত বুলিয়ে সহিসকে জিগ্যেস করলাম ঘোড়ার নাম কি? বলল - "রাজু"। AD জিগ্যেস করল "বালতাল থেকে গুহা অবধি কত পড়বে? বেচারা সবে তার ঘোড়া নিয়ে ক্যাম্পে এসেছে। বলল, আমি এখনও রেট জানি না। একটু এগিয়ে যেতেই আরেক সহিসকে পাওয়া গেল। এ ছেলেটি অলরেডি রেজিস্ট্রেশন করে নিয়েছে। গলায় ঝোলানো আইডেন্টিটি কার্ড। আমি বা অলিম্পকদা, কেউই দরদস্তুর করতে পারি না। ওর বলা ২২০০ টাকাতেই রাজি হয়ে গেলাম। গুহা পর্যন্ত যাওয়া আবার বালতাল ফিরে আসা পর্যন্ত ঘোড়া আমাদের সঙ্গে থাকবে। ইচ্ছে ছিল, যতটা পারব আমরা হেঁটেই চলব। ঘোড়ার কাছে থাকবে আমাদের ব্যাগগুলো। আমাদের কেউ হাঁপিয়ে গেলে খানিকক্ষণ ঘোড়ায় চড়ে এগোব। সহিসের নাম আলতাফ মালিক। ঘোড়ার মাথায় হাত বুলিয়ে আলতাফকে জিগ্যেস করলাম - "তোমার ঘোড়ার নাম কি?" উত্তর এলো - "রাজু"! রাস্তার ধারে দেখলাম এক বয়স্ক লোক লাঠি বিক্রি করছে। দুজনের জন্য দুটো লাঠি চল্লিশ টাকা করে কিনে নিলাম। সঙ্গে নিলাম ধুলো আটকানোর মাস্ক। আলতাফই বলল কিনে নিতে। দশ টাকার একটা মাস্কে নিজের মুখটা আটকে নিলাম।

মাইকে অ্যানাউন্স করছিল সকাল আটটার পর আর কাউকে যাত্রাপথে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না। আমরা তাড়াতাড়ি মেন গেটের দিকে এগিয়ে গেলাম। মেন গেটের দূরত্বটা আন্দাজের থেকে একটু বেশিই। 'দোমেইল' প্রায় দু'মাইল বলেই মনে হল, আসলে দু'কিলোমিটার। গেটে আরেক দফা চেকিং হল। পারমিট দেখানো হলে যাত্রার অনুমতি পেলাম। ভেতরে ঢুকতেই দেখতে পেলাম অসংখ্য ভাণ্ডারা। বিশেষভাবে নজরে এল পাঞ্জাবী, গুজরাতি আর উত্তরপ্রদেশের ভাণ্ডারা। একজন আমাদের হাতে কিছু লঙ্গের ধরিয়ে দিল। আলতাফ আবার কয়েকটা কার্ড আমার হাতে ধরিয়ে দিল। তাতে একদিকে ছিল বাবা ভোলানাথের ছবি ও উল্টো দিকে প্রণাম মন্ত্র। ঘোড়ার পিঠে আমাদের ব্যাগ দুটো তুলে আমরা আস্তে আস্তে চড়াই পথে উঠতে থাকলাম । পথে এক আন্তর্জাতিক সংস্থার স্বেচ্ছাসেবীর কাছে শুনেছিলাম এবার অমরনাথ যাত্রা সুরক্ষিত করার দায়িত্বের বড় অংশ রয়েছে বাংলা ব্রিগেডের হাতে। তাই মিলিটারির একটা বড় অংশ বাঙালি। সামনে দু'জন মিলিটারিকে দেখতে পেয়ে জিগ্যেস করলাম -তাঁরা কোত্থেকে এসেছেন। পালটা প্রশ্ন এল - আপনি কোত্থেকে ? কলকাতা বলতেই এক মিলিটারি আরেক জনকে দেখিয়ে বলল, "ও এসেছে বেঙ্গল থেকে"। মালদার দীপঙ্কর দাস সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন যাত্রী সুরক্ষার দিকে। হঠাৎ দেখি সামনে একটা ঝঞ্ঝাট তৈরি হয়েছে। সমস্ত ঘোড়াকে এক লাইনে রেখে ডান দিক দিয়ে পায়ে হাঁটার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাই দেখে ঠিক করলাম, আমরা আস্তে আস্তে এগিয়ে যাই, একটু পরেই আলতাফ-রাজু আমাদের ধরে ফেলবে। আমরা এগোতে থাকলাম। একটু পরেই চোখে পড়ল একটা বড় ভাণ্ডারা, মোরাদাবাদের। ভাণ্ডারায় শিবের নামগান চলছে আর সবাই তার তালে তালে নাচছে। যারা খাবার পরিবেশন করছে তারাও সেই তালে তাল মিলিয়েছে। সামান্য কিছু খেয়ে ঘোড়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। বিপাশা বৌদির হাঁটতে অসুবিধা হচ্ছে দেখে একটা ঘোড়ার পিঠে উঠে পড়েছিলেন। তিনিও ভাণ্ডারায় এসে পড়লেন। কিন্তু আমাদের ঘোড়ার কোনও খোঁজ নেই। নানা দিকে খোঁজ করলাম, মিলিটারিকে জিগ্যেস করলাম, একটাই উত্তর পেলাম - "সহিসের আইডেন্টিটি কার্ডটা আপনার কাছে আছে তো? তাহলে ঠিক পেয়ে যাবেন"। আমার হঠাৎ খেয়াল হল প্রায় সব টাকা পয়সাই ওই ব্যাগে রয়ে গেছে ! এবার যদি ঘোড়াকে খুঁজে না পাই কপর্দকশূন্য হয়ে বাকী পথ কাটাতে হবে। বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে মা কিছু টাকা পকেটে দিয়ে দিয়েছিল। এটা মায়ের অনেকদিনের অভ্যাস। স্কুল যাওয়ার সময় আমার কাছে টাকা-পয়সা না থাকলে মা কিছু টাকা দিয়ে দিত। আমিও চেষ্টা করতাম টাকাটা বাঁচিয়ে রাখতে। এবারও মায়ের দেওয়া সেই টাকাটাই আমার একমাত্র সম্বল। শুধু একটা লাঠি হাতে এগিয়ে চললাম। অলিম্পকদা আমার পেছন পেছন আসতে লাগল। সবচেয়ে ভালোভাবে এগিয়ে চললেন দেবাশীষদা আর জয়ন্তী বৌদি। বেশ কয়েকটি ট্রেকিং - এর অভিজ্ঞতা আছে ওঁদের। দুলালদা সবচেয়ে পিছিয়ে পড়েছিলেন। পরপর বেশ কয়েকটা চড়াই পেরিয়ে এলাম। এবার আস্তে আস্তে গতি কমে আসছে। অলিম্পকদাও খুবই ক্লান্ত। জলের বোতল রয়েছে ঘোড়ার পিঠের ব্যাগে, যার কোনওই খোঁজ নেই। বিপাশা বৌদি ঘোড়ার পিঠে এগিয়ে গেছেন। দুলালদা অনেক পেছনে। একটু পরে দেখি অলিম্পকদাও একটা ঘোড়ায় চড়ে বসল। ওকে সত্যিই খুব ক্লান্ত লাগছিল। আমাকেও বলল একটা ঘোড়া করে নিতে। রাজি হলাম না। আসলে আমার ধারণা ছিল যে আর খুব বেশি পথ বাকি নেই। এক মিলিটারিকে দূরত্ব জিগ্যেস করতে উত্তর এল - "বাস অউর দো চড়াই, উস্‌কে বাদ স্রেফ উতরাই"। অলিম্পকদা চলে যাওয়ার পর একা পথ চলতে লাগলাম।

কিন্তু "দো চড়াই" তো আর শেষ হয় না! ক্রমশঃ ওপর দিকে উঠেই চলেছি। মাঝে মাঝেই মনে হচ্ছে এই চড়াইটা শেষ হলেই পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে যাব। কিন্তু যখন সেইপর্যন্ত পৌঁছাই দেখি আরও ওপরে পাহাড় যেন নতুন করে গজিয়ে উঠল। আস্তে আস্তে ক্লান্তি বাড়তে লাগল। কখনও থমকে দাঁড়াচ্ছি। কখনও রাস্তার পাশে বসে পড়তে বাধ্য হচ্ছি। আমার ক্লান্ত চেহারা দেখে সবাই বসার জায়গা করে দেয়। পথে একজায়গায় দেখি একটি ছোট ছেলে, বাবার সঙ্গে এসেছে অমরনাথ দর্শনের আশায়, ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ল পথের পাশে। আবার একটু পরে "ব্যোম ভোলে" বলে উঠে পথ চলা শুরু করল। হাতে সামান্যই টাকা আছে, তাতে ঘোড়া নেওয়ার ক্ষমতাও নেই। কে জানে আলতাফকে আর খুঁজে পাব কি না। ধীরে, খুব ধীর পায়ে এগিয়ে চললাম। আমরা রওনা দিয়েছিলাম যাত্রার একদম প্রথম দিনেই। তাই ভাণ্ডারার সংখ্যাও ছিল খুব কম। পথে ফ্রুট জুস কিনতে বাধ্য হলাম। কুড়ি টাকার ফ্রুট জুস কিনতে হল পঞ্চাশ টাকায়। এতটাই আস্তে পা ফেলছিলাম যে সবাই যেতে যেতে একবার আমার দিকে করুণার চোখে তাকাচ্ছিল। তবুও থামছিলাম না। অনেকেই হয়তো আমাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু একটু পরে ক্লান্ত হয়ে পড়ায় তাদের আবার ধরে ফেলছিলাম। প্রত্যেকেই উৎসাহ দিচ্ছিল - "জয় ভোলে"! অস্ফুট গলায় জবাব দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম - "ব্যোম ভোলে"। এ যেন অনেকটা কাউকে দেখে "Good Morning" জানালে প্রত্যুত্তরে "Good Morning" শুনতে পাওয়ার মত, তফাৎ একটাই, "জয় ভোলে" ধ্বনি যেন এক নতুন উদ্দীপনা জোগায়। যেন আশ্বাস দেয় - তুমি পারবে, ঠিক পারবে। একটু এগিয়ে যেতে দেখি এক ভদ্রমহিলা, বেশ ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লেন। উৎসাহ দেওয়ার চেষ্টা করে হাঁক দিলাম - "জয় ভোলে"। কোন উত্তর না পেয়ে আবার এগিয়ে গেলাম। একটু পরে দেখলাম উনিও ঘোড়াকে পথের সঙ্গী করে নিয়েছেন। উপায় থাকলে হয়তো আমিও ঘোড়ার পিঠে নিজেকে সঁপে দিতাম, কিন্তু বাবা অমরনাথ যতটুকু দরকার ততটুকু রেখে বাকিটুকু সরিয়ে রেখেছেন নাগালের বাইরে। এ যেন বাবা-মা তার সন্তানকে বড় করার জন্য যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকু দেন, বাকিটা রেখে দেন সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য, সেরকমই। ক্লান্তিতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কথা যেন ভুলেই গিয়েছিলাম । বিশ্রাম নেওয়ার জন্য একটু দাঁড়াতেই চোখে পড়ল এক তুষারধবল গিরিচূড়া। নীল আকাশ যেন সেই গিরিশিখরকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছে। নীচে গভীর খাতের পুরোটাই হিমবাহে ঢাকা।

হেলিকপ্টার সার্ভিস চালু হয়েছে প্রথম দিন থেকেই। তিনটে হেলিকপ্টার যাতায়াত করছে, একটা অনেক ওপর দিয়ে, একটা আমাদের লেভেলে, আর অন্যটা আমাদের লেভেলের অনেক নীচে, গিরিখাতের মাঝ দিয়ে। চলতে চলতে রাস্তার প্রকৃতিরও পরিবর্তন হচ্ছে। প্রথম দিকে রাস্তা ছিল পাথরের। ছোট ছোট নুড়ি দিয়ে তৈরি। এরপর পেলাম মাটির রাস্তা। ঘোড়ার যাতায়াতে মাটি প্রায় ধুলো হয়ে গেছে। মাস্কটা দিয়ে কোনও রকমে ধুলো আটকানোর চেষ্টা করছি। চলতে চলতে আবার একটা ভাণ্ডারার কাছে এসে উঠলাম। দেখলাম দেবাশীষদারা কিছু খেয়ে নিচ্ছে। আর্মি থেকে সবাইকে গরম জল খাওয়ানো হচ্ছে। ভাণ্ডারার কাছে রাস্তা বরফে পিছল হয়ে আছে। মিলিটারি সাহায্য করছে রাস্তা পার হতে। দুর্বল পায়ে এগোতে গিয়ে প্রায় পড়েই যাচ্ছিলাম। হাতের লাঠি ও এক মিলিটারির সাহায্যে কোনও রকমে সামলে নিলাম। এগোতে এগোতে যখনই উল্টো দিক থেকে কাউকে আসতে দেখি একবার জিগ্যেস করি - "অমরনাথজির গুহা আর কতদূর"? উত্তরটা প্রায় সবসময়ই এক থাকে। অর্থাৎ মনে করছি অনেক হেঁটেছি কিন্তু আসলে একটুও এগোইনি। একবার একজনকে জিগ্যেস করে উত্তর পেলাম ৫ কিলোমিটার। কিছু পরে আরেকজনের কাছে উত্তর পেলাম ৭ কিলোমিটার। ধন্দে পড়ে যাই মাঝে মাঝে, রাস্তা ঠিক ১৪ কিলোমিটারই তো? একটা জায়গায় দেবাশীষদাদের দেখাদেখি শর্টকাট নিতে গিয়ে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে চড়াই পেরোতে হল। কোনও রকমে ওপরে উঠে বসে রইলাম প্রায় ১০ মিনিট। তারপর কাছের এক দোকান থেকে একটা জলের বোতল কিনে নিলাম । ততক্ষণে বিকেল প্রায় সাড়ে তিনটে। ভাবছি অলিম্পকদা আর বিপাশা বৌদির এতক্ষণে পৌঁছে যাওয়ার কথা। ওরা কি আবার আমায় খুঁজতে পেছনে আসবে? না আমার জন্য অপেক্ষা করবে? পাশে দেখি একটি মেয়ে, দেখেই বোঝা যাচ্ছে খুব ক্লান্ত, এগিয়ে চলেছে বাবা ভোলানাথের নামগান করতে করতে। কী সুন্দর সেই শ্লোক! হয়তো তার এক লাইনও আমার মনে নেই, কিন্তু সেই সুর মনে মনে আওড়াতে আওড়াতে এগিয়ে চলি। পথে পড়ল একটা পাহাড়ি ঝরনা। সুন্দর কাঠের সাঁকো ঝরনাটা পেরোনোর জন্য। সাঁকোর পাশ থেকে ঝরনার জল হাতে নিই, শীতল পরশ অনুভব করি। যেন কিছুটা হলেও ক্লান্তি দূর হয়। কখন যেন রাস্তা অনেক সমতল হয়ে এসেছে। চলার ক্লান্তি কিছুটা হলেও গা-সওয়া হয়ে গেছে। এখন চলার পথ পাতলা পাথরে ঢাকা। কোথাও কোথাও জল পড়ে কর্দমাক্ত। আমার পায়ের জুতোটা নামী কোম্পানির ট্রেকিং স্যু। তাই বেশি অসুবিধা হয় না, কিন্তু অনেকেই দেখলাম অবলীলায় খুব সাধারণ জুতো পরেই রাস্তা পার হয়ে যাচ্ছে। আরও বেশ কিছুদূর গিয়ে একজনকে গুহার কথা জিগ্যেস করতে উত্তর পেলাম - এই ব্যস পৌঁছেই গেছেন। আর মাত্র দুই কিলোমিটার। অথচ সামনে তো গুহার কোনও চিহ্নই দেখতে পাচ্ছি না! কেবল রুক্ষ পাহাড়, বরফেরও কোনও চিহ্ন নেই। মনে মনে হিসেব করলাম আমার চলার যা গতি তাতে এক কিলোমিটার যেতে অন্ততঃ এক ঘন্টা লাগবে। মানে আরও দু'ঘন্টা আমায় হাঁটতে হবে। হঠাৎ মনে প্রশ্ন এল - অতক্ষণ বাবার মন্দির খোলা থাকবে তো? আমি কি সুযোগ পাব বাবার চরণে প্রণাম নিবেদন করার? পেছনে তাকিয়ে দেখি আমার পরে আর কোনও যাত্রী আছে কী না। আশ্বস্ত হই, আরও অনেকেই লাঠি হাতে ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে একই পথে, এখনও একা হয়ে যাইনি। আস্তে আস্তে এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ

একটা বাঁক ঘুরতেই সামনে দেখতে পেলাম এক নয়নাভিরাম দৃশ্য। একটা তুষার-ধবল উপত্যকা। যেন মনে হচ্ছে সমস্ত এলাকাটা দুধের ধারায় স্নান করানো হয়েছে। দু'পাশে দুটি পাহাড় আর তার গা ঘেঁষে দু'তিনটি রাস্তা। একদিকের রাস্তা দিয়ে আমি হেঁটে চলেছি, অন্য রাস্তাও জনবিরল নয়, ঘোড়া ও ঘোড়সওয়ারের সারি এগিয়ে চলেছে মায়াবী উপত্যকার দিকে। ক্লান্ত, কিন্তু তা সত্ত্বেও অবাক চোখে চেয়ে রইলাম অনেকক্ষণ সেই উপত্যকার দিকে। বিস্ময়ে ছবি তুলতেও ভুলে গেলাম সেই মোহময় দৃশ্যের। আচমকা মনে পড়ল মন্দির বন্ধ হওয়ার সময় হয়ে এল। আমাকে পৌঁছতেই হবে। আবার ধীর পায়ে এগিয়ে চললাম সামনের দিকে। এক ফিরতি পথচারীকে জিগ্যেস করলাম - গুহা আর কতদূর? ভদ্রলোক খুব অবাক হলেন, তারপর আমার ক্লান্ত চেহারা দেখে উৎসাহ দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন - আপনি পৌঁছেই গেছেন। এই সামনের বাঁকটা ঘুরলেই বাবার গুহা দেখতে পাবেন। জয় ভোলে! খুশিতে মনটা ভরে উঠল। আস্তে আস্তে বাঁকের দিকে এগিয়ে চললাম। বরফের ওপর দিয়ে এগিয়ে যেতে খুব অসুবিধা হচ্ছিল। পায়ে জোর পাচ্ছিলাম না। মাঝে দুবার পা পিছলে পড়েও গেলাম। অন্যরা ধরে তুলল। উপত্যকায় প্রবেশের ঠিক মুখে দেখি বিপাশা বৌদি বসে আছেন অসহায় ভাবে। দুলালদা এসে পৌঁছাননি। বৌদি তখনও খুব দুর্বল। পয়সাকড়িও দাদার কাছে। আমাকে দেখে যেন একটা আশার আলো দেখতে পেলেন। আমি বললাম, আমি গুহার দিকে এগোচ্ছি, আপনিও ধীরে ধীরে আসার চেষ্টা করুন। যেখান থেকে ঘোষণা করা হচ্ছে সেখানে পৌঁছে চেষ্টা করব অলিম্পকদাকে খুঁজে বার করার। বলে আবার কাঁপা পায়ে, পিছলে পড়তে পড়তে এগিয়ে যেতে লাগলাম গুহার দিকে। হঠাৎ পাশ থেকে একটা ডাক ভেসে এল - "আরে বাবু। হাম কব সে আপকা ইন্তেজার কর রহে হ্যায়। আপ ইতনা দের তক কাঁহা থে?" তাকিয়ে দেখি আলতাফ ওর ঘোড়া রাজু আর আমাদের ব্যাগজোড়া নিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ও অনেক আগে পৌঁছে আমাদের অপেক্ষায় রয়েছে। ওর সঙ্গে অলিম্পকদারও দেখা হয়নি। মনে হল যেন এক পরম বন্ধুকে খুঁজে পেলাম। বললাম আমি অলিম্পকদাকে খুঁজতে যাচ্ছি গুহার দিকে। শরীরের অবস্থা দেখে আলতাফ আমাকে রাজুর পিঠে উঠিয়ে দিল। আমরা এগোতে থাকলাম অমরনাথজীর গুহার দিকে। কিছুদূর এগোতেই দেখি অলিম্পকদা রাস্তার পাশে সদ্য তৈরি হতে যাওয়া একটা দোকানে গালে হাত দিয়ে চিন্তিত ভাবে বসে আছে। আমাকে দেখেই AD-র চোখে একটা খুশির ঝিলিক দেখতে পেলাম। ধরাধরি করে রাজুর পিঠ থেকে নামানো হল আমাকে। আলতাফকে দুজনেই ধন্যবাদ জানালাম। ওকে আগেই বলেছিলাম যে আমার ব্যাগে একটা জলের বোতল আছে, তেষ্টা পেলে যেন সেখান থেকে জল খেয়ে নেয়। বলল, ও শুধু সামান্য জল খেয়েছে। অমরনাথের পথে যে সহিসরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাত্রীদের ভোলেবাবার দর্শনের ব্যবস্থা করে দেয়, তারা গরীব হতে পারে, কিন্তু কখনোই অসৎ নয়। আলতাফ আমাদের বলেছিল যে ও জয়পুরের এক মেডিক্যাল কলেজে পড়াশুনা করছে। চূড়ান্ত আর্থিক কষ্টের মধ্যেও ও কিন্তু শিক্ষাকে অবহেলা করেনি। আমরা ঠিক করলাম শেষ বিকেলে আর বালতালের পথে পা বাড়াব না। বরং গুহার কাছেই তাঁবুতে রাতটা কাটিয়ে দেব। সেইমত আলতাফ এবং রাজুকে বিদায় জানালাম। আমার দেখা না পেয়ে অলিম্পকদা ভীষণ মুষড়ে পরেছিল। ভেবেই নিয়েছিল এ যাত্রা আর হয়তো অমরনাথজীর পুজো দেওয়া হবে না। অন্ততঃ সে দিন তো নয়ই। এবার আবার নতুন উদ্যমে প্রস্তুতি শুরু করল। হাতে সময় অল্প, একটু পরেই বন্ধ হয়ে যাবে মন্দির। দুজনেই অসম্ভব ক্লান্ত - গুহা প্রায় ৫০০ মিটার দূরে। অলিম্পকদা খুব তাড়াতাড়ি একটা টেন্ট ভাড়া করে ব্যাগপত্র সেখানে রেখে এল। কাছের একটা দোকান থেকে পুজোর সামগ্রী কিনে নিলাম। দুটো ডুলির ব্যবস্থা করা হল। ডুলি পিছু পড়ল ২০০ টাকা। তারা পৌঁছে দিল একেবারে মন্দিরের দোরগোড়ায়।

এখানে জুতো খুলে জমা রেখে আমাদের উঠতে হবে বেশ কয়েকধাপ সিঁড়ি। পাথরের সিঁড়ি কনকনে ঠান্ডা। পা অবশ হয়ে আসে। অমরনাথ আসার আগে আমার এক শুভাকাঙ্খী পরামর্শ দিয়েছিলেন সঙ্গে পলিথিন রাখার। সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় তাতে পা মুড়ে নিলে ঠান্ডা লাগবে না। পলিথিন সঙ্গে এনেছিলাম, কিন্তু সে তো ব্যাগেই রয়ে গেছে। অগত্যা খালি পায়েই ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে লাগলাম। প্রত্যেকটা সিঁড়িকে পেরোনো মনে হচ্ছিল একটা বড় মাইলস্টোন পার হওয়া। কখনও কখনও অলিম্পকদা এগিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। অবশেষে পৌঁছলাম গুহার শেষ মাথায়। দেখলাম সেই অলৌকিক শিবলিঙ্গ। পাশে পার্বতী ও গণেশ, যারা আপাত নির্বাক, নিষ্প্রাণ - বরফের স্তুপ। কিন্তু অদ্ভুত তাদের আকর্ষণী ক্ষমতা। মুহূর্তের ঝলকে যেন দেখতে পেলাম শিবলিঙ্গের মাথার কাছে এক জোড়া সাদা পায়রা। একটু পরেই মনে হল তা যেন হাতে আঁকা ছবি । কি জানি হয়তোবা আমার মনের ভুল, অথবা হয়তো সত্যি।

অমরনাথজীকে দর্শন করে পুজো সেরে খুবই ধীরে ধীরে নেমে এলাম সিঁড়ি বেয়ে। এর মাঝেই আবার হারিয়ে খুঁজে পেলাম অলিম্পকদাকে। এবার কন্ট্রোল রুমে এসে দুলালদা-বিপাশা বৌদির খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করলাম। শুনলাম দুলালদা এনকোয়ারি অফিসে এসে বিপাশা বৌদির খোঁজ নিয়েছেন, সম্ভবতঃ পেয়েও গেছেন। মিলিটারির কথায়, একটু আগে দুলালদা "গেটের সামনেই তো দাঁড়িয়ে ছিলেন"। আমরা তবু আমাদের টেন্টের নম্বর কন্ট্রোল রুমে রেখে এলাম যদি যোগাযোগ করা সম্ভব হয়। ফিরে এলাম তাঁবুতে। মাথাপিছু ৩০০ টাকার তাঁবু। আমাদেরটায় ভেতরে আলোর ব্যবস্থাও ছিল না। বরফের ওপর একটা স্লিপিং ম্যাট আর কার্পেট। মাথার কাছে একটা লেপ। এক টেন্টে ৯ জন থাকার ব্যবস্থা। যাত্রীদের জন্য পাহাড়ের বেশ কিছু ওপরে পাবলিক টয়লেটের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

একটা লেপ নিচে পেতে নিলাম। ভেতরে একটা সোয়েটার, তার ওপর ভারী জ্যাকেট আর লেপ মুড়ি দিয়েও ঠান্ডায় কাঁপছিলাম। হবে নাই বা কেন? টেন্ট তো পুরোটাই বরফের ওপরে। আমাদের পর আরও তিন জন অমরনাথ যাত্রী এলেন। বিহার থেকে ছেলে তার বৃদ্ধ বাবা-মাকে নিয়ে এসেছেন অমরনাথ দর্শনের জন্য। প্রভুজির দর্শন পাওয়া তাঁদের পরম প্রাপ্তি। একটা সময় মনে হয়েছিল হয়তো আসতে পারবেন না। যে টাকার দরকার তা আর জোগাড় করে উঠতে পারছিলেন না। শেষে এক মুসলিম শুভানুধ্যায়ী টাকার ব্যবস্থা করে দেন।

রাতে হয়তো ভাণ্ডারায় খেতে পারতাম, কিন্তু আর ইচ্ছে করল না ঠান্ডার মধ্যে বাইরে গিয়ে খেয়ে আসতে। সঙ্গে মুড়ি ছিল, তাই খেয়েই দু'জনে শুয়ে পড়লাম। টেন্টে শুয়েই শুনতে পেলাম অমরগঙ্গার প্রবল জলস্রোতের শব্দ। সব আওয়াজ ছাপিয়ে একটাই শব্দ কানে ভাসতে লাগল - অমরগঙ্গার দৃপ্ত পদধ্বনি। একে গর্জন বলে না, বরং যেন প্রাণচঞ্চলতার প্রতীক। রাতটাকে মনে হল অনেক অনেক বড়। লেপমুড়ি দিয়ে শুয়েছিলাম। একটু পরেই দেখলাম নাকের কাছে লেপটা ভিজে গেছে। আবিষ্কার করলাম, প্রচন্ড ঠান্ডায় নিশ্বাসের বাস্প জমে গিয়ে লেপ ভিজিয়ে দিয়েছে। লেপের বাইরেও কিছুটা ভিজে ভাব। টেন্টে রাত কাটানোর পরিকল্পনা ছিল না। পহেলগাঁও-এর পথে যদি অমরনাথ আসতাম তাহলে টেন্টেই থাকতে হত। তাই সঙ্গে স্লিপিং ব্যাগ আর এয়ার পিলো (পাম্প বালিশ) নিয়ে বেরিয়েছিলাম । কিন্তু যখন রাস্তা বদল করে বালতাল হল, সবকিছু শ্রীনগরের হোটেলেই রেখে এসেছিলাম। এখন মনে হচ্ছে সেসব সঙ্গে থাকলেই ভালো হত।
রাতে কতবার যে ঘুম ভাঙল ঠিক মনে নেই। প্রতিবারই কাঁধ আর ঘাড়ের কাছে একটা ব্যথা অনুভব করছিলাম। আসলে মাথায় কোনও বালিশ নেই, অক্সিজেনের ঘনত্বও কম, আর নীচ থেকে একটা প্রচণ্ড ঠান্ডা উঠছে।

সকাল হল। সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ঘুম ভাঙার পর বাইরে বেরোলাম। খুবই কম লোক চলাচল করছে। সকালবেলার উপত্যকার ছবি ক্যামেরা বন্দী হল। বাইরে থেকেই গুহার কিছু ছবি তুললাম। কাল যখন পৌঁছেছিলাম সন্ধ্যা হয়ে আসছিল, পুরো জায়গাটা ভালো করে দেখতে পাইনি। এখন ঠিক মাঝখান থেকে পুরো উপত্যকাকে অনুভব করলাম। গোটাটাই পর্বতে ঘেরা। পদ্মের পাপড়ি যেমন ফুলের ভেতরের অংশকে ঘিরে রাখে, তেমনি পাহাড়ও এই উপত্যকাকে আড়াল করে রেখেছে। পর্বতের গায়ে সামরিক বাহিনির সেনা চৌকির নম্বর দেওয়া আছে। এরাই এই অঞ্চলের দেখাশোনা করে। পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া অমরগঙ্গার উৎপত্তি এখানেই। এখানে যেন একটা নালা মাত্র, অথচ প্রবল স্রোতে বুঝিয়ে দিচ্ছে তার স্বাতন্ত্র্যের কথা।
ফিরে আসতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হবে। আসলে আকাশে হাল্কা মেঘ দেখতে পাচ্ছিলাম। পাহাড়ি পথে বৃষ্টিতে যে কোন সময় রাস্তা বন্ধ হওয়ার ভয়। যা হোক করে দু'টো ঘোড়া জোগাড় করা হল । ঘোড়া পিছু ১৪০০ টাকা থেকে কমিয়ে আমরা ১৩০০ তে রাজি করিয়েছিলাম, কিন্তু বাদ সাধল ঘোড়ার মালিক। বাধ্য হলাম ১৪০০ তেই ঘোড়া বুক করতে। ঘোড়ার মাথায় হাত বোলালাম। সহিসকে অভ্যাস মত জিগ্যেস করলাম তোমার নাম কি? উত্তর পেলাম - ইব্রাহিম। আর ঘোড়ার নাম? ও বলল - রাজু!
ফেরার পথ ধরার আগে এ যাত্রায় শেষবারের মত অমরনাথজির গুহা, অমরগঙ্গা আর দুধ-সাদা উপত্যকার দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। জানি না আর কোনওদিন এখানে আসা হবে কী না। তারপর "রাজু"-র পিঠে চড়ে রওনা দিলাম বালতালের দিকে। যে পথে এসেছিলাম, ফেরার পথ তার চেয়ে কিছু আলাদা। ঘোড়ার চলার পথ অনেক বেশি দুর্গম, কোথাও কোথাও অনেক বেশি ঢাল। ঘোড়ার চলার সঙ্গে নিজের শরীরের ভারসাম্য রাখাটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ। যখন ঘোড়া ওপর দিকে ওঠে তখন সামনের দিকে ঝুঁকে পড়তে হয়, আবার যখন নীচের দিকে নামে, দেহের ভারটা পেছন দিকে দিতে হয়। ইব্রাহিম আমাকে পুরো ব্যাপারটা পাখি পড়ার মতো বুঝিয়ে দিল। পিঠে ব্যাগ নিয়ে চেষ্টা করলাম শক্ত হাতে জিন ধরে বসে থাকার, কোনও অবস্থাতেই জিন ছাড়া চলবে না। লাগাম হাতে ইব্রাহিম সামনে এগিয়ে চলেছে। কিছুক্ষণ যেতেই পিঠের ব্যাগটা আলগা হয়ে গেল। তাতে সেটা এককাত হয়ে পিঠে আটকে রইল। এভাবেই চললাম পুরো পথ। ঘোড়ার চলার সিস্টেমটা বড়ই অদ্ভুত। পরপর লাইন দিয়ে এগোতে থাকে। খুব সরু পথেও নিজের ভারসাম্য রেখে এগিয়ে চলে। সামনের পা জোড়া যেখানে পড়ে, একটু পরে পেছনের পা জোড়া এসে সেই জায়গা নেয়। চার পায়ে চলায় ভারসাম্য মানুষের চেয়ে অনেক বেশি। কি বরফ, কি পাথর, কি কাদামাটির এবড়ো-খেবড়ো পথ, নিজের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রেখে ঘোড়া এগিয়ে চলে। সমস্যা একটাই। ঘোড়া চলে রাস্তার একদম কিনারা দিয়ে। নীচের দিকে তাকাতেও এক এক সময় ভয় হয়। একটা বিশাল ঢাল বেয়ে নেমে এলাম সঙ্গমে এখানে অমরগঙ্গা এসে মিশেছে সমতলে। সঙ্গমে সে পুরোদস্তুর নদী। কোথাও আবার হিমবাহের আড়ালে মুখ ঢেকেছে। এখানে কিছু সেনাচৌকি আর তাঁবু রয়েছে সেনাদের জন্য। কত যে চড়াই উৎরাই পেরোলাম তার হিসেব নেই, কিন্তু এবার তেমন কষ্ট হচ্ছে না, কারণ আমার কষ্টের সমস্ত ভার "রাজু" নিয়ে নিয়েছে। কাল প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে উঠে এসেছিলাম, ফেরার পথে ঘোড়ার পিঠে চড়ে সোজা রাস্তায় খুব সহজেই পার করলাম। যে জায়গায় পা পিছলে পড়ে গেছিলাম, অবলীলায় সে রাস্তা পেরিয়ে এলাম। খুব খারাপ লাগছিল ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হতে, কিন্তু তাড়াতাড়ি বালতাল পৌঁছতে হবে, আর কোন উপায়ও নেই।

একটু পরপর হেলিকপ্টার উড়ে যাচ্ছে যাত্রীদের নিয়ে। এ রাস্তা দিয়েই হয়তো আমরা আগের দিন গিয়েছিলাম, কিন্তু ফেরার দৃশ্য পুরো আলাদা। যাওয়ার সময় যে অপরূপ দৃশ্য আমাদের পেছনে পড়ে ছিল এখন তাই চোখের সামনে ভেসে উঠছে। সহিসরা মাঝে মধ্যে তাদের ঘোড়াকে চাবুক মেরে জোরে ছুটতে বাধ্য করছিল। এক সওয়ারি প্রতিবাদ করল, সহিসকে দু'কথা শুনিয়েও দিল। আমরাও সেই সওয়ারির কথায় সায় দিয়ে ঘোড়াওয়ালাকে বললাম ঘোড়াকে না মারতে। একটু পরেই সরু রাস্তায় প্রচণ্ড ভিড় হয়ে গেল। একদিক দিয়ে যাত্রীরা গুহার দিকে যাচ্ছে আর অন্য দিক দিয়ে আমরা নামছি। অমরনাথ যাত্রার একদিন পেরিয়ে গেছে। ভাণ্ডারার সংখ্যা এখন আরও বেশি। এই একদিনে আরও অনেক নতুন ভাণ্ডারা তৈরি হয়েছে। কিন্তু কোথাও একটাও বাঙালি ভাণ্ডারা চোখে পড়ল না। এক জায়গায় ভেড়া ও ছাগলের পাল আমাদের পথ অবরোধ করল। কিছুক্ষণের জন্য চারদিক ধুলোয়

ঢেকে গেল। মাস্কের উপযোগিতা আবারও অনুভব করলাম। প্রায় ঘন্টা তিনেক পরিশ্রমের পর ইব্রাহিম আর রাজু আমাদের নিরাপদে বালতাল পৌঁছে দিল। ঘোড়ার পিঠ থেকে নামার সময় আমি পেছন দিক দিয়ে পা নামানোর চেষ্টা করছিলাম। তাই দেখে আরেক ঘোড়াওয়ালা চেঁচিয়ে উঠল - "আপকো উতরনা হ্যায় ইয়া চড়না হ্যায়?" বুঝলাম ঘোড়ার পিঠে ওঠার সময় পেছন দিক দিয়ে পা তুলতে হয়। আর নামার সময় ঠিক উল্টো, সামনের দিক দিয়েই পা নামাতে হবে।
এবার আমাদের প্রথম কাজ ছিল একটা সিম কার্ড জোগাড় করা। যাত্রা পারমিটের সঙ্গে একটা সিম পারমিট দেওয়া ছিল। পুলিশকে জিগ্যেস করে জেনে নিলাম কোথায় সিমকার্ড পাওয়া যাবে। বলে দিল যে ওরা চারশ-পাঁচশ টাকা চাইলেও আপনি দুশো টাকার মধ্যে রফা করার চেষ্টা করবেন। কয়েকজন মিলিটারি এগিয়ে এল, হাসিমুখে বলল - যাত্রা সেরে ফিরলেন? কেমন হল যাত্রা? কিন্তু আসল নজরটা দেখলাম পিঠের বড় ব্যাগের দিকে। কথার ফাঁকে ব্যাগটা বম্ব ডিটেক্টর দিয়ে চেক করে নিল। মিলিটারির সদা সতর্ক দৃষ্টির জন্যই হয়তো এই যাত্রা সুরক্ষিত। অনেক কষ্টে একটা যাত্রা-সিম জোগাড় করা গেল। ৬৫০ টাকা পড়ে গেল সিম কার্ড জোগাড় করতে। বোঝা গেল এরা কৃত্রিম অভাব তৈরি করছে। কিন্তু সিমটা আমাদের ভীষণ দরকার। সিম পেয়ে প্রথমে বাড়িতে ফোন করে ফেরার খবরটা জানালাম।
বালতালের দৃশ্য যাওয়ার সময় উপভোগ করার তেমন সময় পাই নি । ফেরার সময় কিছুটা আন্দাজ পাওয়া গেল। পাশের সিন্ধ নদীর প্রবল রূপ যাওয়ার সময়ও দেখেছিলাম, কিন্তু তখন তা উপলব্ধি করার মত সময় ছিল না। দুই তুষারাবৃত গিরিচূড়ার মাঝে নির্মল নীল আকাশ আর সেই আকাশে পাখির মত ভেসে চলা সাদা মেঘের পুঞ্জগুলো তখন পেছনেই পরে ছিল। এখন বালতালের দৃশ্য দেখে মনে হল এ যেন যথার্থই স্বর্গদ্বার। প্রকৃতির সাথে সখ্যতা করে তার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার আদর্শ জায়গা। এখানকার রক্ষণাবেক্ষণ করে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট। কোন জনবসতি নেই। পাহাড়ি ছাগল নির্ভয়ে পাহাড়ের গায়ে খেলা করে বেড়ায়। ভেড়ার পাল চড়ে বেড়ায় উন্মুক্ত মাঠে। সিন্ধ নদীর জলে তেষ্টা মেটায় টাট্টু ঘোড়া। সবুজে ঢাকা পাহাড় যেন প্রকৃতির খেলার মাঠ আর সেই মাঠে খেলার উপকরণ হল ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য নুড়ি-পাথর। অমরনাথ যাত্রা উপলক্ষে বালতালে বসেছে অস্থায়ী ক্যাম্প, অস্থায়ী সেনা শিবির। তৈরি হয়েছে অস্থায়ী ট্যাক্সি স্ট্যান্ড। সবই নদীর তীর ঘেঁসে। এই নদী গিয়ে মিশেছে ঝিলম এর সঙ্গে।
আমরা হোটেলে ফেরার জন্য একটা গাড়ি বুক করলাম। বালতালকে বিদায় জানিয়ে রওনা দিলাম শ্রীনগরের পথে।

[হোটেলে ফিরে জানতে পেরেছিলাম সেদিনই অমরনাথে ওপর থেকে পাথর পড়ে এক জওয়ান ও এক যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া বৃষ্টিও প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই বেশ কিছুক্ষণের জন্য যাত্রা বন্ধ রাখা হয়েছিল। তবে দুলালদা-দেবাশীষদারা নিরাপদেই নেমে আসতে পেরেছিলেন। আবার একবার ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিয়েছিলাম এযাত্রায় আমাদের সাহায্য করার জন্য।]

~ অমরনাথের তথ্য || অমরনাথের ছবি || অমরনাথ যাত্রার ট্রেক রুট ম্যাপ ~

রিষড়ার সুদীপ্তর দত্তের ঘুরে বেড়ানোর সখ অনেকদিনের, কিন্তু বিধি বাম। তাই বেশিরভাগ সময় হয় অসুস্থতা কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য যাত্রা বাতিল হত। পরিস্থিতি এতটাই ঘোরালো ছিল যে কেউ সঙ্গে নিতেও সাহস পেত না। তবে সম্প্রতি উটি ঘুরে আসার পর পরিস্থিতি পাল্টেছে। রক ক্লাইম্বিং এর বেসিক পাঠ নেওয়ার পর উৎসাহ বেড়ে গেছে কয়েকগুণ। এখন একটা ট্যুরে যাওয়ার আগেই পরের ট্যুরের প্ল্যান রেডি থাকে।

কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন : 1
গড় : 5.00
Like 41 people like this. Be the first of your friends.
tell a Friend

= 'আমাদের ছুটি' বাংলা আন্তর্জাল ভ্রমণপত্রিকায় আপনাকে স্বাগত জানাই = আপনার বেড়ানোর ছবি-লেখা পাঠানোর আমন্ত্রণ রইল =

নীল দ্বীপান্তরে

দেবপ্রসাদ মজুমদার

~ আন্দামানের তথ্য ~ আন্দামানের আরও ছবি ~

এতকাল জন্মভূমির রূপ দেখেছি মাটির ওপর দাঁড়িয়ে। এই প্রথম আন্দামান যাওয়ার পথে সুযোগ হল নীল আকাশের পেঁজা তুলোর ফাঁক দিয়ে আমার সবুজে সাজানো জন্মভূমি দেখা। ঘন্টা দুয়েক পর পৌঁছলাম বীর সাভারকর বিমান বন্দরে। ঘড়িতে তখন সকাল সোয়া আটটা মতো।
বেরিয়ে দেখি আমার নাম লেখা কাগজ নিয়ে একজন দাঁড়িয়ে। কাছে গিয়ে পরিচয় দিলাম। জানলাম ওঁর নাম দীনেশ - আমাদের আগামী কয়েক দিনের গাড়িচালক তথা সফর সঞ্চালক। ফোন নম্বরটা না চাইতেই দিয়ে বললেন - প্রয়োজন হলেই জানাবেন। আমার সাত বছরের মেয়েকে নিয়ে মোট দশজনের দল। মিনিট দশেকের মধ্যেই পৌঁছলাম রামকৃষ্ণ মিশনে। একেবারে সমুদ্রের ধারে। এখানে একটা আবাসিক স্কুল আছে। তাছাড়া বিভিন্ন ভোকেশনাল ট্রেনিং দেওয়া হয়। এখানকার বেশ কয়েকটা রুম পর্যটকদের জন্য ভাড়া দেওয়া হয়। চার বেডের ঘর। রুমগুলো বেশ বড়। সংযুক্ত না থাকলেও প্রত্যেক ঘরের জন্য আলাদা বাথরুম আছে। জলের ব্যবস্থাও ভালো।
ফ্রেস হয়ে নিয়ে দীনেশ ভায়াকে ফোন - আমরা তৈরি। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ি নিয়ে হাজির। বাইরে চড়া রোদ। আমাদের মাথায় টুপি, চোখে রোদচশমা আর হাত-মুখে সানস্কিন লোশনের আবরণ। যথেষ্ট পরিমাণে জল নিয়ে গাড়িতে উঠে পড়লাম - সেলুলার জেলের উদ্দেশে।

সেলুলার জেল

মিনিট দশেক পর পৌঁছলাম সেলুলার জেলের সামনে। দুটি বিশাল হলুদ থামের মাঝে ভিতরে ঢোকার গেট। ইংরেজ অত্যাচারের এই স্মৃতি সৌধ দেখে প্রথম দর্শনে একটা শিহরণ অনুভব করলাম। কত বীরকে যে নির্বিচারে বলি দেওয়া হয়েছে এখানে তার কি আর হিসাব আছে? দীনেশের ইশারাতে ঢুকে গেলাম জেলের ভিতরে। ঢুকেই বাঁদিকের সিড়ি দিয়ে উঠে যে ঘরে প্রবেশ করলাম সেখানে সুন্দর ভাবে সাজানো আছে বীর দেশপ্রেমীদের ছবি, যাঁরা এই জেলে বন্দী ছিলেন। বাইরে দিনরাত জ্বলছে মশাল, যার গ্যাস সরবরাহ করে ইন্ডিয়ান অয়েল। মাঠের এক ধারে কয়েকশ চেয়ার পাতা। এখানে সোমবার বাদে প্রতি সন্ধ্যায় দুটি করে আলো ও ধ্বনির অনুষ্ঠান হয়। এই জেলের মাঝে একটা টাওয়ার থেকে বের হয়েছে সাতটি উইং। যেখানে সবমিলিয়ে ৬৯৮টি খুপরি বা সেল ছিল। বর্তমানে তিনটি উইং-এর ২৯৬ টি খুপরি বর্তমান। দুটি ভেঙ্গে গেছে, আর দুটি গোবিন্দবল্লভ পন্থ হাসপাতালে পরিণত করা হয়েছে। প্রত্যেক খুপরির সামনে মোটা লোহার রেলিং, পিছনে বেশ উঁচুতে একটা আলো আসার গর্ত। সূর্যের আলো ছাড়া অন্য কোনও আলোর ব্যবস্থা ছিল বলে মনে হলনা। খুপরিগুলো এমন ভাবে তৈরি যে বাসিন্দারা একে অন্যের মুখ দেখতে পেতনা। মাঠের এক কোণে ফাঁসির মঞ্চ। ফাঁসি দেওয়ার আগে ঘন্টা বাজানো হত, যাতে সকলে জানতে পারে। ফাঁসিঘরের সামনে দু-কামরার বেড়ার বাড়ি, সেখানে একটি মূর্তি রাখা আছে বন্দীদের দিয়ে কী ভাবে নারকেল থেকে তেল বের করানো হত তা বোঝানোর জন্য। এক কোণে রাখা আছে ডেয়ার সাহেবের সেই কুখ্যাত কাঠের চেয়ার। যাতে বসে সাহেব তীক্ষ্ম তত্ত্বাবধান করতেন। কাজে একটু অবহেলা হলেই জুটত অকথ্য অত্যাচার। এখানে আরও দেখানো আছে শাস্তির মাত্রা অনুযায়ী বিভিন্ন রকমের লোহার বেড়ি। খড়-খড়ে গা চুলকানো জামা। অপর ঘরে বিভিন্ন নেতাদের ছবি। তিন তলায় অবস্থিত বীর সাভারকার-এর কুঠুরিটা বিশেষ ভাবে সংরক্ষিত আছে। টাওয়ারের সিঁড়ি বেয়ে একেবারে ওপরে ওঠা যায়। দেওয়ালে মার্বেল পাথরে খোদাই করা বীর সেনানীদের নাম। কাঠের পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে রস-স্মিথ-নর্থ বে সহ বিভিন্ন দ্বীপ দেখতে পাওয়া যায়। ইংরেজ আমলের বন্দী-স্মৃতি আজও এখানকার মজ্জায় মজ্জায়, যা স্বদেশবাসী হিসেবে বেদনা দেয়।
পরের গন্তব্য ফিশারিজ মিউজিয়াম তথা অ্যাকোয়ারিয়াম। এখানে রাখা আছে বিভিন্ন ধরনের জীবিত ও মৃত সাড়ে তিনশোরও বেশি সামুদ্রিক প্রাণী। ঢুকেই মেঝের ওপর রাখা কালো হাঙর দেখলে বেশ অবাক লাগে। পাশে রাখা বিশাল ঝিনুক।
চোখের খিদে মিটলেও পেটের খিদে তখন চরম পর্যায়ে। দীনেশ আমাদের নিয়ে গেলেন আদি বাঙালি হোটেলে। এখানে ভাত ডাল সব্জির সাথে পাওয়া যায় বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক মাছও।
খাওয়া সেরে এলাম জোনাল অ্যানথ্রোপলজিক্যাল মিউজিয়াম দেখতে। মিউজিয়ামের টিকিটটা সংগ্রহ করে রাখার মত সুন্দর। এখানকার বিভিন্ন গ্যালারিতে রাখা আছে আন্দামান ও নিকোবরের নানা উপজাতির ব্যবহৃত হাতিয়ারের নিদর্শন, নানারকম বাদ্যযন্ত্র, টুপি, ছাতা, পাখা ও বিভিন্ন ধরনের গয়না। কুঁড়ে ঘরের মডেল। প্রায় তিরিশটি মডেলের মাধ্যমে জারোয়া ও অন্যান্য উপজাতীয় মানুষের জীবনযাত্রার বিভিন্ন মুহূর্ত তথা মানুষ ও প্রকৃতির স্বাভাবিক সহাবস্থানের ছবি। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় দেখা যাবে নানা ধরনের নৌকো ছাদ থেকে দড়ি দিয়ে ঝোলানো।

করভিন্স কোভ বিচ, পোর্ট ব্লেয়ার

বেরিয়ে দেখি রাস্তার ধারে বিশালাকৃতির ডাব বিক্রি হচ্ছে, কুড়ি টাকা করে। ডাবের জল খেতে খেতে পি সি সরকারের সেই ওয়াটার অফ ইন্ডিয়ার কথা মনে পড়ছিল, জল যেন শেষই হচ্ছেনা। উপরি পাওনা নরম শাঁস। ডাবের জলে ডুব দিয়ে আমরা চললাম করবিনস কোভ বীচের দিকে। বীচ বলতেই আমাদের চোখে দীঘা -পুরী বা ভাইজ্যাগ-এর কথা মনে পরে। কিন্তু এই বীচ সেই চেনা চিত্র থেকে আলাদা, বিশেষত ঢেউ এর তাণ্ডব খুবই কম আর পরিষ্কার নীল জল। জলে নামার উপযুক্ত পোশাক থাকলে নির্দ্বিধায় নেমে পড়া যায়। করা যায় স্কুবা ড্রাইভও। কাঠের ছোট্ট টাওয়ারের ওপর উঠলে সমস্ত বীচটা সুন্দর দেখা যায়। সুনামি থেকে শিক্ষা নিয়ে দেওয়া হয়েছে কংক্রিটের দেওয়াল, যার ওপর সারি দিয়ে রাখা নীল কাঠের আরাম কেদারা, কুড়ি টাকা প্রতি ঘন্টা। নারকেল বাগানের ফাঁক দিয়ে নরম রোদ পিঠে করে ঘন্টা দুয়েক যে কীভাবে কেটে যাবে বোঝাই যাবে না। যেন আনমনে মন দিয়ে ফেলা সমুদ্রকে। সন্ধ্যার অন্ধকার নামতেই দীনেশ পৌঁছে দিল রাজীব গান্ধী ওয়াটার কমপ্লেক্সে। এখানে ছোটদের বিনোদনের জন্য স্থলে এবং বড়োদের জন্য জলে নানা ধরনের ক্রীড়ার ব্যবস্থা আছে। সমস্ত অঞ্চলটা আলো দিয়ে সাজানো। আছে রাজীব গান্ধীর পূর্ণাবয়ব মূর্তি - মনে হয় হাতের মালাটা যেন আমাদের দিকেই ছুঁড়ে দিচ্ছেন। ঘন্টাখানেক পর দীনেশভায়া ফোন করে জানাল, দাদা আপনারা গেটের বাইরে চলে আসুন লাইট অ্যান্ড সাউন্ড-এর সময় হয়ে গেছে। দেরি না করে সবাই গাড়িতে গিয়ে উঠলাম। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে পৌঁছে গেলাম সেলুলার জেলের গেটের সামনে। দিনের আলোয় যে জেল দেখতে ভয় লেগেছিল - নিয়নের আলোয় তাতে যেন একটা মায়ার প্রলেপ পড়েছে। সন্ধ্যের প্রথম শো তখনও শেষ হয়নি। আমরা গেটের সামনে লাইনে দাঁড়ালাম, দীনেশ প্রত্যেকের হাতে টিকিট ধরিয়ে দিল। আগের শো শেষ হলে ভিতরে পাতা চেয়ারে গিয়ে বসলাম। আলো-আঁধারির মধ্যে বসে দিন রাতের হিসেব মেলাতে লাগলাম। সেই মশালটার অনির্বাণ দীপশিখা মনের সুপ্ত দেশাত্মবোধকে উদ্দীপ্ত করছিল। পঞ্চাশ মিনিটের এই অনুষ্ঠানে তুলে ধরা হল ইংরেজ অত্যাচারের করুণ কাহিনি। আদি বাঙালি হোটেল থেকে মাছ-ভাত খেয়ে মিশনে ফিরলাম। আগামী কাল যাব বারাটাং। এই অঞ্চলেই বাস করে আন্দামানের সেই আদিম উপজাতি - জারোয়া। বারাটাং-এ ঢুকতে বিশেষ অনুমতি লাগে।

সকাল ছ'টার মধ্যে তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। পোর্ট-ব্লেয়ার ছাড়িয়ে গাড়ি ছুটল বারাটাং চেকপোস্ট-এর দিকে। রাস্তার দুধারে জনবসতিহীন অঞ্চলে সুনামির বীভৎসতা চোখে পড়ে। মাথাহীন নারকেল গাছের বাগান, ছাদহীন বাড়ি, ওল্টানো ভাঙ্গা নৌকা। আধা বন্য অঞ্চল পেরিয়ে বেলা আটটা নাগাদ পৌঁছলাম বারাটাং চেকপোস্টে। আমাদের আগে মাত্র একটি গাড়ি। বারাটাং চেকপোস্ট খুলবে ন'টায়। দিনে চার বার ৬টা, ৯টা, ১২টা ও ১৪-৩০-এ বারাটাং এর কনভয় ছাড়া হয়। গাড়ি থেকে নেমে ডান দিকে গোটা তিনেক খাবারের গুমটি তাতে ইডলি-ধোসা-কচুরি ইত্যাদি পাওয়া যায়। পাশেই রয়েছে একটা অশ্বত্থ গাছ, তার নিচে নানা ঠাকুরের মূর্তি - আর গাছে বাঁধা ছোট ছোট দোলনা। তারই পাশে একটা ঢিবির ওপর ছোট্ট মন্দির। ভিতরে কালো উজ্জ্বল পাথরের শীতলা মূর্তি। মন্দিরের সামনে ঝুলছে বেশ বড় একটা ঘন্টা। দেখতে দেখতে গাড়ির লাইন বেশ লম্বা হয়ে গেছে। আঁকা বাঁকা রাস্তার বাঁদিক ঘেঁসে গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে। চেকপোস্ট অফিসের সামনে লাগানো কনভয় ছাড়ার সময় সারণী আর কী কী করা যাবে না তার নাতিদীর্ঘ একটা তালিকা। ন'টা বাজতেই মাইকে সেসব ঘোষনা করা শুরু হল। একটু পরেই গার্ড-পোস্টটা উঠে গেল- আমাদের যাত্রা শুরু। একজন পুলিশ মোটর সাইকেলে চড়ে আমাদের আগে আগে চললেন। ভালো-খারাপ রাস্তার ওপর দিয়ে গাড়ি ছুটছে তীর বেগে। আর আমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি জঙ্গলের দিকে। অবশেষে ক্ষণিকের দেখা পেলাম, দুজন প্রাপ্ত বয়স্ক আর তিন শিশু। গোটা শরীর সাদা ছাই মাখা, বড়োদের হাতে অস্ত্র, বাচ্চাদের হাতে লাঠি। পরে জঙ্গলের মধ্যে আরো দুজনকে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেল। দীনেশের কাছে জানলাম বর্তমানে দুশো চল্লিশ জনের মতো জারোয়া আছেন। ওরা আমাদের খাবার খাননা, তবে নাকি পান খেতে ভালোবাসেন। ।

লাইম স্টোন কেভের পথে

কয়েক ঘন্টা পর পৌঁছলাম জেটিতে। দেখি বড় বড় ভেসেলে মানুষ-গাড়ি সবাই উঠছে। নীল জলের ওপর সাদা ফেনার বিলি কাটতে কাটতে আধঘন্টা পরে পৌঁছলাম মিডল আন্দামানের উত্তরা জেটিতে। দীনেশ ভায়া কালুভাই-এর সঙ্গে পরিচয় করে দিয়ে বললেন উনি আমাদের লাইমস্টোন কেভ নিয়ে যাবেন। জেটির ওপর বিক্রি হচ্ছে কুড়ি টাকা করে বড় বড় ডাব। চড়া রোদে ঠান্ডা জল ভালোই লাগলো। আরো ঠান্ডার পরশ পেতে হাত পাতলাম কুলপিওয়ালার কাছে। বোট চলে এসেছে। কুড়িজন বসা যায়। সবার লাইফ জ্যাকেট পড়া হলে নৌকা চলা শুরু করল। প্রখর দহন থেকে বাঁচতে ভরসা ছাতা বা টুপি। প্রচন্ড হাওয়ায় তাও উড়ে যাচ্ছে প্রায়। নীল জলের দুই পাড়ে ঘন ম্যানগ্রোভ গাছ। এত ঘন যে মনে হচ্ছে কেউ সবুজ কার্পেট শুকোতে দিয়েছে।

নীল জলে দোলা খেতে খেতে নৌকা অপেক্ষাকৃত কম চওড়া নালার মধ্যে প্রবেশ করল। এখানে দুটি নৌকা পাশাপাশি আসা যাওয়া করতে পারে। এই রাস্তাটি বেশ মায়াময়। দু'ধারে ম্যানগ্রোভ গাছের জঙ্গল - একটা শীর্ণ কাণ্ড থেকে অনেকগুলি সরু সরু শিকড় বেরিয়ে মাটিতে প্রবেশ করেছে, লম্বা কাণ্ডের মাথা থেকে প্রচুর শাখা প্রশাখা বের হয়ে আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। পাতার ফাঁকে ঝুলছে লম্বা লম্বা সজনে ডাঁটার মত ফল। আলো-ছায়ায় মেশানো পাতার সামিয়ানার তলা দিয়ে মিনিট পাঁচেক যাওয়ার পর একটা কাঠের জেটিতে উঠলাম। একজন দেখি চার্জার লাইট হাতে বললেন আপনারা কালুদার গ্রুপের লোক? আমাকে অনুসরণ করুন। বুঝলাম উনি আমাদের গাইড। রোদের মধ্যে আন্দামানের বুকে গ্রামবাংলার মাঠ - ধান চাষ হওয়া জমির আল রাস্তা, কয়েকটা কুঁড়ে ঘর পেরিয়ে প্রবেশ করলাম লাইমস্টোন কেভে। কেভের ভিতরটা বেশ অন্ধকার - গাইডের আলোই এক মাত্র ভরসা। এবড়ো-খেবড়ো রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে মাথা তুললেই দেখা যাচ্ছে - চুনাপাথরের গা বেয়ে জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে কী অপূর্ব নকসা তৈরি হয়েছে। কোনোটা পদ্মের মতো, কোনোটা শঙ্খের মতো দেখতে। ওদের কথায় ভিজে অংশ গুলো জীবিত। একটা জায়গায় দেখলাম ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে স্তম্ভের আকার ধারণ করেছে। এটা দেখতে দেখতে ভাইজ্যাগের বোরা কেভের সঙ্গে গঠনগত মিল পাচ্ছিলাম। অমিল শুধু ব্যবস্থাপনায়। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে আঁকা বাঁকা কাঠের সাঁকো ওপর দিয়ে হেঁটে যেখানে পৌঁছলাম, দেখি আমাদের নৌকা দাঁড়িয়ে। লাইফ জ্যাকেট বেঁধে একই পথ দিয়ে পৌঁছলাম উত্তরা জেটিতে। ঘড়িতে তখন বেলা পৌনে দুটো।

রস আইল্যাণ্ড

খাওয়া দাওয়া সেরে চললাম চুয়ান্ন কিমি দূরে আমকুঞ্জ বীচের দিকে। জনশূণ্য বীচে তিনটি গুমটি আর গোটা কতক কুকুর ছাড়া আর কেউ নেই। কিন্তু আছে সফেন সমুদ্রের মৃদু গর্জন আর পাড়ে পড়ে আছে বিভিন্ন ধরনের নানা আকারের কোরাল। পোর্টব্লেয়ারের মিউজিয়ামের কাঁচের আড়ালে যাদের ছোঁয়ার ছিল মানা, এখানে তাদের দুহাতে নিয়ে সেই ইচ্ছা মেটালাম। পড়ে আছে নানা আকারের ঝিনুক, কড়ি ও শঙ্খনাভি। মনে হয় সবই সংগ্রহ করি, কিন্তু কড়া নিষেধ রয়েছে আন্দামান থেকে কোরাল নিয়ে আসাতে। পাড়ে একটু জলা জায়গায় দেখলাম নানা রঙের ছোট ছোট ঝিনুক ঘুরে বেড়াচ্ছে। চোখ বুঝলে এখনও সেই দৃশ্য দেখতে পাই। একটু আওয়াজ হলেই সবাই স্থির। আবার একটু নীরবতার পর ঝিনুকগুলোর চলাফেরা শুরু। দীনেশভায়াও তাগাদা দিতে শুরু করেছে। ঘড়িতে বিকেল পৌনে পাঁচটা, আরও ঘন্টা দুয়েকের পথ বাকি।
গাড়ি মিনিট কুড়ি মত চলার পর, রাস্তার ধারে একটা চায়ের দোকানের সামনে থামল। দীনেশ বললেন এই বীচটা দেখে আসুন। ক্লান্ত শরীরে অনিচ্ছাসত্ত্বেও নামলাম। কাঠের সাইনবোর্ডে লেখা - বালুডেরা বীচ। একটা গাছের গুঁড়িকে কেটে চেয়ার বানানো হয়েছে তার পাশে রাখা বিশাল একটা কোরাল - দেখতে অনেকটা তালগাছের গোড়ার মত। সমুদ্রের ধারে তীক্ষ্ণধার পাথরের ছোট্ট পাহাড়। কাঠের পাটাতন দিয়ে তৈরি করা রাস্তা পাহাড়ের ওপর ছোট্টো কাঠের চাতালে গিয়ে শেষ হয়েছে। ওখানে বসার জায়গাও আছে। সেখানে বসে সায়াহ্নের সমীরণে সমুদ্রের অশান্ত রূপ না দেখলে, সত্যিই মিস্ করতাম। পাথরে আছড়ে পড়ছে ঢেউ, জলের ছিটে লাগছে চোখে মুখে। সারাদিনের ক্লান্তি যেন সাগর মুছে দিল এক নিমেষেই। এখানেও পড়ে আছে নানা আকারের কোরাল।
মন না চাইলেও গাড়িতে উঠতে হল। সন্ধে নেমে আসছে। ডানদিকে সমুদ্রকে সঙ্গে করে আমাদের গাড়ি ছুটছে। হালকা চাঁদনি আলোয় - উত্তাল সমুদ্রের গর্জন আর তার শীতল হাওয়া চোখে ঘুমের আবেশ আনলেও দেখার ইচ্ছে চোখকে বুজতে দিলনা। সেই মায়াময় মুহূর্তকে আরও উপভোগ করতে দীনেশভায়াকে বললাম গাড়ির স্টিরিও-র গান বন্ধ করে দিন। জলের শব্দ পাড়ের নীরবতাকে গ্রাস করতে লাগল। ঘন্টখানেক ছোটার পর মায়াবন্দরের সম্রাট হোটেলে ঢুকলাম। থাকার ব্যবস্থা খুব ভালো। তবে খাওয়া দাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই। রাস্তার ওপারেই একটা রেস্টুরেন্ট আছে, সেখানে সব কিছু পাওয়া যায়। দীনেশ ভায়া বলল সকাল সাতটায় গাড়ি ছাড়বে। রাতে সমুদ্রের হালকা গর্জন শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

রস ও স্মিথ আইল্যাণ্ড

সকাল সাতটায় গাড়ি ছাড়ল। মিনিট দশ পর পৌঁছলাম কারমাটাং-এর টার্টল বীচে, এটা মায়াবন্দরের বনবিভাগের অন্তর্গত। বীচের গায়ে নারকেলের বাগান। কয়েকটি এক-কামরার শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কটেজ, সরকারি অফিসাররা এলে থাকার জন্য। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে ঝুনো নারকেল। একজন কেয়ারটেকারকে অনুরোধ করতেই গোটাদুয়েক নারকেল ছাড়িয়ে দিলেন, খেতে খুব ভালো। মায়াবন্দরের এই সৈকতে আগে নাকি নানা রঙের মাছের ঝাঁক দেখা যেত। সুনামির পর আর তাদের দেখা যায় না। কোরালহীন বালির বীচে হাঁটু জলে নামতে ভালোই লাগল। ঘন্টাআধেক পরে গাড়ি সেই আগের রাস্তা দিয়ে ফিরে হোটেলকে বাঁহাতে রেখে নতুন রাস্তা ধরল নর্থ আন্দামান - দিগলিপুরের উদ্দেশ্যে। ঘন্টা তিনেকের পথ পাড়ি দিয়ে এগারটায় পৌঁছলাম এরিয়াল বে জেটি। এই রাস্তায় ভালো কলা পাওয়া যায়। অনুমতি ও টিকিট যোগাড় করে আমাদের দশজনের দলটা একটা ছোট্ট বোটে উঠলাম। স্বচ্ছ নীল জলে সাদা আলপনা আঁকতে আঁকতে এগিয়ে চললাম রস ও স্মিথ দুই যমজ দ্বীপের দিকে। সমুদ্রের জল যে এত স্বচ্ছ হতে পারে এখানে না এলে তা বোঝা যাবে না। অনেক গভীর জলের নীচেও সূর্যের আলোয় দেখা যাচ্ছে সাদা বালি। বালির ওপর জলতরঙ্গের ছবি দেখার মত। দুই দ্বীপ সাদা বালি দিয়ে যোগ করা। ছোট্ট ছোট্ট নানা রঙের শামুকের খোল মাথায় করে কাঁকড়াগুলো চলে বেড়াচ্ছে, হাত দিলেই চুপ। বালির বাঁধের দু'দিকে একই সমুদ্র কিন্তু দুই রঙ দুই রূপ। এক দিক স্বচ্ছ শান্ত, অন্যদিকে যেন কে নীল রঙ ঢেলে দিয়েছে তেমনি অশান্ত। এই নীল জলে নাইতে নেমে পড়লাম সবাই মিলে। সমুদ্র থেকে উঠে পাড়ে এসে আবার মিষ্টি জলে স্নান। ছোট ছোট পাতার ঘরে জামা কাপড় ছাড়ার সুব্যবস্থা আছে।
২-২০ তে গাড়ি ছাড়ল রঙ্গতের উদ্দেশ্যে। রঙ্গতের বাজারে কাঁকড়ার ঝোল দিয়ে ভাত খেলাম। বড় বড় নারকেল বিক্রি হচ্ছে ৫ টাকা করে, ডাব কিন্তু ২০ টাকা করে। আমার মেয়ের হিসাব মত ১০৫টি সিঁড়ি বেয়ে সন্ধ্যায় দর্শন করলাম মা কালী। আরো মিনিট চল্লিশ যাওয়ার পর হোটেলে পৌঁছলাম।

নর্থ বে

দীনেশ জাহাজের টিকিট হাতে দিয়ে বললেন সকাল সোয়া ছটায় জাহাজ ছাড়বে। ভোরে উঠে গাড়িতে একেবারে জেটির মধ্যে ঢুকে গেলাম। সকালে সূর্যের স্নিগ্ধ আলোয় স্থলযান ছেড়ে জলযানের দিকে পা বাড়ালাম। দীনেশের সঙ্গে আবার দেখা হবে দু'দিন পর পোর্টব্লেয়ারে। জাহাজে ওঠার জন্য লাইনে দাঁড়ালাম। ক্যাপ্টেন নাম ও পরিচয়পত্র পরীক্ষা করে তবেই জাহাজে ওঠার অনুমতি দিচ্ছেন। জাহাজের সিঁড়ি দিয়ে নেমে শীততাপনিয়ন্ত্রিত সংরক্ষিত চেয়ারে বসলাম। উত্তর আন্দামান থেকে পোর্টব্লেয়ার ফিরব জল পথে। এখন যাচ্ছি হ্যাভলক দ্বীপে। জাহাজ চলতে শুরু করলে বসে থাকতে আর ইচ্ছে করল না। উঠে এলাম ছাদে। রঙ্গতের জেটি নীল সাগরের বুকে মিলিয়ে যেতে লাগল। জাহাজের পিছনে তৈরি হচ্ছে দুগ্ধফেননিভ ক্ষণিকের রাস্তা। ক্যাপ্টেনের অনুমতি নিয়ে যেখান থেকে জাহাজ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে সেই কেবিনটা দেখলাম। দেখলাম কিভাবে কম্পাসের সাহায্যে দিগন্তবিহীন জলরাশির মধ্যে দিগভ্রান্ত না হয়ে গন্তব্যের দিকে চলেছে। প্রায় তিন ঘন্টা যাওয়ার পর জাহাজ একটা দ্বীপের কাছে গিয়ে থামলে মাইকে ঘোষণা হল কেউ ছবি তুলবেন না। কিছুক্ষণ পরে একটা নৌকা করে পুলিশ সহ কয়েক জন উপজাতীয় লোক এসে দুই শিশুসহ এক মহিলাকে জাহাজে তুলে দিলেন। সকলেই সভ্য পোশাকে। এরা ওঙ্গি প্রজাতির। জাহাজে এদের বসার জায়গাও আলাদা। জাহাজ আবার চলতে শুরু করল। কৌতুহল চাপতে না পেরে সিঁড়ি বেয়ে ওদের দেখে এলাম। দেখি বাঙলাতে কথা বলছে। এরপর উড়ুক্কু মাছের ঝাঁক দেখতে দেখতে চার ঘন্টার পথ যেন এক পলকে পাড়ি দিলাম। পৌঁছলাম হ্যাভলক - সূর্যোদয়ের দ্বীপে। প্রকৃতি যেন কোরালের কোলাজ করা নীলাম্বরী শাড়ি পড়ে আমাদের করছে আহ্বান।

দীনেশের কথা মত গেটের বাইরে কেশব দাঁড়িয়ে। দুটো ছোট গাড়িতে চেপে পৌঁছলাম রাধাকৃষ্ণ রিসর্টে। নারকেল বাগানের মধ্যে কুঁড়ে ঘর। ভিতরে কিন্তু চেহারা আলাদা। রাস্তা পার হয়ে সিসেল রিসর্টের ভিতর দিয়ে বীচে যাওয়া যায়। গাছের নিচে কাঠের আরামকেদারায় বসে সমুদ্র দেখা - কচি কলাপাতার মত সবুজ কোথাও নীল জলের কোলাজ। সেই জলের ওপর কোথাও একপায়ে কোথাও একসঙ্গে শুয়ে বসে আছে ম্যানগ্রোভ গাছ। যেন সুন্দরীর কপোলে অলক পড়ে রচনা করেছে আলোক-সুন্দর। সন্ধ্যায় হেঁটে ঘুরে এলাম হ্যাভলক বাজার। এখানে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আগত বাঙালিদের বাস।

পরদিন সকালে হ্যাভলক জেটির কাছে একটা বোট ভাড়া করে চললাম এলিফ্যান্টা। এখানে নীল জলে ছোট-বড় নানা নৌকা একটা ক্যালেন্ডারের মত ছবি তৈরি করেছে। কোথাও না গিয়ে এখানে বসেই সময় কেটে যায়। হাতির শুঁড়ের মত একটা পাহাড়কে বাঁ হাতে রেখে পৌঁছলাম এলিফ্যান্টায়। জলের যে এত সুন্দর রঙ হতে পারে এখানে না এলে বোঝা যাবেনা। সুনামিতে উপড়ে যাওয়া শুকনো গাছে লাগছে ঢেউ। জাল ফেললেই উঠে আসছে নানা রকমের ছোটো ছোটো মাছ। এখানে গ্লাসবটম বোট ভাড়া করে আধঘন্টা ধরে দেখলাম জীবন্ত-মৃত নানা রঙের কোরাল। ছোট ছোট রংবেরঙের মাছের ঝাঁক, নাম না-জানা বড় মাছ। এ যেন ঈশ্বরের অ্যাকোয়ারিয়াম। ফেরার সময় জোয়ার এসেছে, তাই বোট চালক ঠিক করে লাইফ জ্যাকেট পড়ে নিতে বললেন সবাইকে। ছোট বোটে বড় ঢেউয়ের তান্ডব ভয় পাবার মতই বটে। জলের ঝাপটায় সবাই কাকভেজা হয়ে গেলাম।

প্রাকৃতিক সেতু - নীল দ্বীপ

চলে এলাম সাদা বালির রাধানগর বীচে। অন্যান্য জায়গার তুলনায় এখানে জনসমাগম ভালোই। স্বচ্ছ জলে সাগর স্নান উপভোগ করার মত। পাড়ে ১০ টাকা দিয়ে মিষ্টি জলে স্নানের ব্যবস্থা আছে। রাধাকৃষ্ণ রিসর্টে মাছ ভাত খেয়ে ফিরে এলাম জেটিতে। কেশবকে বিদায় জানিয়ে উঠে পড়লাম কোস্টাল ক্রুইজে। ছাড়বে সাড়ে তিনটায়। এর ভিতরটা অনেকটা বিমানের মত। একটু দাম বেশি হলেও পাওয়া যায় বিভিন্ন ধরনের খাবার। দু-একটা চেখে দেখাও হল। নীল জলে ফেনার সাদা আলপনা কাটতে কাটতে পাঁচটায় পৌঁছলাম নীল দ্বীপে।

ছোট্ট একটা জেটি, বাইরে এসে ফোন করে এখানকার গাইড হেমন্তকে পাওয়া গেল। উনি বাজারের মধ্যে একটা লজে আমাদের নিয়ে গেলেন। ঘরগুলো বড় হলেও তেমন গোছানো নয়। সন্ধ্যায় বিবেকানন্দ মেলা দেখলাম।

পরদিন সকালে গেলাম ভরতপুর বীচে। পাড়ে বিক্রি হচ্ছে আন্দামান লেখা গেঞ্জি, প্রবাল, মুক্তো ও নানা ধরনের সৌখিন সামগ্রী। এখানকার কোরাল আর রঙিন মাছ নাকি দেখার মত। দাম-দর করে গ্লাসবোট ভাড়া করা হল। এলিফ্যান্টার মতই সব কিছু, তবে ভাঙ্গা লাইট হাউস এর নিচে মাছের যে ঝাঁক দেখলাম সে যেন ঈশ্বরের ঐশ্বর্য। এখান থেকে গেলাম ন্যাচারাল ব্রিজ দেখতে। বড় একটা পাথরের মাঝখানটা ক্ষয়ে গিয়ে ব্রিজের আকার ধারণ করেছে। গাইড আমাদের স্পর্শ করালেন জ্যান্ত কোরাল, হাতে দিয়ে দেখালেন স্টারফিস। আমরা দোষীদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, আমরণ দীপান্তরের কথা শুনেছি, কিন্তু সুন্দর প্রকৃতির বুকে বড় বড় ঝিনুকের আমরণ বন্দীদশা দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। ঝিনুকগুলোর চার ধার পাথরের মত শক্ত হয়ে গেছে। মুখ যখন খুলছে তখন ময়ূরকণ্ঠী নীল রঙের মাংসল অংশ দিনের আলোয় মুক্তোর দানার মত চক চক করছে। গাইড বললেন ওর মধ্যে মুক্তো পাওয়া যায়। এখানে দেখলাম নানা ধরনের কাঁকড়া আর বিভিন্ন ধরনের মাছ যাদের গভীর জলে দেখেছিলাম বিভিন্ন জায়গায়। এখন ওরা ক্ষণিকের বন্দী পাথরের গর্তে। আবার বড়ো ঢেউ এলে মিশে যাবে বৃহতের ঝাঁকে। চারটেয় জাহাজ। আজ ফিরব পোর্টব্লেয়ারে। হেমন্তদা টিকিট দিয়ে আমাদের জাহাজে তুলে দিলেন। উড়ুক্কু মাছ দেখতে দেখতে সূর্য তলিয়ে গেল দিগন্ত রেখায়। সন্ধ্যে ছটায় পৌঁছলাম পোর্টব্লেয়ারে। গেটের বাইরে গাড়ি নিয়ে দীনেশ দাঁড়িয়ে।

মুণ্ডা পাহাড়

পরদিন প্রথমেই দেখলাম ন্যাভাল মেরিন মিউজিয়াম- সামুদ্রিকা। এই মিউজিয়ামের প্রায় সাড়ে তিনশো রকমের জীবিত ও মৃত মাছ আর কোরালের এক অনবদ্য সংগ্রহ এই ক'দিনের গভীর জলে দেখার ক্ষণিক স্মৃতিকে আরও সমৃদ্ধ করে। তারপরে গেলাম চ্যাথাম স মিল - এশিয়ার প্রাচীনতম কাঠের মিল। এককামরার সংগ্রহশালায় কাঠের তৈরি নানান শিল্প সামগ্রী দেখার মত। দুপুর তিনটেয় গাড়ি ছাড়ল মুণ্ডাপাহাড়ের দিকে। এক ঘন্টারও বেশি পথ। রাস্তার দুধারে কাজু বাদামের গাছ। পনেরটি দ্বীপ নিয়ে গড়ে উঠেছে জাতীয় উদ্যান। বিশাল জলাশয়ের গায়ে পাহাড়, তার চূড়ায় দাঁড়িয়ে দেখা সূর্যাস্ত স্মৃতির সরণীতে রেখে দেওয়ার মত।

পরদিন সকালে গাড়ি ছাড়ল সাড়ে ছটায়, যাওয়া হবে জলিবয়। ঘন্টা দেড়েক যাওয়ার পর গাড়ি থামল গান্ধী জাতীয় উদ্যানের বিশাল বটগাছের তলায়। দীনেশ দ্বীপে যাওয়ার অনুমতি পত্র নিয়ে টিকিট কাটতে গেলেন। এখানে প্লাস্টিক সামগ্রী নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ। পানীয় জল নেওয়ার জন্যও ফ্লাস্ক ভাড়া করতে হয়। ব্যাগ ভালো ভাবে চেক করে লঞ্চে উঠতে দেওয়া হচ্ছে। পঁচিশ-তিরিশ জনকে নিয়ে লঞ্চ ছাড়ল। দু'পাশে ঘন সবুজ জঙ্গল আর নীল জলের ওপর দিয়ে লঞ্চ ধীরে ধীরে চলল। চল্লিশ মিনিটের যাত্রাপথে অনেক ছোট ছোট দ্বীপ পড়ে। এই অঞ্চলে বঙ্গোপসাগরের বুকে প্রায় ৫৭২ টির মত দ্বীপ আছে। তার মধ্যে ১৩০টিতে মানুষের যাতায়াত আছে এবং মাত্র ৩৬ টিতে গড়ে উঠেছে জনবসতি। এই জলিবয়ও এই রকমই একটা দ্বীপ যাতে কোনও বসতি নেই। পর্যটকরা যান শুধু তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে উপভোগ করতে। জলের এত বর্ণময় রূপ হতে পারে নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। যেন ঈশ্বর রঙের পাত্রে বিভিন্নরকমের নীল নিয়ে বসেছেন ছবি আঁকতে। আর জলের নিচে বিভিন্ন রঙের কোরাল, স্টার ফিস, সী কিউকাম্বার - সারিবদ্ধ ঝাঁক ঝাঁক মাছ। গ্লাস বটম বোটে করে মাছ- কোরাল দেখছি, এমন সময় গায়ে কালো-হলুদে ডোরাকাটা এক ঝাঁক টাইগার ফিস জলকে হলুদ করে আবার মিলিয়ে গেল। যেন এক পলকের পুলক জাগিয়ে পালিয়ে গেল অতল জলে। এখানে নিখরচায় স্নর্কেলিং করা যায়। কিন্তু কোনো মিষ্টি জলে স্নানের ব্যবস্থা নেই। সাদা বালির ওপর পড়ে আছে অজস্র কড়ি-ছোট শঙ্খ।

জলিবয় দ্বীপ

ফিরে যখন এলাম বেলা দুটো বেজে গেছে। হোটেলে খেলাম মাছের টক দিয়ে ভাত। পাশের ছোট্ট দোকানে পাওয়া যাচ্ছে আন্দামানবাসীদের হস্তশিল্পের নমুনা নানা সৌখিন সামগ্রী। নারকেল খোলের কাপ দেখার মত। এখান থেকে গেলাম ওয়াণ্ডুর - দিনমণির দহনে এই বীচ নির্জন। গাছের ছায়ায় বিক্রি হচ্ছে ডাব। বেশিক্ষণ না থেকে চলে এলাম মংলুটন রাবার প্ল্যান্টেশনে। রাস্তার এক দিকে রাবার গাছের বাগান ও নীল বাক্সে মৌমাছির চাষ। অন্য দিকে নানা মশলা ও ওষধি গাছ। খাবার পাতে যাদের স্বাদ পাই, গাছে তাদের দেখতে পেয়ে ভালোই লাগলো। পাশে দুধ-সাদা তরল থেকে তৈরি হচ্ছে রাবারের চাদর। কয়েক জন মহিলা সুপারি ছাড়াতে ব্যস্ত। অফিসের শোরুম থেকে পাওয়া যায় মশলা, টাটকা মধু। এবার সকলের অনুরোধে দীনেশ নিয়ে চললেন মার্কেটিং-এ।

শেষ দিনে আমরা যাব তিন দ্বীপ। অশান্ত সমুদ্রে লঞ্চ ছাড়ল সাড়ে ন'টায়। প্রথমে গেলাম ভাইপার - এখানে বন্দীদের আমরণ দীপান্তর, ফাঁসি দেওয়া হত। মিনিট পনেরো থাকার পর এলাম রস আইল্যান্ডে। ইংরেজদের বিলাসিতায় পূর্ণ, বর্তমানে বসতিহীন এই দ্বীপে চার্চ, মুক্ত চিড়িয়াখানা দেখার মত। শেষ গন্তব্য নর্থ-বে দ্বীপ। কোরালে ভরা পাথুরে বীচে জল-ক্রীড়ার সমস্ত সামগ্রী বর্তমান। পাহাড়ের টিলায় আছে লাইট হাউস। ফেরার পথে প্রচণ্ড দোলা খেতে খেতে মনও দুলে উঠছিল আন্দামানকে ছেড়ে যাওয়ার দুঃখে। মনে মনে বলি, আবার ফিরে আসব।

ভরতপুর সৈকত - নীল দ্বীপ

~ আন্দামানের তথ্য ~ আন্দামানের আরও ছবি ~

রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় বিদ্যা মন্দিরে গণিতে স্নাতক পাঠক্রমের সময় সত্যব্রত মহারাজের হাত ধরে ঘরের বাইরে যাওয়া শুরু হয় দেবপ্রসাদ মজুমদারের। IIEST, Shibpur, এর Ph.D. গাইড সেই নেশায় আরও উৎসাহ দেন। বর্তমানে ভ্রমণ নিয়ে লেখার নেশায় মেতে উঠেছেন। 'আমাদের ছুটি' ভ্রমণ পত্রিকার হাত ধরে পূরণ হল সেই ইচ্ছে। এটিই তাঁর প্রথম প্রকাশিত লেখা।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

= 'আমাদের ছুটি' বাংলা আন্তর্জাল ভ্রমণপত্রিকায় আপনাকে স্বাগত জানাই = আপনার বেড়ানোর ছবি-লেখা পাঠানোর আমন্ত্রণ রইল

অন্নপূর্ণার চরণতলে

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

~ ~ অন্নপূর্ণা বেসক্যাম্প ট্রেক রুট ম্যাপ ~ অন্নপূর্ণা বেসক্যাম্প ট্রেকের আরও ছবি ~

"ভিক্ষাম দেহি কৃপাবলম্বণকারী
মাতান্নপূর্ণেশ্বরী"

"পরিকল্পনা"

"অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্প? পাগল নাকি? অসম্ভব!" এটাই ছিল আমার প্রথম রি-অ্যাকশান যেদিন নীলাদ্রি প্রস্তাব পেশ করল জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ফোর্থ ফ্লোরে আমাদের রুমে। আমাদের মানে, আমার, সুদীপ আর নীলাদ্রি-র অফিসের বসার ঘরে। মনটা খুব খারাপ ছিল সবারই। "হিমালয়ান সুনামি"-তে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল উত্তরাখণ্ড, আর তার সঙ্গে আমাদের ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স ট্রেক-এর সব পরিকল্পনা। টিকিট শেষ মুহূর্তে ক্যান্সেল করে মনখারাপ সঙ্গে নিয়ে গালে হাত দিয়ে ভাবছিলাম কোথায় যাওয়া যায় তখনই নীলাদ্রি বলে উঠল এবিসি যাওয়ার কথাটা। সেরকম বড় কোনও ট্রেক এর অভিজ্ঞতা আমার ছিল না, তাই শুনেই এক কথায় নাকচ করে দিয়েছিলাম। সুদীপও কিন্তু ওর কথায় নেচে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগ করল আমাদের ট্রেক ক্লাব "পদাতিক" এর চতুর্থ সদস্য সৌনীপ এর সঙ্গে। আমি জানতাম ও রাজি হবেই। হলও তাই। অগত্যা এক যাত্রায় পৃথক ফল না করে শুরু হল "মিশন এবিসি" -এর রিসার্চ। বেশ কয়েকদিনের ইন্টারনেট সার্ফিং এবং অন্যান্য খোঁজ খবর করার পর কাটা হল টিকিট। জোগাড় হল জুতসই ঠাণ্ডা প্রতিরোধী জ্যাকেট, স্লিপিং ব্যাগ, খাবার দাবার আর অদম্য ইচ্ছে।

"যাত্রা শুরু"

২৩ নভেম্বর ২০১৩, অনেক দিনের অপেক্ষার পর এসে গেল সেই দিন। স্বপ্নপূরণের যাত্রা শুরু মিথিলা এক্সপ্রেসের স্লিপার ক্লাসে। আমরা চারজন - সুদীপ, নিলাদ্রি, সৌনীপ আর আমি - ট্রেক ক্লাব "পদাতিক"-এর চারমূর্তি। ট্রেন যথারীতি সুনাম বজায় রেখে মাত্র পনেরো মিনিট লেট করে পরদিন সকাল সোয়া ন'টা নাগাদ পৌঁছে দিল রক্সৌলে। পিঠের ভারি রুকস্যাক সামলে পৌঁছালাম টাঙ্গা স্ট্যান্ডে। তারপর ধুলোর ঝড়ে স্নান করে আর কোমরের ব্যাথায় হাত বোলাতে বোলাতে নেপাল বর্ডার পেরিয়ে বীরগঞ্জ। ১০০ ভারতীয় টাকায় ১৬০ নেপালি টাকা পেয়ে সব ফান্ডের টাকা কোথায় রাখি ভাবতে ভাবতে ঘুম উড়ে গেল। সুদীপ আর নীলাদ্রি ততক্ষণে হ্রদের শহর পোখরা যাবার গাড়ি ঠিক করে ফেলেছে।

"হ্রদের শহর পোখরা"

আট ঘন্টার বিশাল জার্নি শেষ করে যখন "হোটেল নিউ উইন্ডস"-এ পৌঁছনো গেল তখন বাজে প্রায় সাতটা। ঠাণ্ডা বেশ, তবে যতটা ভেবেছিলাম ততটা নয়, ১২-১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস হবে। হোটেল রুমে মিনিটখানেক বিশ্রামের পরই বেরোন হল ওখানকার সিমকার্ড জোগাড় করার জন্য, নাহলে বাড়িতে যোগাযোগ করা যাচ্ছিল না। রাতের খাবার অর্ডার দিয়ে সিমকার্ড নিয়ে আর চারপাশের রাস্তায় হাল্কা পায়চারি করে রুমে ফিরলাম সকলে। ট্রেনে ভাল ঘুম হয়নি। পরের দিনটায় আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া (আক্লেমেটাইজেশন) আর গাইড ঠিক করার প্ল্যান নিয়ে ক্লান্ত শরীরকে আর কষ্ট না দিয়ে লেপের তলায় সেঁধিয়ে গেলাম সবাই।

পরদিন ভোর ভোর আমি আর নীলাদ্রি বেরোলাম পোখরার বিখ্যাত ফেওয়া লেক দর্শনে। হাল্কা মর্নিং ওয়াক সেরে হোটেলে ফিরতেই বাকিদের গালাগালি শুনতে হল, কেন ওদের ডাকিনি। ব্রেকফাস্টের বেরোন হল গাইডের সন্ধানে। সুদীপ ওদের শ্রীরামপুরের এক ক্লাবের দাদার কাছ থেকে এনেছিল 'দেবী ভান্ডারী' বলে এক ভদ্রলোকের ঠিকানা। তাকে খুঁজে বের করতে বেশি পরিশ্রম করতে হলনা। উনি পরিচয় করিয়ে দিলেন আমাদের ভ্রমণসঙ্গী, গাইড এবং পোর্টার রাজেন্দ্র রাই-এর সঙ্গে। আমাদের থেকে কয়েক বছরের মাত্র বড়, ছ'ফুট এর কাছাকাছি লম্বা নেপালি ভদ্রলোক প্রথম দর্শনেই বললেন "আরে ইয়ার আচ্ছি জমেগি হামারি"। পরদিন সকালে ট্রেকিং পারমিট এবং গাড়ি নিয়ে পৌঁছে যাবার কথা দিয়ে আর আমাদের বয়ে নিয়ে যাওয়া একগাদা খাবার-দাবার

বইবার জন্য একটা রুকস্যাক এর ব্যবস্থা করে ভান্ডারী আমাদের বিদায় দিলেন। বাকি দিনটা আমরা ফেওয়ার চারদিকে ঘুরে, ছবি তুলে, মার্কেটে বিদেশিনি দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, টাকাপয়সার হিসেব কষে (আমিই ছিলাম ক্যাশিয়ার তাই সব সময় ট্যাঁকে করে আলাদা পয়সার ব্যাগ ক্যারি করতে হচ্ছিল), স্যাক গুছিয়ে আর টোয়েন্টি নাইন খেলে কাটিয়ে দিলাম।
সকাল সাতটায় গাড়ি এসে হাজির। আমরাও স্যাক গুছিয়ে রেডি। বেরোনোর আগে দেখা করতে গেলাম 'দেবী'র সঙ্গে। 'বেস্ট অফ লাক' আর 'সেফ জার্নি' উইশ করে উনি বললেন "ইউ গাইস ডোন্ট ওয়াক অ্যান্ড টেক পিকচারস সাইমালটেনিয়াসলি। মেক এ স্টপ, দেন টেক দি স্ন্যাপ অ্যান্ড ওয়াক এগেইন; বি কেয়ারফুল অ্যান্ড ডোন্ট প্লে উইথ 'হিমাল' (নেপালিরা হিমালয়ের পাহাড় কে হিমাল বলে)"। আমাদের আর অপেক্ষা সইছিল না। স্যাকগুলো গাড়ির ছাদে বাঁধা শেষ হতেই আমরা উঠে পড়লাম আর নীলাদ্রি চেঁচিয়ে উঠল - "বন্ধুগণ যাত্রা শুরু"।

"ফার্স্ট-ডে ফার্স্ট শো"

পোখরা থেকে এসে পৌঁছলাম নয়াপুল। এবার শুরু হবে স্যাক কাঁধে হাঁটা। আগামী সাতদিনের জন্য শুধু পা'ই ভরসা। মিনিট দশ হাঁটার পর চেকপয়েন্ট পড়ল। এখানে পারমিটে স্ট্যাম্প মেরে দিল। আধঘন্টা আরও হাঁটার পর পৌঁছলাম বীরেথান্টি। এখানে "এসিএপি" পারমিট রেজিস্টার করা হল। বীরেথান্টি হচ্ছে সেই জায়গা যেখান থেকে অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্প যাওয়ার দুটো রাস্তা ভাগ হয়ে গেছে। বিদেশি ট্রেকারদের পছন্দ পুনহিল-ঘোরেপানি-তাতোপানি হয়ে যাওয়া, যেটার আরেক নাম অন্নপূর্ণা সার্কিট ট্রেক। পুনহিলে একটা ওয়াচটাওয়ার আছে, যেখান থেকে সূর্যোদয়ের অপূর্ব দৃশ্য দেখা যায় এবং পরপর অন্নপূর্ণার চারটি (মেইন, সাউথ, ১ ও ২) এবং মচ্ছপুচ্ছারে, ধৌলগিরি, হিউনচুলি হিমালয়ের এইসব বিখ্যাত শৃঙ্গগুলি একসঙ্গে দেখা যায়। আমাদের হাতে সময় কম। তাই ইচ্ছে থাকলেও উপায় না থাকায় সর্টকার্ট নিতে হল সোজা ঘান্দ্রুক-এর দিকে। পরে জানতে পারলাম ঘান্দ্রুক অবধি বাস বা শেয়ার জিপে যেতে পারতাম। দুপুর দেড়টা নাগাদ পৌঁছনো গেল অর্ধেক রাস্তা এবং লাঞ্চ ব্রেকের জায়গা সয়ূলিবাজারে।

গোটা ট্রেকের সবচেয়ে বাজে ভেজ মোমো আর ভেজ রাইস খেয়ে যখন অবস্থা বেশ সঙ্গীন, ঠিক তক্ষুনি রাজ বলে উঠল - "আরে ভাই চলো চলো, কিতনা বইঠোগে। সামনে সিঁড়ি হ্যায়, উসসে চলেঙ্গে তো দেড় ঘন্টা কম সময় লাগেগা"। তখন কে জানত সিঁড়ি ওঠা সেই শুরু! নামেমাত্রই সিঁড়ি, আসলে কাটা পাথরের ধাপ। কোনোটার হাইট এক ফুট তো কোনোটার দু ফুট হবে, কোনও সামঞ্জস্য নেই। পিঠে স্যাক, সামনে একটা ছোট ল্যাপস্যাক আর কাঁধ থেকে ঝোলা নোটবুক, পেন, ওষুধ আর টাকা সম্বলিত ছোট আরেকটা ব্যাগ নিয়ে ওই সিঁড়ি উঠতে উঠতে মনে হচ্ছিল কেন এলাম! এক এক সময় ওই ধাপগুলোও একজিস্ট করছিল না, আর সেখানে ঢাল প্রায় ৭৫-৮০ ডিগ্রি, রীতিমত ক্লাইম্ব করতে হচ্ছিল আমাকে কারণ আমার হাইট মাত্র পাঁচ ফুট। বাকীরাও ক্লান্ত। রাজ যেন দৌড়চ্ছে। যখনই দেখা হচ্ছে, খালি বলে "আরে ইয়ার, ভাগো ভাগো, কিতনা স্লো চলতে হো আপলোগ"। "রাজ ভাইয়া আউর কিতনা"? "আরে ও জো লাল পেড় দিখ রাহা হো না, উসকে পিছে হে ঘান্দ্রুক"। আমরা যতই হাঁটি, লাল পেড়-এর কাছে আর পৌঁছতে পারি না। আমায় নীলাদ্রি জিজ্ঞেস করল - "ভাই আর কদ্দুর"? বললাম- "হুই যে লি লি করতিসে" (যারা নারায়ণ দেবনাথের নন্টে-ফন্টে পড়েছেন তারা আশাকরি বুঝলেন)। চারজনে একসঙ্গে হেসে উঠলাম। প্রায় ৫০০০ সিঁড়ি ভেঙ্গে সেই লাল পেড় এর কাছে পৌঁছনোর আরও ৪৫ মিনিট পর, প্রায় অন্ধকারের মধ্যে, ৫.১৫ নাগাদ আমরা পৌঁছলাম নাইট-স্টে "মেশ্রাম গেস্ট হাউস"-এ, একেবারে ক্লান্ত, বিধ্বস্ত অবস্থায়। ডিনারে স্যুপ খেয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। ঠান্ডা খুব, প্রায় ২-৩ ডিগ্রি এর কাছাকাছি। স্লিপিং ব্যাগ এর ওপর লেপ চাপা দিয়েও ঠান্ডা কাটছিল না। কিছুতেই ঘুম আসছে না। হাঁটুতে অসহ্য ব্যথা। ভলিনি স্প্রে লাগালাম, পেন কিলার হিসেবে একটা প্যারাসিটামলও খেতে হল। কী করে বাড়ি ফিরব? এইতো সবে প্রথম দিন? নিজেকে বোঝাতে লাগলাম, আমার জন্য এই ট্রেক পণ্ড হতে দেব না। আই ক্যান ডু ইট। ওষুধ বোধহয় কাজ করতে শুরু করেছিল। ঘুমিয়ে পড়লাম।

"চড়াই-উতরাই"

ভোরবেলা অ্যালার্ম বাজলো পাঁচটায়। সূর্যোদয়ের মুহূর্তটা মিস করার কোন ইচ্ছে ছিল না। টেম্পারেচার মাইনাসে না হলেও জিরোর কাছেই। আস্তে আস্তে আলোর ছোঁয়া লাগল দূরের অন্নপূর্ণা সাউথ শৃঙ্গে তারপর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা ভার্জিন পিক মচ্ছপুচ্ছারেতে। সেই মায়াবি গোলাপি আলো ধীরে ধীরে বদলে গেল সোনালিতে। আমরা ফ্রেশ হয়ে চা, বিস্কুট আর ডিমসেদ্ধ খেয়ে রেডি হয়ে পড়লাম দ্বিতীয় দিনের চলার জন্য। দিনের শুরুতেই একটা জরুরি শিক্ষা পাওয়া গেলো বিল মেটাতে গিয়ে। ওখানকার সব হোটেলেরই নিয়ম, যেখানে থাকবে সেখানকারই খাবার খেতে হবে, (মোট বিল কম করে যেন ৩০০০ নেপালি টাকা হয়) নাহলে গাইড খেতে পাবে না, শুতেও পাবে না আর ঘরভাড়াও দু-তিন গুণ বেশি দিতে হবে। আমরা নিজেদের আনা খাবার খেয়েছিলাম না জেনেই, তার বদলে বাড়তি ভাড়া দিতেই হল শেষমেশ।

কাল আটটায় হাঁটা শুরু হল। প্রথমে জঙ্গলে ঘেরা অত্যন্ত ভেজা ভেজা পিচ্ছিল মাটি-পাথরে মেশানো পথ দিয়ে (পথ না বলে অণুপথ বললে ঠিক হবে) প্রায় ১৫০০ মিটার নামা। গন্তব্য কিমরংখোলা। প্রত্যেকেই একবার না একবার পা হড়কালাম। এত তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে হাঁটু কাঁপতে লাগল। রাজ বলতে লাগল-"পতা হে, ইস জঙ্গল মে আত্মা হে, ভূত হে, রাত কো উও লোগ নাম লেকে বুলাতা হে, আউর জো লোগ গয়া উও ওয়াপস নাহি আয়া"। ওর কথা শুনে হাসলেও শুনসান জঙ্গলে পাতা পড়ার শব্দে একটু মনটা অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। কিমরং খোলাতে ('খোলা' মানে নেপালিতে নদী) জল বেশি নেই। বড় বড় বোল্ডার আর গুঁড়ো সাদা বালি। জলের ওপর কাঠের পুল। নদী পেরিয়ে আবার শুরু হল চড়াই। কিছুটা উঠেই লাঞ্চ ব্রেকে থামলাম সবুজ লনের ওপর রঙিন ছাতা আর টেবিল-চেয়ার পাতা একটা ছোট্ট মনোরম রেস্টুরেন্টে। জায়গাটার নাম কিমরংদাড়া। ছবি তোলা হল বেশ কিছু। স্যাকটা নামানোয় কাঁধগুলো প্রাণ ভরে আশীর্বাদ দিল। লেমন জুস খেয়ে চাঙ্গা হলাম। লাঞ্চে গরম ভেজ চাউমিন। কিছুক্ষণ বসার পরই রাজ তাড়া দিতে লাগল। আমাদের নাইট-স্টে ছোমরং-এ। আমার হাঁটু কান্নাকাটি শুরু করল একটু পরেই। অনেক 'সিঁড়ি' ভেঙ্গে ক্লান্ত হয়ে রাজকে বলতেই হল থামার জন্য। একপ্রস্থ চকোলেট আর জল খেয়ে আবার হাঁটা শুরু। বিকেল গড়িয়ে সূর্য যখন বিদায় নিচ্ছে মচ্ছপুচ্ছারের পিছনে, আমরা হোটেলে পৌঁছলাম। আর এনার্জি ছিল না। গরম জলে স্নান করে একটু ফ্রেশ লাগল। ডিনার হলে খেতে খেতে আগামী কয়েকদিনের জন্য শেষবারের মত ফ্রি-তে মোবাইল আর ক্যামেরার ব্যাটারি চার্জ করে নিলাম সবাই। শুয়ে পড়ার আগে রাজ এল। বলল, খুব ঠাণ্ডা লেগেছে। ওকে ওষুধ দিতে হল। ঠিক হল আমরা আর খাবার-দাবার বেশি বইব না। লাগেজ কমাতে হবে, এরপর রাস্তা বেশ কঠিন এবং রিস্কি। সোয়েটার, জ্যাকেট, স্লিপিং ব্যাগ, টাকাপয়সা, ওষুধ আর সামান্য দরকারি কিছু জিনিস ছাড়া সবই হোটেলে রেখে যাওয়ার জন্য প্যাক করে ঘুমিয়ে পড়লাম।

"আর সিঁড়ি নেই - মিষ্টি গ্রাম ছোমরং"

ভোরবেলা সৌনীপ সবার আগে বাইরে বেরিয়ে আবার ফিরে এসে ঝপ করে ক্যামেরাটা বগলদাবা করে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল - "কুঁড়েমি না করে বাইরে আয়, এ জিনিস বারবার দেখতে পাবি না"। জ্যাকেটটা চাপিয়ে বাইরে বেরোতে দেখলাম সত্যি-ই। ঘান্দ্রুক-এ যেমন দেখেছিলাম এখানে মচ্ছপুচ্ছারে তার চেয়ে আরও আকর্ষণীয়, আরও জীবন্ত, আরও মায়াবী। এ দৃশ্য দেখার জন্য কষ্ট করাই যায়।
ব্রেকফাস্ট সেরে আমাদের এক্সট্রা লাগেজ হোটেল মালিকের জিম্মায় দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমাদের আগামী গন্তব্য 'দেওরালি'র উদ্দেশ্যে। তখনও জানতাম না সামনে কি অপেক্ষা করে আছে। বেরিয়ে পরেছিলাম সকাল সাতটায়। দেওরালি-র হাইট ৩০০০ মিটার মত। আমরা ছিলাম ২০০০ মিটারের আশেপাশে। এই ১০০০ মিটার চড়াইয়ে পেরোতে হবে অনেকগুলো গ্রাম। প্রথম কিছুক্ষণ কয়েক হাজার সিঁড়ি নামা আর ওঠা। তারপর হাল্কা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সমতল রাস্তা পেরিয়ে লোয়ার সিনুয়া। আবার সিঁড়ি দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেলো। যদিও রাজ বলেছিল আর নাকি সিঁড়ি নেই। সরু রাস্তায় একপাল খচ্চর-কে পাশ কাটাতে গিয়ে বুঝলাম কেন বাঙালিরা ওদের জাতটাকে গালাগালি হিসেবে ব্যবহার করে। রুকস্যাকটা একটার গায়ে ঠেকেছিল। অমনি ব্যাটা পিছনের পা দিয়ে দিলে লাথি কষিয়ে। পিঠে স্যাক থাকায় জোর বাঁচলাম, লাগেনি। আপার সিনুয়ায় পৌঁছে আবার লেমন জুস খাওয়া হল। এই জিনিসটা আমরা সব জায়গায় পাচ্ছিলাম। আর খেয়েও নিচ্ছিলাম কারণ খুব এনার্জি দিচ্ছিল।

আরও প্রায় ঘন্টাখানেক হাঁটার পর পৌঁছলাম "বাম্বু"-তে। কয়েকটা হোটেল আর বাড়ি নিয়ে ঘেরা ছোট্ট জনপদ। জঙ্গলের ভিতর আর মানব সভ্যতার নাগালের বাইরে চলে যাওয়ার প্রবেশদ্বার। আমাদের চারজনের দলটা দুটো ছোট দলে ভেঙে গেছিল আমারই জন্য। পায়ের অসহ্য ব্যথার জন্য জোরে হাঁটতে পারছিলাম না। তাই সুদীপ আর নীলাদ্রি এগিয়ে যাচ্ছিল রাজ-এর সাথে তাল মিলিয়ে। আমি আর সৌনীপ ছিলাম পিছনে। বাম্বু থেকেও ওরাই আগে রওনা দিল। আমরাও মিনিট পনেরো বসে আবার চলতে শুরু করলাম। অত্যন্ত ঘন বাঁশ এবং অন্যান্য পাহাড়ি গাছে ভরা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে মনে হচ্ছিল এই পৃথিবীতে সত্যিই আমরা দুজন একা আর কেউ নেই। আধঘন্টা হেঁটেও কাউকে দেখতে পেলাম না। কারণ বেশীরভাগ ট্রেকারই বাম্বুতে থেকে গেছিল। আর যারা আর এগোবে ঠিক করেছে তারাও অনেক আগেই বেরিয়ে পড়েছে। আমরা দম নেওয়ার জন্য থামছিলাম মাঝে মাঝে। ছবি তোলার সঙ্গে সঙ্গে চকোলেট আর জল খাওয়া চলছিল আর মোবাইলে "অন্নপূর্ণাস্তোত্রম" বাজাচ্ছিল সৌনীপ। হঠাৎ করে দেখলাম হন্তদন্ত হয়ে ফিরে আসছে নিলাদ্রি। আমাদের দেখে ও যেন প্রাণ ফিরে পেল। জল খেয়ে বলল - "রাজ আর সুদীপ তো দৌড়চ্ছে। আমি একটু আস্তে আস্তে পিছিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ দেখি রাস্তা দুটো ভাগ হয়ে গেছে। কোনটা ধরব না বুঝে রাজকে ফোন করতে ও বলল যে তুমি ভুল রাস্তায় এসেছ। এখন তুমি ফিরে যাও আর বাকিদের জন্য ওয়েট কর। ফিরেই আসছিলাম। হঠাৎ আট-দশটা পাহাড়ি বাঁদর গাছের ডাল থেকে নেমে ঘিরে ধরেছিল। কোনমতে পালিয়ে এসেছি।" তিনজনে এবার একসঙ্গে হাঁটতে লাগলাম। রাস্তা চিনতেও অসুবিধে হল না।
২.৩০ নাগাদ পৌঁছলাম দোভান। লাঞ্চ করলাম 'স্মোকি' ভেজ ফ্রায়েড রাইস দিয়ে। রাজ তাড়া দিতে লাগল - "ক্যা ইয়ার, জলদি করো। আভি বহুত চলনা হে। মারো মারো, খিঁচো খিঁচো, ভাগো ভাগো"। এটা ছিল ওর পেটেন্ট ডায়লগ, যেটা আমরা গোটা ট্রেক-এ অগুন্তি বার শুনেছি। মেঘ

করে আসছিল। আমাদের ক্লান্তিও ছিল খুব।

"হিমালয়ায় হাড়-হিম"

দেওরালি যে পৌঁছতে পারবনা সেটা বুঝতেই পারছিলাম, কিন্তু রাজের সঙ্গে সুদীপও একমত। ৪০-৪৫ মিনিট হাঁটার পরেই আকাশ একেবারে কালো করে এল। মুখে-চোখে অনুভব করতে লাগলাম ঝিরঝিরে কুয়াশা মাখা বৃষ্টি। ঠাণ্ডাও বাড়ছে। পা আর চলছে না। অতিকষ্টে মনের সমস্ত জোর লাগিয়ে যখন "হিমালয়া" পৌঁছলাম অন্ধকার আর গাঢ় কুয়াশায় ঢেকে গেছে চারদিক। দৃশ্যমানতা একেবারে নেই বললেই চলে। একটাই রুম পাওয়া গেলো চারজনের জন্য। প্রচণ্ড ক্লান্তিতেও বাইরের শেড দেওয়া খাওয়ার টেবিলে বসে চা খেতে খেতে গল্প হতে লাগল এক জার্মান ভদ্রলোকের সাথে। নামটা জিজ্ঞেস করা হয়নি, তবে ব্রাউন রঙের লম্বা দাড়ির জন্য আমি নাম দিয়েছিলাম 'গুটেনবার্গ'। এখানে এসে বোঝা গেল রাজবাবুর ফিটনেসের কারণ, বেশ ভাল জাতের "ভোলে বাবার প্রসাদ"-অর্থাৎ গাঁজা। গুটেনবার্গ মহাশয়ও ওই জিনিসের সিগারেট বানিয়ে অক্লেশে ওর দলে ভিড়ে গেলেন। একটু পরেই ডিনার করে শুয়ে পড়লাম। গল্প করতে করতে আওয়াজের ডেসিবেলটা বোধহয় বেড়ে গিয়েছিল। পাশের রুম থেকে গুটেনবার্গ আওয়াজ দিল "জেন্টলমেন লেটস কল ইট আ নাইট, গুড নাইট"। আমরাও লজ্জায় চুপ মেরে নিজেদের স্লিপিং ব্যাগের চেন টেনে কম্বল মুড়ি দিলাম। সেই রাতটা তখনও পর্যন্ত সবচেয়ে কনকনে ঠাণ্ডার রাত ছিল। কাঁচের জানলায় জমে ওঠা বাষ্পের ওপর ডিনার হলের ফিকে সাদা আলোটা প্রতিফলিত হচ্ছিল। অন্ধকার যেন প্রেতের মত ওঁত পেতে বসে আছে। যেটুকু চোখ ফাঁক করে দেখতে পাচ্ছিলাম, তাতে পাশ ফিরে কম্বল মুড়ি দেওয়াটাই শান্তির মনে হল।

"স্বপ্নপূরণ"

২৯ নভেম্বর ২০১৩, সেই স্বপ্নকে কাছে পাওয়ার দিন। সকাল ৬.৩০-য় ট্রেক শুরু হল হাল্কা ব্রেকফাস্টের পর। আজকের গন্তব্য "অ্যামেজিং অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্প"। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে শুরু হল পথচলা। আস্তে আস্তে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিট হাঁটার পর পৌঁছলাম "হিঙ্কো" গুহায়। এটি একটি প্রাকৃতিক গুহা পর্যটকদের বিশ্রাম করার জন্য।

এর পরেই ভীষণ বিপদজনক এক ঝরনার গভীর খাত পেরোতে হল ঝুরঝুরে মাটি-পাথর মেশানো প্রায় ৮০০ ঢাল বেয়ে নড়বড়ে কাঠের সেতু দিয়ে। উচ্চতা বাড়ার সাথে সাথে পরিবর্তন হচ্ছে ট্রি-লাইন এর। হাজার বছরের পুরনো আদিম গাছের জায়গা নিচ্ছে শুকনো গুল্ম আর ফিকে হলুদ বুনো ঘাস। আকাশ নীল। সামনে ডান দিকে দেখা যাচ্ছে গর্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা মচ্ছপুচ্ছারে। দূরে হাতছানি দিচ্ছে দুই বোন অন্নপূর্ণা-১ আর গঙ্গাপূর্ণা। মোদীখোলার খাত ধরে হেঁটে চলেছি আমরা।

দেওরালি পৌঁছে সভ্যতার সঙ্গে যোগাযোগ শেষ হল। এখানেই শেষ নমস্তে টেলিকম-এর নেটওয়ার্ক ধরে। এরপর শুধুই স্যাটেলাইট ফোন। আরও ঘন্টাখানেক ওই পাথুরে অববাহিকা ধরে চলার পর ১২.১৫ নাগাদ পৌঁছলাম "মচ্ছপুচ্ছারে বেস ক্যাম্প"-এ।

এখানে এসে মনে হচ্ছিল মচ্ছপুচ্ছারে কত কাছে। একে আমরা সেই পোখরা থেকে অনুসরণ করে আসছি। এই সেই পিক যেখানে কেউ কোনদিন চড়াই করার সাহস দেখায়নি। অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, এই পাহাড় শৃঙ্গের কোন চড়াই অভিযান না হলেও এর বেস ক্যাম্প আছে। "আজকেই আমাদের অন্নপূর্ণা বেসক্যাম্প গিয়ে ফিরে আসতে হবে"। সুদীপ বলল। "ওখানে কাল রাতে -১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছিল, আমরা থাকতে পারব না। এফেক্টিভ টেম্পারেচার আরও কম হবে"।

"সৌনীপের ভাষায় - অন্নপূর্ণার অ্যাম্ফিথিয়েটারে"

লাঞ্চ করে দুপুর ১.১০-এ বেরনো হল সেই জায়গার উদ্দেশ্যে, যার জন্য এত কষ্টস্বীকার। এখানেই করলাম সেই মারাত্মক ভুল যার খেসারত আমার প্রাণ দিয়েও দিতে হতে পারতো। এমবিসি থেকে বেরনোর ১৫ মিনিটের মধ্যেই দিগন্ত জুড়ে দেখা দিল অন্নপূর্ণা দক্ষিণ শৃঙ্গের উত্তর দিকটা। আর পিছনের দিকে মচ্ছপুচ্ছারে আর বারাসিঙ্গা। অন্নপূর্ণা সাউথ শৃঙ্গজয়ের দিক থেকে এভারেস্টের থেকেও বিপদজনক। ৮০০০ মিটারের বেশি উচ্চতার শৃঙ্গের মধ্যে সারা পৃথিবীতে এর স্থান দশম, কিন্তু শীর্ষে আরোহণের দিক দিয়ে এর মৃত্যুহার সবথেকে বেশি (৩৮%, এভারেস্টের চেয়ে প্রায় ৮ গুণ বেশি)। এই ভয়ঙ্কর সুন্দর মাতৃরূপের দিকে মুগ্ধ হয়ে পুতুলের মত আকর্ষিত হয়ে এগিয়ে চললাম। সৌনীপ এই ট্রেকটা নিয়ে সবচেয়ে উত্তেজিত ছিল। ও সবার আগে প্রায়

দৌড়ে পৌঁছানোর চেষ্টা করছিল ওর স্বপ্নের কাছে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। ওর সবচেয়ে কাছে ছিল সুদীপ। "আমার খুব ঘুম পাচ্ছে" সৌনীপের এই কথা শুনে আমাদের বুঝতে বাকি রইল না এই ৪০০০ মিটার উচ্চতায় ওর অক্সিজেনের অভাব হয়ে হাই অল্টিটিউড সিকনেসের দিকে ব্যাপারটা এগোচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ওকে ডেরিফাইলিন ট্যাবলেট আর বমি ভাব কমার ওষুধ অনডেম খাইয়ে দিলাম। একটা পাথরে হেলান দিয়ে বসে আর একটু জল খেয়ে ও আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে গেল মিনিট পনেরোর মধ্যে। বিকেল ৩.৩০ নাগাদ আমরা পৌঁছালাম দেবী "অন্নপূর্ণার প্রাঙ্গণতলে"। চারিদিকে তিনশো ষাট ডিগ্রি ঘিরে একের পর এক নামকরা ৭০০০-৮০০০ মিটারের শৃঙ্গ - অন্নপূর্ণা-১,২ সাউথ, মেন, গঙ্গাপূর্ণা, ধৌলাগিরি, টেন্ট পিক, গনেশ হিমাল, হিউনচুলি, মচ্ছপুচ্ছারে, বারাসিঙ্গা আর নাম না জানা অনেক শৃঙ্গ। স্বপ্নপূরণের সেই মুহূর্তে আমাদের সবার চোখে জল, আনন্দাশ্রু। এই মুহূর্ত আমাদের এই চারজনের সারা জীবনের সঙ্গী।

"হাইপোথার্মিয়া"

আধঘন্টা মিনিট ধরে অনেক ছবি তুলেও সাধ মিটছিল না। কিন্তু ফিরতে হবে। পাহাড়ে ছেলেখেলা যে চলে না সেটা বোঝার সময় আসছিল। খুব তাড়াতাড়ি নেমে আসছে সন্ধ্যে। রাজ আমাদের ছেড়ে আগেই নেমে গেছে। সুদীপ আর নিলাদ্রিও নামছে খুব জলদি। আমার আহত পা ভুগিয়েই চলেছে। সঙ্গী সেই পাহাড় পাগল সৌনীপ। বুঝতে পারছি তাপমাত্রা কমছে খুব দ্রুত। দূরে যে জায়গাগুলোয় ঘাস দেখা যাচ্ছিল আসার সময় এখন সেগুলো বরফে সাদা। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া হাড় পর্যন্ত জমিয়ে দিচ্ছে। টুপি ভেদ করে কান বরফ। নাকের ডগা, গাল অনভূতিহীন হয়ে আসছে, জিভ জড়িয়ে যাচ্ছে কথা বলতে গেলে। বুঝতে পারছিলাম বিরাট বড় ভুল করে ফেলেছি বাকিদের কথা না শুনে। সবাই ফেদার জ্যাকেট পরেছিল, এক আমি ছাড়া, কারণ আমার জ্যাকেটটা বড় আর পরলে হাঁটতে কষ্ট হবে ভেবেছিলাম। বুঝতে পারছিলাম যদি কোনভাবে ক্যাম্পে জলদি ফিরতে না পারি হাইপোথার্মিয়া অনিবার্য, আর তাহলে এই নির্জন প্রান্তরে মৃত্যু ছাড়া গতি নেই। অসম্ভব মনের জোরে কোনমতে অন্ধকারে টর্চ জ্বালিয়ে এমবিসি ফিরলাম।

রুমে ঢুকে জুতো খুলেই সোজা স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ঢুকলাম। নীলাদ্রি স্যাক থেকে আমার ফেদার জ্যাকেটটা বের করে দিল। যে সাধারণ জ্যাকেটটা পরেছিলাম ওটার ওপরেই চাপালাম। এর পরে স্লিপিং ব্যাগ ও তার ওপরে কম্বল চড়িয়েও কাঁপুনি থামছিল না। গরম জল দিয়ে মধু আর প্যারাসিটামল খেলাম। নীলাদ্রি হাতে পায়ে সর্ষের তেল মালিশ করে দিতে লাগল। ১৫-২০ মিনিট পরেও যখন কিছুই হচ্ছেনা ওরা বাধ্য হয়ে রাজকে জানাল। সব গাইড এবং পোর্টাররাই একসঙ্গে থাকে। একটা স্প্যানিশ কাপল ছিল পাশের রুমে। তাদের যে গাইড সে এক বাটি গার্লিক স্যুপ করে এনে দিল। সেটা খাবার ৫-১০ মিনিটের মধ্যেই ম্যাজিকের মত সব হাওয়া। সুস্থ হতেই তার দুহাত জড়িয়ে সবাই ধন্যবাদ জানালাম। আমার বন্ধুরা আর ওই নাম না জানা নেপালি গাইড, ওদের জন্যই আজ আমি এই লেখাটা লিখতে পারছি। রাতে স্যুপ, রুটি-তরকারি আর ডিমের অমলেট দিয়ে ডিনার সেরে গল্প করতে লাগলাম ওই স্প্যানিশ কাপল-এর সঙ্গে। দুঃখ হচ্ছিল এই ভেবে যে কেন আমাদের দেশের একটা পতাকা আনলাম না। অনেক দেশেরই পতাকা টাঙানো ছিল এমবিসিতে, ভারতেরই শুধু ছিলনা। শুতে যাবার আগে সবাই বাড়িতে একবার করে ফোন করলাম স্যাটেলাইট ফোন থেকে, প্রতি মিনিট ১৫০ নেপালি টাকার বিনিময়ে।

"শিবের জটা এবং অলৌকিক ভোর"

পরদিন সকালের কথাটাও মনে থাকবে সারাজীবন। ভোরবেলা ৫টা নাগাদ ঘুম ভাঙতে দেখি সুদীপ আর সৌনীপ অলরেডি ক্যামেরা আর ট্রাইপড নিয়ে বাইরের খোলা চাতালে বেরিয়ে পড়েছে। স্লিপিং ব্যাগ থেকে বেরোতেই মনে হল যেন জমে গেলাম। ফেদার জ্যাকেট, টুপি, গ্লাভস সব স্লিপিং ব্যাগের পায়ের দিকে নিয়ে শুয়েছিলাম যাতে গরম থাকে। তাড়াতাড়ি বের করে পরতে পরতেই বাইরে ছুটলাম ক্যামেরা নিয়ে। অসম্ভব ঠাণ্ডায় শরীর কুঁকড়ে গেলো। বেরিয়ে দেখি ঝরনার জল আসছিল যে পাইপ দিয়ে সেটা পড়ন্ত জলধারা এবং বালতি সমেত শক্ত বরফে পরিণত হয়েছে। ক্যাম্পের ছেলেরা লাথি মেরেও বালতিটাকে এক চুলও নড়াতে পারছেনা। আকাশে তখনও হাল্কা নীলচে অন্ধকার। মচ্ছপুচ্ছারের ডান দিকে এক ফালি চাঁদ দেখা যাচ্ছে, ঠিক যেন শিবের জটায় আটকে আছে। তাপমাত্রা -১০ থেকে -১২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মত হবে। ফর্সা হচ্ছে পূর্ব দিগন্ত।
লালচে থেকে গোলাপি হয়ে উজ্জ্বল সোনালি আলোয় যখন ধুয়ে যাচ্ছে অন্নপূর্ণা সাউথের শীর্ষ, মনে হল, এই ভোর কখনোই এই পৃথিবীর নয়। অপার্থিব, আলৌকিক এক দৃশ্য সমস্ত অনুভূতিকে গ্রাস করে নিল। বর্তমানে ফিরলাম অনেক পর ব্রেকফাস্ট টেবিলে, দুটো সেদ্ধ ডিমের দাম যখন দিতে হল ৪২০ নেপালি টাকা।

"বনবাদাড়ে মেজকাকা"

এবার নামার পালা। অনেকটা পথ একদিনে নামতে হবে। গন্তব্য একেবারে ছোমরং। হাঁটু জবাব দিয়েছিল আমার। বুঝতে পারছিলাম না কী করব। এক পা ফেলতেই মনে হচ্ছিল বসে পরি। বেস ক্যাম্পের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হঠাৎই দেখতে পেলাম একটা শক্ত বাঁশের লাঠি পড়ে আছে। মা অন্নপূর্ণার দান। ওটা হাতে পেতেই অনেকটা সাপোর্ট পেলাম। কতবার যে বললাম আর পারছি না, একটু দাঁড়াও আমার জন্য তার ঠিক নেই। শেষে সুদীপ আমার হাঁটু নিয়ে কাতরানি দেখে আমার নামই দিয়ে দিল "মেজকাকা"। "মেজকাকা"র কতরকম টোনের যে উচ্চারণ বাকি ট্রেকে আমায় সহ্য করতে হল তার কোন হিসেব নেই। ভলিনি স্প্রেটা জ্যাকেটের পকেটেই ছিল। নী-ক্যাপ নামিয়ে স্প্রে লাগাতে থাকলাম মাঝে মধ্যে। সমতল রাস্তায় দেওরালি অবধি ফিরতে অতটা কষ্ট হলনা। মাঝখানে দেখলাম একটা রাশিয়ান গ্রুপের বেশ লম্বা চওড়া ছেলে স্লিং-এ ডানহাত ঝুলিয়ে ফিরছে। কী হল জিজ্ঞেস করায় জানলাম পা পিছলে পাথরের খাঁজে হাত ঢুকে গিয়ে কবজি ভেঙেছে। ঠিক করলাম রাজ যতই "মারো মারো, ভাগো ভাগো, খিঁচো খিঁচো" বলুক আমরা সাবধানে আস্তে আস্তেই নামব, তাড়াহুড়ো করব না।

বাকী রাস্তায় সেই একই ডাউন ট্রেল। বাম্বু পৌঁছে লাঞ্চ করে আবার পথচলা। বিকেল যখন ৫টা আমরা, মানে আমি আর সৌনীপ পৌঁছলাম আপার সিনুয়া। আমাদের থাকার কথা লোয়ার সিনুয়াতে। যেটা এখনও কম সে কম ২৫ মিনিটের হাঁটা। এদিকে আলো একেবারেই কমে এসেছে। সুদীপরা এগিয়ে গেছে। ফোনেও পাচ্ছি না। যা হয় হোক ভেবে নামতে শুরু করলাম জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। পাশে বিভিন্ন রকমের আওয়াজ। অদ্ভুত সব ডাক, সরসর করে পাতার আওয়াজ, সব মিলিয়ে ভয় পাওয়ার মত। আর কিছু দেখা যাচ্ছিল না নীচের হোটেলের আলো ছাড়া। টর্চ জ্বালিয়ে এগোতে থাকলাম দুজনে। হঠাৎ সামনে থেকে টর্চের আলো- "আরে ইয়ার তুম লোগো নে তো ডরা হি দিয়া। চলো, আ যাও। মে তুম লোগো কো ঢুন্ডনে কে লিকে আয়া"। সত্যি সেদিন রাজকে দেখে খুব স্বস্তি পেয়েছিলাম।

"আই থট ইউ উড বি ফিফটিন অর সিক্সটিন"

পরদিন সকাল ৮ টায় নামা শুরু হল ঝিনুডাঙার উদ্দেশ্যে। পথে ছোমরঙে লাঞ্চ সেরে আমাদের বাকি জিনিসপত্র ফেরত নিয়ে নামতে লাগলাম আমরা। দুপুর ৩ টে নাগাদ পৌঁছে গেলাম ঝিনু-তে। রাজ বলল এখানে একটা উষ্ণ প্রস্রবণ আছে, সেখানে স্নান করলে ট্রেকের সব ক্লান্তি নাকি ধুয়েমুছে সাফ। কিন্তু ওটায় পৌঁছাতে আরও আধ ঘন্টা ট্রেক ডাউন করতে হত। আমরা আর রাজি হলাম না। রাজ একাই গেল।

ট্রেকের শেষ দিনের সকালে মনে হল আজই ফিরে যাব পোখরায়, এই অনির্বচনীয় প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যকে পিছনে ফেলে রেখে। গত কয়েকদিনের মত ব্রেকফাস্ট করে সকাল সকাল বেরনো হল। মাঝ দুপুরে লাঞ্চ করে আরও ঘন্টাখানেক হাঁটার পর আমরা সয়ুলির বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে ট্রেক শেষ করলাম। মাঝে লাঞ্চের সময় একজন ফরাসি ভদ্রলোকের সাথে আলাপ হয়েছিল। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে শেষ ধাপটা নামতেই উনি হাততালি দিয়ে উঠলেন। কাছে এসে হ্যাণ্ডশেক করে আমাদের কনগ্র্যাচুলেট করে বললেন "উই শুড বাউ আউয়ার হেড, অ্যান্ড ডু নমস্তে টু মাদার আন্নপূর্ণা ফর গিভিং আস দি অপারটুনিটি, অ্যান্ড লেটিং আস কমপ্লিট দি ট্রেক উইদাউট এনি ইনজুরিস"। ভদ্রলোকের নামটা মনে নেই। কিন্তু উনি মহাভারত আর রামায়ণ পড়েছেন বললেন, আর এটা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে আমার বয়স ২৫ এবং আমি ভারত সরকারের একজন কর্মচারী। উনি বল্লেন-"আর ইউ সিরিয়াস? আই থট ইউ উড বি ফিফটিন অর ... "। দুজনেই হাসতে লাগলাম। এরপর ফেরার পালা। একটা জিপ ভাড়া করে আমরা চলে এলাম নয়াপুল পর্যন্ত। দেবীকে ফোন করাই ছিল। উনি গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পোখরায় আমাদের আগের হোটেলেই বুকিং ছিল। রুমে ঢুকে আর কেউ কথা বলতে পারছিলামনা। বিশ্বাস হচ্ছিল না যে আমরা ট্রেক শেষ করে ফিরে গেছি।

"সূর্যোদয়ের সাক্ষী"

এরপর আরও একদিন পোখরায় ছিলাম। পরেরদিন ভোর ৪.৩০ -এ আমি, সুদীপ আর সৌনীপ দেবী-র পাঠানো গাড়িতে গেলাম পোখরার অন্যতম দর্শণীয় ভিউপয়েন্ট বৌদ্ধস্তূপে। ওই উচ্চতা থেকে পোখরা শহরটাকে আলোকবিন্দু দিয়ে সাজান আলোকবর্তিকা বলে মনে হচ্ছিল। অদ্ভুত একটা সূর্যোদয় দেখলাম সেদিন। পাহাড়ের পিছন দিয়ে মেঘের ভিতর থেকে একফালি গোলাপি আলোর আভাস, আর তারপর মিনিট পাঁচেকের মধ্যে একটু একটু করে বৃত্তাকার অগ্নিগোলকে পরিণত হওয়া। প্রকৃতির সৃষ্টির এই অপূর্ব নিদর্শন আর কখনও এই জীবনে হয়ত দেখতে পাবনা এইভাবে। উত্তরে তখন রাঙা হয়ে উঠেছে মচ্ছপুচ্ছারের সামনের দিক। অনেকে বললেন খুব লক্ষ করলে নাকি এদিক থেকে একটা বসে থাকা বাঘের অবয়ব দেখা যায়। আমি যদিও অতটা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম না। দূরে দেখা যাচ্ছিল হিমালয়ের আরেক বিখ্যাত শৃঙ্গ নীলগিরিকে। বাকি দিনটা কাটল ফেওয়া লেকের ধারে ছবি তুলে আর খুচখাচ শপিং করে। আমাদের নাম দিয়ে অন্নপূর্ণার লোগো দেওয়া চারটে টিশার্ট বানিয়ে সেগুলো পরে ছবিও তুলে ফেললাম।

"যাচ্ছি কিন্তু ফিরব বলেই"

৪ ডিসেম্বর ২০১৩, বাড়ি ফেরার পালা। পোখরাকে "ফেরি ভিটৌলা" (নেপালি তে আবার দেখা হবে) বলে রওয়ানা দিলাম বীরগঞ্জের উদ্দেশ্যে। সোজা হাইওয়ে এর পিছনের দিকে বিদায় জানাতে মা অন্নপূর্ণা অনেকক্ষণ আমাদের সঙ্গ দিলেন। কয়েক ঘন্টা পর পথের বাঁকে হারিয়ে যেতেই মনটা খারাপ হয়ে গেলো, যদিও অনেকদিন পর বাড়ি ফিরছি ভেবে আনন্দও হচ্ছিল। বিকেল বিকেল বীরগঞ্জে পৌঁছে নেপালি টাকাকে ভারতীয় টাকায় চেঞ্জ করলাম। আবার টাঙ্গা করে ধুলোর মধ্যে বর্ডার ক্রস। মাঝখানে এক ব্যাটা ঘোড়া দিব্বি গাছপালা ভেবে আমার স্লিপিং ব্যাগটা চেবাতে শুরু করেছিল। যখন কেড়ে নিতে পারলাম দেখলাম চেবাতে না পারলেও ভালো করে লালা মাখাতে সে কসুর করেনি। স্টেশনের কাছেই হোটেল নেওয়া হল। পরদিন সকাল ন'টায় ট্রেনে উঠলাম। সেই মিথিলা এক্সপ্রেস। এক বয়স্ক বাঙালি গ্রুপের সঙ্গে একদিনের হৈচৈ ট্রেনজার্নি শেষে পরদিন ফিরে এলাম প্রিয় শহর কলকাতায়।

[বিঃদ্রঃ তথ্যসূত্র - ইন্টারনেট এবং আমার প্রিয় বন্ধু সৌনীপের ব্লগ www.amazingannapurna.blogspot.in, সমস্ত ছবি আমাদের নিজেদের তোলা এবং "পদাতিক" গ্রুপের তরফ থেকে দেওয়া - সৌজন্যে, সুদীপ, নিলাদ্রি, সৌনীপ এবং অভিষেক।]

~ অন্নপূর্ণা বেসক্যাম্প ট্রেক রুট ম্যাপ ~ অন্নপূর্ণা বেসক্যাম্প ট্রেকের আরও ছবি ~

ছেলেবেলা কেটেছিল ঘুরে ঘুরেই - নানা জায়গায় বাসাবদলের কারণে। তাই পরবর্তী জীবনে ভ্রমণই ভুবন হয়ে উঠেছে পেশায় ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার স্নেহাদ্রি মেউরের। ভালোলাগার সুন্দর স্মৃতিগুলি পাথেয় করেই জীবন যুদ্ধে এগিয়ে যেতে চান তিনি। নিয়মিত বেড়াতে বেরিয়েই সেই স্মৃতির ঝুলি ভরে তুলতে চান আরও। এখন সেই ভ্রমণের নেশায় যুক্ত হয়েছে অ্যাডভেঞ্চার আর ফটোগ্রাফি। অনেকদিন পরে পুরোনো ভালোলাগার স্মৃতি হয়ে ওঠে মধুরতর - এই ভেবেই ভ্রমণ কাহিনি লিখতেও কলম ধরেছেন।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

= 'আমাদের ছুটি' বাংলা আ. র্জাল ভ্রমণপত্রিকায় আপনাকে স্বাগত জানাই = আপনার বেড়ানোর ছবি-লেখা পাঠানোর আমন্ত্রণ রইল =

রাজার দেশে কয়েকদিন

শ্রীতমা বিশ্বাস

~ ভুটানের তথ্য ~ ভুটানের আরও ছবি ~

তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গের সঙ্গে রবিকিরণের এক অপূর্ব মেলবন্ধনে উদ্ভাসিত চারিদিক। পর্বতশিখর থেকে বয়ে আসা এক ঝলক সতেজ হিমেল হাওয়া মুহূর্তেই ঝরিয়ে দিল পথের সব ক্লান্তি। প্রায় ১০০০০ ফুট উচ্চতায় দোচু লা - গিরিপথ। বৌদ্ধ স্থাপত্যের গভীর নৈঃশব্দ্য, পাহাড়ের এক আশ্চর্য নির্জনতা আর প্রকৃতির অনবদ্য সৌন্দর্য মনকে ধীরে ধীরে যেন গ্রাস করে।

রুটিনমাফিক নিত্যদিনের কর্মব্যস্ততার মাঝেও ভ্রমণ পিপাসু মন বেরিয়ে পড়েছিল প্রকৃতির হাতছানিতে। গন্তব্য ভুটান। ভারত-ভুটান সীমান্ত শহর জয়গাঁও-ফুন্টসোলিং পেরিয়ে পারমিট করে সোজা ভুটানের রাজধানী থিম্পুর উদ্দেশে যাত্রা শুরু হল। রাজার দেশে পা রাখলাম আমরা। যদিও সে দেশে বর্তমানে গণতান্ত্রিক সরকার, রাজার উপস্থিতি এখনও ভালোভাবেই অনুভব করা যায় সর্বত্রই।

পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙিয়ে এগিয়ে চলেছে আমাদের গাড়ি। উচ্চতা যত বাড়ছে, ঠাণ্ডাও বাড়ছে পাল্লা দিয়ে, বদলাচ্ছে প্রকৃতিও। রাস্তার দুপাশে পাইন গাছের সমারোহ, নাম না জানা রঙবেরঙের বনফুল আর ঝরনাধারার ঝিরিঝিরি। প্রকৃতি যেন দু'হাত ভরে সাজিয়েছে দেশটাকে। পাহাড়, নদী, ঝরনা আর অরণ্যে মোড়া সে যেন এক অবাক রূপসী। চলতে চলতে মাঝে মধ্যেই একরাশ মেঘ এসে ঢেকে দিচ্ছে আশেপাশের দৃশ্যপট। ঘন কুয়াশার জাল কেটে সাবধানে আঁকা বাঁকা পথে চলেছে গাড়ি। দিনের শেষে প্রায় ১৮০ কিমি পথ পেরিয়ে থিম্পুতে পৌঁছলাম।

পাখির চোখে থিম্পু শহর

পরেরদিন থিম্পু শহর সফরে বেরোলাম। পাহাড়ের চূড়ায় বিশালকায় এক স্বর্ণাভ বুদ্ধমূর্তি আর তার সন্নিকটে নজরকাড়া ভিউপয়েন্ট। এখান থেকে নীচে পাহাড় ঘেরা শহরটাকে ছবির মত সুন্দর দেখায়। এরপর সারাদিন ধরে ঘুরে ঘুরে থিম্পু মিউজিয়াম, পেন্টিং স্কুল, স্পোর্টস কমপ্লেক্স, চিড়িয়াখানায় জাতীয় পশু 'টাকিন' এসব দেখা হল।

এর পরের গন্তব্য পারো। পরিস্কার, পরিচ্ছন্ন, কোলাহলমুক্ত ছোট্ট পাহাড়ি শহর। অপূর্ব কারুকার্যময় ঘরবাড়ি আর বৌদ্ধ সংস্কৃতির পীঠস্থান। পথের ধারে চোখে পড়ল ছককাটা ধানক্ষেত, সবুজ আপেল বাগানে গাছে গাছে ঝুলছে লাল টুকটুকে আপেল। পাহাড়ের কোলে ছোট্ট পারো এয়ারপোর্টটি দেখার মতন। পারো মিউজিয়ামে সাজানো ভুটান রাজাদের বংশ পরম্পরায় ব্যবহৃত রণবেশ, যুদ্ধাস্ত্র ও দৈনন্দিন সাজসরঞ্জাম অতীতের ভুটান সংস্কৃতির সাক্ষ্য বহন করছে। এখানকার অসাধারণ এক বৌদ্ধ স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন পুনাখা জং। সামনেই দুই নদী - ফো-চু আর মো-চু-র সঙ্গমস্থল বনভোজনের এক মনোরম পরিবেশ।

দুই নদীর মিলনস্থলে পারো জং

আমাদের শেষ গন্তব্য প্রায় ১৫০০০ ফুট উঁচ্চতায় চেলা লা গিরিপথ ও চিন সীমান্তে ভুটানের শেষ গ্রাম হা। পথ পেরোতেই পাহাড়ের ঢালে শ্বেতশুভ্র বরফাবৃত চিরহরিৎ পাইনের সারি। হা ভ্যালিতে পৌঁছে যেন ফিরে গেলাম হারিয়ে যাওয়া শৈশবের দিনগুলিতে। বরফের মধ্যে লুটোপাটি, বরফ ছোঁড়াছুঁড়িতেই কেটে গেল কয়েকঘন্টা। যেন এক বাঁধনহারা আনন্দ। ফিরে আসতে ইচ্ছে করে না।

পারোতে এক পাহাড়ের ঢালে আমাদের ছোট্ট কটেজ। একদিকে বইছে পারো-চু নদী আর তাকে ঘিরে সবুজের সান্নিধ্য। ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা নেমে এল। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে ছোট ছোট বাড়িগুলো জোনাকির মত ঝিকমিক করছে। নিসর্গের এক নিরাভরণ, অদ্ভুত মাদকতায় ভরা পারোর অনির্বচনীয় নির্জন সৌন্দর্য। নিস্তব্ধতারও যে একটা মিস্টি শব্দ আছে তার থেকে ব্যস্ত কোলাহলময় শহুরে জীবন চিরকালের জন্য বঞ্চিত। আর সেই 'সাউন্ড অফ সাইলেন্স'-এর মায়াবী আবেশে আমরা তখন সকলেই আচ্ছন্ন। কাল ফিরে যাওয়া হবে শহরের কোলাহলে। শুরু হয়েছে মনকেমনের পালা।

দোচু লা

~ ভুটানের তথ্য ~ ভুটানের আরও ছবি ~

বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (কল্যাণী, নদীয়া) কৃষিবিজ্ঞান অনুষদের ছাত্রী শ্রীতমা সুযোগ পেলেই পরিজনের সঙ্গে বেরিয়ে পড়েন প্রকৃতির হাতছানিতে, তাঁর অবসর বিনোদন ছবি তোলা, বই পড়া, গান শোনা আর শখের লেখালেখি।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

অন্য ভ্রমণ

ভ্রমণ তো বানিয়ে তোলা গল্পকথা নয়, মানুষের সত্যিকারের জীবনকাহিনি। আর তাই ভ্রমণ কাহিনি মনে শুধু আনন্দই এনে দেয় না, চোখের জল অথবা প্রতিবাদের ভাষাও জাগিয়ে দিতে পারে। ট্যুরিজম ইন্ড্রাস্ট্রির সহায়ক বিজ্ঞাপনী প্রচারমাধ্যম ছাড়াও ভ্রমণ কাহিনির বড় পরিচয় বিশ্ব সাহিত্যের একটি অন্যতম ধারা রূপেও। তেমনই কিছু 'অন্য ভ্রমণ' কথা।

ভয়ঙ্কর পেরিয়ে ভূস্বর্গে

অরূপ চৌধুরী

ডাল লেকের ধারে হাতে গোনা কয়েকজন পর্যটক...তাও সবার চোখেই সতর্ক দৃষ্টি – প্রকৃতির রূপে নজর নেই কারও।

আমি অবশ্য অন্য কথা ভাবছিলাম। ডাল লেকের বারো নম্বর গেটের কাছে লাল শেভ্রোলে গাড়িটা যে তাগড়াই দেখতে কাশ্মীরী যুবকটি ধুচ্ছিলেন, তাঁর কাছে গিয়ে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'যুশমার্গ যাবেন?' উনি আমার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আপাদমস্তক জরিপ করলেন যেন আমি সদ্য নেপচুন কি প্লুটো থেকে পৃথিবীতে এলাম... আর কথা না বাড়িয়ে এগিয়ে গেলাম সামনের ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের দিকে।

অন্য দিনের মতো গাড়ির ভিড় নেই – সবেধন নীলমণি একটা চালকহীন সাদা ইন্ডিগো দাঁড়িয়ে। আনমনে ভাড়ার চার্ট দেখছিলাম – যুশমার্গ ১৮০০ টাকা – 'কাঁহা যায়েগা বেটা?' পাশ থেকে জিজ্ঞাসা করলেন ষাটোর্দ্ধ এক ব্যক্তি – গালে সাদা দাড়ি – মাথায় সাদা টুপি – পরণে একটি ধূসর ফিরহান। যুশমার্গ যাব শুনে জোরে মাথা নেড়ে জানালেন আজ সম্ভব নয় – এরকম দিনে নির্জন পথে অনেক বিপদ – রাস্তায় আটকে দিতে পারে জওয়ানেরা, গাড়িতে পাথর পড়াও অস্বাভাবিক নয়। দু-একবার তাও অনুরোধ করলাম – মৃদু হেসে 'না' বলে হাতের উর্দু কাগজের পাতা ওল্টাতে শুরু করলেন।

আগের দিন হাউসবোটের মুজফ্‌ফর ভাই বলেই দিয়েছিল, আজ গাড়ি পাওয়া অসম্ভব। তাও আমার জেদ দেখে ফারুকজী সকালে ন' নম্বর ডাল গেটে পৌঁছে দিয়ে মুচকি হেসে বলেছিলেন, ৯ টার মধ্যে ফেরত আসতে – ব্রেকফাস্টে পোহা বানাবেন। পাশের হাউসবোটের সরকারি কর্মচারি বাঙালি কর্তাবাবুটি বেরোবার সময় চায়ের পেয়ালার আড়াল দিয়ে অবাক দৃষ্টিতে দেখছিলেন। এইসবে জেদটা আরও চেপে গিয়েছিল – কিন্তু যাওয়ার কোন উপায় দেখছিনা এখনও – ডাল লেকের ধার দিয়ে বুলেভার্ড রোড বরাবর অজানার উদ্দেশ্যে আনমনে হাঁটছি...।

১৫ মার্চ, ২০১৩। দুদিন আগেই শ্রীনগরে উগ্রপন্থী হামলা হয়েছে। তখন পহেলগাঁও-এ ছিলাম। তারপর থেকেই বনধ্ - কারফিউ। শ্রীনগরে ফিরে এসেছিলাম বেশ দুঃসাহসিকভাবেই। কিন্তু এখানে এসে এভাবে আটকা পড়ব ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছিনা। অথচ কোন গাড়িই নেই। এলোমেলো হাঁটতে হাঁটতে মনের দুঃখে রাস্তায় একটা ইঁটে লাথি মারার পর বেশ খানিকক্ষণ খুঁড়িয়ে হঠাৎ দেখি একটা ফাঁকা অটো। উঠে পড়লাম থামিয়ে। কোথায় যাব এই প্রশ্নের উত্তরে নিজের অজান্তেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল - নিশাত বাগ। 'পঞ্চাশ টাকা লাগবে' – এককথাতেই রাজি হয়ে গেলাম – আসলে তখন আমার একটা গন্তব্য চাই।

শ্রীনগরে এসে প্রথমদিনই মুঘল গার্ডেনগুলো দেখে নিয়েছিলাম। আজকের দিনটা একেবারে অন্যরকম। একটিমাত্র পর্যটকদের বাস। বাস থেকে নেমে সন্ত্রস্ত মুখে নিশাতবাগে ঢুকছে একদল বিদেশি পর্যটক – যেন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করছে। পাখির ডাক চাপা পড়েছে ভারি বুটের পদচালনার আওয়াজে। একা পর্যটক দেখে বার দুয়েক তল্লাশি হল – জবাবদিহি, পরিচয়পত্র দেখানোর পরও ভারতীয় বীর সেনানির সন্দেহের দৃষ্টি রইল আমার ওপর। আগের দিন নিশাতবাগ থেকে ডাল লেকের মাঝে তোরণ আকৃতির একটি স্থাপত্য নজর কেড়েছিল – নিশাতবাগের দিকে না গিয়ে শিকারায় ভেসে সেখানে যাব স্থির করলাম।

শিকারা ঘাটে জনাচারেক প্রবীণ শিকারাওয়ালা অবশ্য আমেজের সঙ্গে গড়গড়ি টানছেন – আজকের দিনে পর্যটকদের আশা তাঁরাও রাখেন না। আমাকে দেখে যেন খানিক চমকেই উঠলেন। দূরের ওই পাথরের গেটটায় যেতে চাই শিকারায় ভেসে – শুনে অবাক হয়ে একজন প্রশ্নই করে ফেললেন, 'বেটা, তু শায়র হ্যায় ইয়া ফির কুছ অউর?' আজকের দিনে একা পর্যটকের এমন অদ্ভুত বায়না শুনে অবশ্য পাগল ভাবাটা খুব একটা অস্বাভাবিক নয়। দরাদরির দরকার হলনা, ২০০ টাকা দস্তুরে প্রবীন নাসির চাচার শিকারায় চেপে বসলাম। ভেসে পড়লাম প্রকৃতির অনির্বচনীয় ক্যানভাসে।

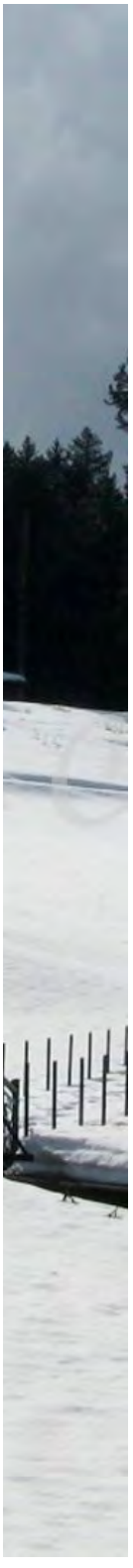

ভূস্বর্গকে ভয়ঙ্কর বানানোর গুরুদায়িত্ব মানুষের - প্রকৃতি কিন্তু খুব যত্ন করেই তাকে সাজিয়ে রাখে। শ্রীনগরের ডাউনটাউন যখন কালো ধোঁয়ায় ঢাকা আজ, ডাল লেকের এই প্রান্তে কিন্তু প্রকৃতির জাদুর ছোঁয়া - নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলাদের আনাগোনা - শান্ত, স্থির ডাল লেকের জলে তার নিখুঁত প্রতিফলন - ক্যালেন্ডারে এরকম ছবি দেখেছিলাম কোনোদিন। জলের মাঝে মেঘের প্রতিফলনের বুক চিরে হলুদ শিকারা চলেছে - এগিয়ে আসছে আমার গন্তব্য। একটু পিছনে হরি পাহাড়ের ওপরে আকবরের কেল্লা। নাসির চাচা অবশ্য ডাল লেকের মাঝের এই তোরণটি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলতে পারলেন না। জানালেন, কখনও এখানে একটা রাস্তা ছিল আর কেল্লাতে প্রবেশের তোরণ। বর্তমানে সবই কালের গ্রাসে থুড়ি ডালের গ্রাসে। মাথা উঁচু করে আছে শুধু আর্চ আকৃতির প্রবেশপথটি - তার মধ্যে দিয়েই শিকারাটি ভেসে গেল। আর্চের গায়ে মার্বেল ফলকে উর্দুতে কিছু লেখা। নাসির চাচা পড়তে পারলেন না - চোখের জোর কমে আসছে যে - ছবি তুলে নিলাম। আকবরী কেল্লা এখনও অনেকটা দূরে। শিকারা এবার ইউ-টার্ন নিল। ডাল লেকের জলে নিশাত বাগের প্রতিচ্ছবি। বুলেভার্ড রোড আজ বড়ই শান্ত। ফিরে এলাম শিকারা ঘাটে। এত সুন্দর প্রকৃতির মাঝে বিচরণ করে মনটাও আজ খুব শান্ত, প্রসন্ন আরও বেশি।

স্নিগ্ধ, শান্ত প্রকৃতি যেন ভূস্বর্গের আতঙ্ককে হারিয়ে দেওয়ার জন্য আমার জেদটা আরও বাড়িয়ে দিল। একটা অটো যাচ্ছিল, হাত দেখিয়ে উঠে বসলাম - হাউসবোটের দিকটায় ফেরার জন্য। অপ্রত্যাশিত সওয়ারি পেয়ে যুবক অটোওয়ালা মিনিট দশেকের পথেই বেশ গল্প জুড়ল - ঠিক গল্প নয় অবশ্য, ভয়ঙ্কর ভূ-স্বর্গের সত্যিকারের কাহিনি - মানুষের হারিয়ে যাওয়ার - বুটের আওয়াজের বিভীষিকার - রাতবিরেতে তল্লাসির...। সেই কাহিনিতে আমার যুশমার্গ যাওয়ার কোনো আশার আলোর দিশা নেই - আছে শুধু অন্ধকারের কথা - যে অন্ধকারে বারুদের গন্ধ লেগে থাকে - লেখা থাকে আফস্পা-র নিয়মকানুন, রূপকথার প্রবেশ নিষেধ সেখানে। কাশ্মীরের রূপকথা বরাদ্দ শুধুমাত্র পর্যটকদের জন্যে - তাও আজকের মতো দিনে নয় - ১৫ মার্চ, ২০১৩।

৯ নম্বর ডাল গেটে নেমে দেখি একা সেই সাদা ইন্ডিগো গাড়িটি এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে। পায়ে পায়ে এগোলাম ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের অফিসটার দিকে। কালো কাঁচের দরজা খুলে সেই প্রবীণ কাশ্মিরীটি - আব্দুল কাদির - আব্দুল চাচা - ভিতরে ডাকলেন। হাতে ধরালেন ধোঁয়া ওঠা কাশ্মিরী চা কাওয়া-র পাত্র - আড্ডা জমে উঠল। এমন কর্মহীন দিনে যেন গল্পদাদুর আসর বসালেন। ৩৫ বছর ধরে শ্রীনগরে গাড়ি চালাচ্ছেন, এরকম কত আগুন জ্বলা কারফিউ দেখেছেন - বলতে বলতে গলাটা উদাস হয়ে আসে। প্রসঙ্গ বদলে আমার কথা, আমার বাড়ির কথা জিজ্ঞাসা করলেন। শুনলেন কাশ্মীরে গত ন'দিনে আমার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা। ক্যামেরাতে তোলা ছবিও দেখলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। হয়তোবা আমার ভ্রমণ পাগল সত্ত্বাটাকেও খানিকটা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। সুযোগ বুঝে হাতের শেষ তাসটা ফেললাম - ইমোশনাল ব্ল্যাকমেলের - যুশমার্গ না গেলে কাশ্মীর দেখা যে অপূর্ণ রয়ে যাবে - জয়ী হবে কাশ্মীরের আতঙ্কই! খানিকক্ষণ দুজনেই চুপ করে থাকলাম। চশমা খুলে চোখটা মুছলেন প্রবীণ চাচা। উঠে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আপনমনে কী বিড়বিড় করলেন। এবার আমার দিকে ফিরে বললেন - তুই কলকাতা থেকে এসে ভয় কাটিয়ে ঘোরার সাহস দেখাতে পারলে একজন কাশ্মিরী ভয় পাবে কেন? ইনশাল্লাহ্ - উপরওয়ালা ভরসা - বেরিয়ে পড়ি। আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। কিন্তু আনন্দ থমকে গেল পরমুহূর্তেই - নাহ্, যুশমার্গ পর্যন্ত যাবেন না আব্দুল চাচা, অবন্তীপুরা পর্যন্ত ঘুরিয়ে আনবেন। গতকাল থমথমে পরিবেশে পহেলগাঁও থেকে ফেরার পথে অবন্তীপুরায় নামতে পারিনি যে। যুশমার্গ যাওয়ার ঝুঁকি নেবেন না। যাইহোক মন্দের ভালো। কোথাও তো যাওয়া যাক, তারপরে দেখা যাবে।

আব্দুলচাচার পাশে বসে পড়লাম। ১৫ মার্চ শ্রীনগর ট্যাক্সি স্ট্যান্ড থেকে একমাত্র গাড়িটি বেরোল।

শ্রীনগরের সীমানা পেরোতেই বেশ বেগ পেতে হল - কারফিউ-এর শ্রীনগরের কঠিন বেষ্টনী - যে রাস্তাতেই গাড়ি যেতে চায়, সেখানেই কাঁটাতারের বাঁধন - নো এন্ট্রি। শ্রীনগর শহর - যাকে হাতের তালুর থেকেও ভালো চেনেন আব্দুল চাচা, তাঁর কাছে সেও তখন ভুলভুলাইয়া। এরমধ্যেই চারবার সেনাদের চিরুনি তল্লাশিও হয়ে গেল - দরজা খুলে, পিছনের ডিকি খুলে, গাড়ির নীচে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে খোঁজ - পরিচয়পত্র দেখানো - কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি - সন্তোষজনক উত্তর খুঁজতে আমি নিজেও দিশাহারা। তবে শ্রীনগর মন্দের ভালো, পর্যটকদের জন্য বিশেষ ছাড় আছে সেনাদের। মরণাপন্ন রোগীর অ্যাম্বুলেন্স হয়তো সেদিন শ্রীনগরের বাইরে যেতে পারতো না, তবে পর্যটকের গাড়ি হোঁচট খেতে খেতে পেরিয়ে এল কারফিউ-র সব বেড়াজাল। শ্রীনগর শহর পেরিয়ে হাইওয়েতে পড়ে আব্দুল চাচার মুখে একটাই কথা - 'আল্‌হামদুল্লাহ্'।

এই হাইওয়ে ধরে সোজা রাস্তায় অনন্তনাগ। গতকালই ফিরেছি, রাস্তাটা চেনা লাগছে তাই। তবে শুনশান হাইওয়েতেও স্পিডোমিটারের কাঁটা চল্লিশের ওপরে উঠছে না। বেশ দুলকি চালে বাইরে সতর্ক দৃষ্টি রেখে গাড়ি চালাচ্ছেন আব্দুল চাচা। অবশ্য গল্প-কথা চলছে অবিরত - এই সাদা ইন্ডিগো গাড়িটি তাঁর পুত্রসম। ছ'বছরের পুরোনো হলেও আদরে-যত্নে বছরখানেকের বেশি বলে মনেও হয়না দেখে। বাম্পার, খানাখন্দ দেখে সাবধানে সস্নেহে গাড়ি চালিয়ে যান। আব্দুল চাচার দুই ছেলে। বড়জনের বয়স ছত্রিশ বছর, কেশর-এর ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। ছোটজন আঠাশ, গাইডের কাজ করে। আমি হয়ে গেলাম আব্দুল চাচার 'মাজলা বেটা'। বাকী সময়টুকু বেটা বলে স্নেহের আশ্রয়েই টেনে নিলেন আমাকে।

হাইওয়ের দুপাশে পাতা ঝরা চিনার গাছের সারি পিছনে রেখে, দূরের নীল আকাশের নীচে পেঁজা তুলোর মতো মেঘের ছায়াতে ঘেরা বাদামি পাহাড়কে রেখে মিস্টি হাওয়া মেখে চলেছে আমাদের গাড়ি। এবারে দুপাশ জোড়া বিস্তৃত ক্ষেত দেখা যাচ্ছে - আব্দুল চাচা বললেন কেশর চাষ হয় এখানে - পৃথিবীর সেরা কেশর - সোনার চেয়েও দামি। এখন যদিও মরসুম নয়, কিন্তু ক্ষেতের পরিচর্যা চলছে। শরৎকালে কেশর গাছে ফুল

আসে। সেই ফুল থেকে বহু যত্নে কেশর বার করা হয়। কাশ্মীর ছাড়াও স্পেন আর গ্রীসে কেশরের চাষ হয়। তবে কাশ্মীরের কেশরই বিশ্বখ্যাত। কেশর এত দামী হয় কেন? প্রশ্নটা অনেকক্ষণ ধরেই মাথার মধ্যে ঘুরছিল, এবার করেই ফেললাম চাচাকে। সতর্ক চোখে গাড়ি চালাতে চালাতেই কেশরকথা শোনাচ্ছিলেন আব্দুল চাচা। যদিও ফাঁকা রাস্তায় কোনো ভয় নেই বলেই আমার মনে হচ্ছিল। মাঝেমধ্যে জনপদ এলেই দোকানের বন্ধ শাটার, আর্মি ট্রাক, ইনসাস- এস এল আর নিয়ে টহলরত জওয়ান - তালটা যেন কেটে যাচ্ছে। জনপদগুলো পেরোনোর সময় বুঝতে পারছি মনে মনে আল্লাহ্-র নাম নিচ্ছেন আব্দুল চাচা, আবার ফাঁকা রাস্তাতে পড়লে কেশরকথা।

একেকটা কেশর গাছে মাত্র দু-চারটে ফুল হয়। প্রত্যেকটা ফুলেই ঘিয়ে রঙের তিনটি গর্ভমুণ্ড বা স্টিগমা থাকে। তার থেকেই প্রস্তুত হয় বহুমূল্য কেশর। প্রয়োজনীয় সার আর বিস্তর পরিচর্যা তো বটেই, পরিমিত বৃষ্টিপাত, টানা নরম সূর্যালোক - এতসবকিছু জরুরি বলে কাশ্মীরের আবহাওয়াই এর উপযুক্ত। দেড়শো ফুল থেকে মাত্র এক গ্রাম কেশর হয়। তাই বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান মশলা কেশর।

কেশরের গল্প শুনতে শুনতে কখন যেন চল্লিশ কিলোমিটার রাস্তা পেরিয়ে এসেছি, পৌঁছে গেছি অবন্তীপুরা। প্রথমে গেলাম অবন্তীশ্বরা মন্দিরে। বেলা প্রায় সাড়ে বারোটা, জুম্মার নামাজের সময় হয়েছে। ধর্মপ্রাণ আব্দুল চাচা সাদা কাপড় পেতে রাস্তার পাশেই নামাজে বসলেন - সামনেই অবন্তীশ্বরা শিব মন্দির। প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসস্তুপের দিকে মুখ করে (পশ্চিম দিক বলে) এক বৃদ্ধ কাশ্মীরি নামাজ পড়ছেন। অসাধারণ এই ছবির ফ্রেমটিকে ক্যামেরায় নয়, মনের মধ্যেই ধরে রাখলাম।

নবম শতাব্দীতে রাজা অবন্তীবর্মণ নির্মিত শিবের এই মন্দিরটির এখন ধ্বংসাবশেষ পড়ে রয়েছে। চত্তুরে ঢুকলে প্রথমেই নজরে আসে কালো পাথরের গায়ে কারুকার্য করা বিশাল প্রবেশদ্বার। সেটা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই চারদিকে ছড়ানো অতীতকালের টুকরো স্মৃতি - ভাস্কর্য, পাথর খোদাই মূর্তি - আর ঠিক মাঝখানে কয়েকটা সিঁড়ি ভেঙে উঠে একটা প্রাঙ্গণ - বোঝা যায় এটাই ছিল মূল মন্দির - তবে এখন শুধু ইতস্তত ছড়ানো কিছু পাথরের চাঁইয়ের গায়ের নক্সাই জানান দেয় হাজার বছর আগের ইতিহাসকে। মাঝ দুপুরের রোদের ঝকঝকে আলোয় দূর পাহাড় আর নীল আকাশের ব্যাকগ্রাউন্ডে, কয়েকজন বন্দুকধারীর প্রহরায়, পাতাঝরা চিনারের মাঝে পাথরে যেন প্রাণের খোঁজ পেলাম - হাজার বছরের পুরনো গল্পকথা তারা যেন শোনাচ্ছে কানে কানে - একসময় এখানেও নিয়মিত পুজো হত - জনসমাগমে ভরে উঠত মন্দির প্রাঙ্গণ। সময়ের কালচক্রে সবই আজ ইতিহাস। ধ্বংসস্তুপে বসে প্রাণের অস্তিত্বের কল্পনা - বড় অদ্ভুত এই অনুভব মনের মধ্যে জারণ করতে ভাললাগে আমার। মূক পাথরের চাঁইগুলির বুকের গভীরে জমে থাকা কথা কেউ শুনতে পায়না অথবা শুনতে চায়না।

ডাক শুনে সম্বিত ফিরল। দুই পাঞ্জাবী ট্রাক ড্রাইভার, কারফিউতে চারদিন ধরে এখানেই আটকা পড়ে রয়েছেন। দুজনের একসঙ্গে মোবাইলে ছবি তুলে দেওয়ার অনুরোধ করলেন। ছবি তুলে ওদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলাম। কিন্তু ইতিহাসের গল্পে তাদের কোনো আগ্রহ নেই, অপেক্ষা শুধু কারফিউ ওঠার। মোবাইলে পাঞ্জাবী গান বেজে ওঠে, আমিও হাঁটা দিলাম ফেরার পথে।

আব্দুল চাচা গাড়িতে বসে উর্দূ কাগজ পড়ছিলেন একমনে, আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "ক্যায়সা লাগা বেটা? পাথরমে জান কো মেহসুস কিয়া?" বললেন, সামনেই আরেকটি মন্দির আছে, সেটা আরও বড়। গাড়ি চালু করার সঙ্গে সঙ্গেই পৌঁছে গেলাম পরবর্তী মন্দির প্রাঙ্গণে - অবন্তীস্বামী মন্দির।

এটিও নবম শতাব্দীতে রাজা অবন্তীবর্মণ নির্মিত - বিষ্ণুর মন্দির। এখন শুধু পাথরের ভগ্নস্তুপ। তবে প্রথমেই চোখে পড়ল কালো পাথরের ধ্বংসস্তুপের পাশেই একটি ধবধবে সাদা মসজিদের সহাবস্থান - মনটা ভালো হয়ে গেল। অবন্তীস্বামী মন্দির চত্তুরটি আগের মন্দিরটির থেকে অনেকটাই বড়। পাথরের তৈরি বিশাল প্রবেশপথ। চারপাশে পাথরের বেষ্টনী। ভেতরে ঢোকার আগে বেষ্টনীটি ধরেই প্রথমে একবার মন্দির প্রদক্ষিণ করলাম। মন্দিরের গায়ের কারুকাজ এখনও অক্ষত রয়েছে অনেকটাই। কোথাও ভাঙা পাথরের টুকরো বসানো রয়েছে। এখানেও যেন পাথরে প্রাণের পরশ। মন্দিরের গায়ে পাথরের ভাস্কর্য। কিন্তু ভেতরটা যেন খণ্ডহর - ইতস্তত ছড়ানো পাথরের স্তুপ। মাঝের মূল মন্দিরটি বুঝে নিতে অবশ্য অসুবিধা হল না - সামনে বড় একটা পাথরের বেদী - আর তার কিছু স্মৃতির কণা রূপে পাথরের টুকরো রোদে-জলে ভিজে টিঁকে আছে। হাজার বছর পুরনো ইতিহাসের পাতায় ডুব দিয়ে ছবি তুলতে তুলতে ঘুরতে লাগলাম। হঠাৎ ক্যামেরার ব্যাটারি শেষ, বাড়তি ব্যাটারি গাড়িতে। আপনমনেই বলে ফেললাম - এখানেই ছবির ইতি। পাশ থেকে এক জওয়ান বলে উঠলেন, 'বাঙালি নাকি?' সেও আসলে বাঙালি। আসামের সেই জওয়ানটি সুদূর ভূস্বর্গ কাশ্মীরের প্রহরার গুরুদায়িত্ব পালন করছে। হাল্কা দু-একটা কথা হল - অন ডিউটিতে অচেনা মানুষের সঙ্গে মুখে কথা বলা বারণ - কথা বলে শুধু বন্দুক।

মন্দির থেকে বেরিয়ে আসতে আবদুল চাচা রাস্তার ওপারে যেতে বললেন। ওপারে রাস্তার গা ঘেঁষে বইছে ঝিলাম। ঝিলামের ধারে বসে রয়েছেন কয়েকজন জওয়ান - এরকম দিনে ট্যুরিস্ট দেখে অবাক - আবার আরেকপ্রস্থ জিজ্ঞাসাবাদ - তবে কথা বলার পর উৎসাহ দিলেন সাহসের জন্য। সেনা ছাউনির ছবি তোলা নিষেধ তাই ক্যামেরা ঝিলমের দিকে ফেরালাম। কিন্তু থমকে গেলাম আবদুল চাচার কথায় - "ঝিলম মে আজ সির্ফ লহু বহতা হ্যায়।" - শাটার টিপতে পারলাম না। ফিরে এলাম গাড়িতে। স্বর্গের খোঁজে এসে আজ অনেককিছুই বুঝলাম - স্বর্গ যেন হারিয়ে গেছে - আফস্পার চক্রব্যূহে - রাজনীতিবিদদের স্বার্থের ছায়াতে - প্রতিবেশী দুই ভাইয়ের নিত্য বিবাদে।

কিছুটা পথ চলার পর চোখে পড়ল পথের পাশে পাহাড়ের কোলে সবুজ মাঠে হলুদ ফুলের মেলা - গাড়ির থেকে নেমে দাঁড়ালাম। রাস্তার পাশে সবুজ ঘাসের ওপর বসে পড়লাম, ভারী ভালোলাগল। আবদুল চাচা পাশে এসে বসলেন। আপন মনেই বলতে শুরু করলেন ভূস্বর্গের দুঃখের কথা। গাড়ি নিয়ে বেরোনোর সবচেয়ে বড় সমস্যা পাথর ছোঁড়া। এই বিপজ্জনক খেলায় মেতেছে বর্তমান যুব সম্প্রদায়ের একাংশ। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভুল পথে তাদের চালনা করে কিছু স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক নেতা, কোথাওবা প্রশাসনের কোনো উচ্চপদস্থ আমলা। এইসব যুবকেরাই হয় কূটনীতিয় দাবার ঘুঁটি - পাথর ছোঁড়া, তারপর পুলিশের খাতায় নাম ওঠা, তারপর পুলিশের চরবৃত্তি করার লোভনীয় প্রস্তাব - জ্বলবে কাশ্মীর। এর লোভে স্কুল ছেড়ে দিয়ে দলে দলে ছেলেরা এই পথে আসছে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে গাড়ি, আরোহীদের জীবনহানির আশঙ্কা থাকছে, পর্যটকেরাও বাদ পড়ে না এই আক্রমণ থেকে। এক এক করে পর্যটকেরাও আর ভূস্বর্গে ফিরে আসে না - বুলবুল গান গায় না - ঝিলমের জলে রক্তের রঙ - ভূ-স্বর্গের আকাশের সূর্য মুখ ঢেকেছে কালো ধোঁয়ায়, কাঁটাতারে বিছানো স্বর্গের রাস্তা, কারফিউ আর বন্ধের জেরে মার খায় পর্যটন - হাজার হাজার কাশ্মিরীদের রুটিরুজি।

শুনতে শুনতে বিষাদ বাড়ছিল মনের গভীরে - কে যেন আমার ভিতর থেকে বলে উঠল চাচাজানকে - আজ একটা চেষ্টা করে দেখা যায় না, যদি এই কারফিউতে বেরিয়ে যুশমার্গ ঘুরে আসি। সেটা শুনে কাল হয়তো পাঁচটা গাড়ি বের হবে, পরশু পঞ্চাশটা - তার পরেরদিন হয়তো কারফিউ প্রত্যাহারই হয়ে যাবে। একটা শুরু করেই দেখা যাক না...।

কথাটা শোনার পর পুরো এক মিনিট চুপ করে থাকলেন আবদুল চাচা। তারপর ধীরে সুস্থে উঠলেন। চল বেটা, এই সৎ ইচ্ছাকে আল্লাহ্ পুরা করবেন আজকে। চল বেটা, যাব যুশমার্গ, যা হয় হবে, যদি আল্লাহ্ কাশ্মীরকে জন্নত দেখতে চান, আজ আমরা পারব। আবেগে চোখে জল চলে আসে চাচাজানের, আমারও। আজ আমরা পারলে কাশ্মীর জিতবে। আতঙ্কের ওপর জিতবে ভূস্বর্গের সৌন্দর্যের টান। গাড়ি চালু হল। পাশের পেট্রোল পাম্পে গিয়ে ট্যাঙ্ক ভর্ত্তি করলেন চাচা। একটু এগিয়ে আবার গাড়ি দাঁড় করালেন। বললেন, যাওয়ার পথে দুটো জায়গায় সমস্যা হতে পারে - পাখর পোরা - ওখান একটা বড় দরগা আছে, আর চারার-এ-শরিফ। পাখর পোরায় অনেক লোকের জমায়েত হবে, বিরোধী দলের উগ্র মনোভাবাপন্ন লোকেরাও থাকবে - আজকের মতো বন্‌ধের দিনে সেটা একটা বিপদের জায়গা। বন্‌ধের দিনে চারার-এ-শরিফ জায়গাটাও বিশেষ সুবিধার নয়। তবে মুশকিল আসানও চাচাই করলেন। বললেন, কেউ গাড়ি দাঁড় করালে যেন যুশমার্গের কথা না বলি, বলি দরগায় যাব, কলকাতা থেকে দরগা দেখতে এসেছি বললে কেউ আটকাবে না। এটুকু মিথ্যে তো বলাই যায় - নেক্ কাজে এটুকু ছলনা আল্লাহ্ পাক নিশ্চয়ই মাফি দেবেন। এবারে সত্যিই অবাক হয়ে গেলাম। আমার উৎসাহে এই বনধের দিনেও এত বড় একটা ঝুঁকি নিতে শুধু যে এককথায় রাজি হয়ে গেলেন তাই না তার ওপর এই অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা - শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে এল। বললাম, মিথ্যা নয়, সত্যিই আমি ওই দুটি দরগাতেই যাব মাথা ঠেকাতে। আল্লাহ্‌র নাম করে আবার গাড়িতে স্টার্ট দিলেন আবদুল চাচা।

বড় রাস্তা ছেড়ে বাঁদিকের একটা রাস্তা ধরলেন এবার। ঘুরপথে পাখর পোরা, চারার-ই-শরিফ হয়ে যুশমার্গ পৌঁছান যায়। তবে আবদুল চাচা এই পথে অনেক বছর পরে এলেন। তাই একটু খেয়াল রাখতে বললেন সাইন বোর্ডের দিকে। ইংরেজি পড়তে পারেন না চাচা। শুনশান রাস্তা - একপাশে রুক্ষ্ম পাহাড় - অন্যদিকে পাতাঝরা রুক্ষ্ম গাছের ডাল - টানা আপেলের বাগান। সূর্য তখন রাস্তার ডানদিকের পাহাড়ের আড়ালে - ছায়া নেমে এসেছে পথে। চশমা ঠিক করতে করতে আবদুল চাচা বললেন, বেটা আমার চোখের দৃষ্টি কিছুটা ঝাপসা - রাস্তার দিকে খেয়াল রাখনা। কোনো খানাখন্দ বা স্পিড ব্রেকার এলে জানাতে - গাড়িটাকে নিজের সন্তানের মতোই স্নেহ করেন যে। শুনসান রাস্তা - কোনো গাড়ি চোখে পড়ছে না। মাঝে মাঝে ছোট দু-চারটি ঘরের বসতি, কিন্তু পথে জনপ্রাণী নেই। বেশ কিছুটা যাওয়ার পর চোখে পড়ল এক বৃদ্ধ আর হয়তো তার নাতি লাঠিহাতে ভেড়ার পাল নিয়ে চলেছেন। আবদুল চাচা জিজ্ঞাসা করে এবার নিশ্চিত হলেন যে এটাই পাখর পোরা যাওয়ার রাস্তা। কিন্তু উল্টোদিক থেকে যেহেতু কোন গাড়িই আসছেনা তাই চিন্তার রেখা বাড়ছে চাচাজানের মুখে - পাখর পোরার অবস্থা ঠিক কী সেটা আন্দাজ করতে পারছেন না। এরপর শুরু হল চড়াই পথ ওঠা। রুক্ষ্ম হলেও অসামান্য সুন্দর এই পথ। একপাশে আপেল - আখরোটের গাছ। আখরোট গাছে ফুল ধরেছে - সোনালি - অপরূপ তার শোভা। ঠিক এইসময় দুধের ক্যান বহনকারী ম্যাটাডোর দেখা গেল উল্টোদিকে। রাস্তার হাল মোটামুটি নিরাপদ খবর পেয়ে এবার গাড়ি ছোটালেন চাচা। আমি কিন্তু নজর রেখেছি রাস্তার দিকে - খানাখন্দ দেখলেই আগাম সতর্ক করছি। একই সঙ্গে চোখ যাচ্ছে চারপাশের প্রকৃতির দিকে - বাদাম গাছে আসা নতুন গোলাপি ফুল যেন নতুন আশার আশ্বাস জাগাচ্ছে। একটু এগিয়ে একটা মোড় পড়ল। সাইনবোর্ড দেখে ডানদিকে বাঁক নিল গাড়ি। খানিক পরে একটা আধা শহর শুরু হল। কিছু লোকজনও চোখে পড়ল। পৌঁছে গেছি পাথর পোরা। সামনেই বেশ বড় একটা দরগা। সদ্য নামাজ পড়া শেষ করে দল বেঁধে মানুষ বেরিয়ে আসছে - একেবারে গ্রাম্য কাশ্মীরের রূপ। গাড়ি থেকে নেমে দরগার দরজায় মাথা ঠেকিয়ে আবার ফিরে এলাম। পাখর পোরার কাশ্মীরিদের দল নামাজ পড়ার পর পতাকা আর উর্দুতে লেখা কিছু কাগজ নিয়ে মিছিল শুরু করেছে। সামনে দু-তিনজন পাখতুন ভাষাতে কিছু স্লোগান দিচ্ছে। বাকিরা গলা মেলাচ্ছে যে কথাটায় তার মানে অন্তত জানি - 'আজাদি'।

কালো ফিরহান পরিহিত, জনা পঞ্চাশেক গ্রাম্য কাশ্মীরি নামাজ পড়ার পর রাস্তা জুড়ে মিছিলে সামিল হয়েছে আজাদির দাবীতে। আমার মতো ভিনদেশীকে দেখে যেন তাদের যোশ আরও বাড়ল। আবদুল চাচা জুম্মার নামাজ পড়তে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে হাত ধরে টেনে আমাকে গাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে নিলেন। গাড়ি স্টার্ট করল। কিন্তু সামনে যে আজাদ কাশ্মীরের দাবিতে বড় মিছিল। হয়তো একটু অপেক্ষা করলেই রাস্তা ফাঁকা হয়ে যেত, কিন্তু প্রবীণ, বিচক্ষণ আবদুল চাচাও ভুল করে ফেললেন। রাস্তা ফাঁকা করবার জন্য দুবার হর্ণ বাজিয়ে। মুহূর্তের জন্য স্লোগান থেমে গেল - কয়েকজন তেড়েও এল। কয়েকজন স্থানীয় ভাষায় তীব্র সুর চড়িয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করল। মনে হল দেখলাম জনা দুয়েক রাস্তা থেকে ঢিল কুড়াচ্ছে। হঠাৎ করেই ভয় পেয়ে গেলাম। মনে হল শেষে কি তবে আজ ভয়েরই জিত হবে? আবদুল চাচা গাড়ির দরজা খুলে ওদের দিকে তাকিয়ে ওখানকার ভাষায় কী যেন চেঁচিয়ে বললেন। যতদূর বুঝলাম বলছেন, সুদূর কলকাতা থেকে এক খুদা কী বান্দা এসেছে দরগা দেখতে, খুদা কে বাস্তে শান্ত হতে। গুপি-বাঘার গান শোনার মতো সকলে পলকে যেন স্থবির হয়ে গেল। সামনে থেকে নেতাগোছের দুজন এগিয়ে এসে সবাইকে সরিয়ে পথ খালি করে দিলেন। কুর্নিশ জানালাম সবাইকে - সরল মানুষ, ধর্মপ্রাণ মানুষ - আজাদি হয়তো দাবি - ঠিক বা ভুল যাই হোক তাঁরা মানুষ - তাঁদের হৃদয় মানুষেরই - এঁরা কেউ উগ্রপন্থী নন। এগিয়ে চলল গাড়ি।

পাথরপোরা পেরিয়ে দুজনেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। দুজনেই একসঙ্গে কপালের ঘাম মুছলাম। আর সাময়িক উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যেতে যেতে হঠাৎ দুজনেরই মনে পড়ল সকাল থেকে কিছু না খেয়েই দৌড়ে যাচ্ছি। খিদেতে পেটে ছুঁচো নয়, আস্ত খরগোশ লাফাচ্ছে। কিন্তু খাবার পাব কোথায়? শুনশান রাস্তা, মাঝে খুব ফাঁকায় ফাঁকায় দু'চারটে বাড়ি। অনেকটা দূরে গিয়ে একটা ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যাওয়া দোকানও চোখে পড়ল। আরও বেশ কিছুটা গিয়ে চারার-ই-শরিফ পৌঁছনোর ঠিক আগে একটা খোলা দোকান চোখে পড়ল - আমিই খেয়াল করে চাচাকে গাড়ি থামাতে বললাম। দোকানে ঢুকে দেখি এক বৃদ্ধ কাশ্মীরি তাঁর নাতনির সঙ্গে খেলা করছেন। এমন দিনে এমন সময় ভিনদেশি খরিদ্দার দেখে বিস্মিত হলেন। সামান্যই জিনিস। মুদিখানার দোকান। দু'প্যাকেট বিস্কুট নিয়ে নিলাম। দুটো আপেল। ওদের অনুরোধে কিছু আখরোটও। গাড়ি থেকে নেমে রাস্তার ধারে বসে এক প্রবীণ কাশ্মীরি ও কলকাতার যুবক একসঙ্গে আপেল, আখরোট খাচ্ছে এটা যেকোন ছবিশিকারীর কাছে হয়তো ভালো বিষয়বস্তু হতে পারত। অথচ এখানে যুবকদের হাতে ক্যামেরার বদলে পাথর থাকে। সৌন্দর্য বোঝার দৃষ্টির পুরস্কারের বদলে এরা আফস্পার কাছে দাবী করে 'আজাদি'।

আবার চলা শুরু হল - সামনেই চারার-ই-শরিফের মোড়। যেখানে হয়তো আবার মিছিলের মুখে পড়তে হতে পারে এ আশঙ্কা ছিল। কিন্তু দেখলাম বেশ শুনশানই রয়েছে, পেরিয়ে এলাম নির্ঝঞ্ঝাটেই। রাস্তার দুপাশে এখন বরফের চিহ্ন। যত এগোচ্ছি রাস্তার দুপাশের শুভ্র আবরণ আরও পুরু হচ্ছে। অবশেষে বরফে ঢাকা যুশমার্গ উপত্যকায় পৌঁছলাম। চারিদিক শুনশান। আকাশে মেঘের ঘনঘটা। চারপাশ তুষারশুভ্র। জম্মু-কাশ্মীর ট্যুরিজমের সবুজ রঙের বাংলো। হাওয়ায় বাংলোর সামনের পতাকা উড়ছে। কিন্তু বরফ প্রান্তর একেবারে নিষ্প্রাণ। শুনেছিলাম এখান থেকে ঘোড়ায় সওয়ারি হয়ে দুধগঙ্গা যাওয়া যায়। কিন্তু কোথায় কী! রিসর্টের দরজায় তালা। আশেপাশে একটু ডাকাডাকি করে কারোর সাড়া না পেয়ে বরফ ডিঙিয়ে কিছুটা ভিতরে খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে দেখি একটা কটেজের সামনে এক কাশ্মীরি বৃদ্ধ ও এক যুবক পাতা জ্বালিয়ে আগুন পোহাচ্ছেন, চলছে হুঁকোয় টানও। আমাকে দেখে খুব অবাক হলেন। পুরো যুশমার্গে কোনো ট্যুরিস্ট নেই - কারফিউয়ের দিনে বিকেলে ট্যুরিস্ট আসা সত্যিই অপ্রত্যাশিত। তাঁরা এগিয়ে এলেন। যুশমার্গের বরফ উপত্যকা ঘুরে দেখব - দুধগঙ্গা নদী, নীলনাগ লেক দেখতে চাই, ঘোড়া হলে ভালো হয়। হেসে ফেললেন প্রৌঢ় কাশ্মীরি, আফজল চাচা তাঁর নাম। এই বরফের দিনে, এই অশান্তির দিনে পর্যটকের অভাবে ধুঁকছে নিরালা উপত্যকা। বড়ই নির্জন এই বরফ উপত্যকা - ঘোড়া থাকবে কী করে? কোনো গাইডও নেই। তবে তিনিই আমাকে আজকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসতে পারেন। বিকেল হয়ে এসেছে আজ যুশমার্গের বরফ উপত্যকা ঘুরে দুধগঙ্গা অবধি গিয়ে ফিরে আসতে পারি। কিন্তু আজ নীলনাগ লেক যাওয়া সম্ভব নয়। তারজন্য এখানে একদিন থাকতে হবে। ঘরতো সবই খালি - কাতর নিমন্ত্রণ যেন। মনখারাপ লাগলেও বাস্তবে তা সম্ভব নয়, কালকের ফ্লাইটেই ফেরার টিকিট রয়েছে। অগত্যা দুধগঙ্গা ঘুরে আসাই ঠিক হল। টাকার কথা জিজ্ঞাসা করতেই আফজল চাচা হেসে ফেললেন - পর্যটকের পায়ের ছাপ পড়াটাই কিসমত - টাকা? তা যা ইচ্ছা দিলেই হবে।

আফজল চাচা একটা গাছের ডাল নিলেন আর একটা আমার হাতে দিলেন। দুজনে পা বাড়ালাম বরফ উপত্যকায়। আবদুল চাচা এবার আগুন পোহাতে আর হুঁকোতে আয়েশের টান দিতে বসলেন। আমাকে গন্তব্যে পৌঁছে দিয়ে তাঁর মুখের সেই পরিতৃপ্তির রেখা আমার মনে থাকবে আজীবন। আজকে আমরা কারফিউকে হারিয়েছি - আতঙ্কের ওপর জয় হয়েছে ভালোলাগার, ভালোবাসার। এইসবই যেন ভূস্বর্গে প্রাণের স্পন্দন ফেরার ঈঙ্গিত - নতুন পাতা আসার অপেক্ষা শুকনো চিনারের ডালে।

বরফের চাদর বেশ পুরু, ঝুরঝুরেও। মাত্র দুদিন আগেই তুষারপাত হয়েছে। লাঠিটাকে বরফে গেঁথে তার গভীরতা বোঝার চেষ্টা করতে করতে আফজল চাচার পিছু পিছু চললাম, তুষাররাজ্যে পাড়ি দিলাম। প্রথমেই হল পদস্খলন - নরম বরফে বাঁ পায়ের প্রায় সবটাই ঢুকে গিয়ে বেসামাল হয়ে পড়লাম। চাচা হাত বাড়ালেন, উঠে দাঁড়ালাম সেই হাত ধরে। উনি এবার বললেন ওনার পায়ের ছাপে পা রেখে এগোতে। সেইমতোই এবার পা ফেলে এগোলাম। বরফে মোড়া সোনমার্গ আর গুলমার্গ তো ইতিমধ্যেই দেখে এসেছি, তবে এই যুশমার্গ যেন একটু আলাদা। গল্পকথায় বলে যিশু খ্রিস্টের পায়ের ছাপ পড়েছিল এখানে। তাই বোধহয় এত শান্ত, এত পবিত্র। আপাতত অবশ্য প্রভু যিশু নয়, আমি পদচিহ্ন অনুসরণ করছি আফজল চাচার। উপত্যকার যত গভীরে যাচ্ছি বরফ ততো বাড়ছে - আফজল চাচা বললেন, আকাশের অবস্থা বলছে আজও শেষ বিকেলে তুষারপাত হতে পারে। এরকম চলবে আরও হপ্তাদুয়েক। শুনশান বরফ উপত্যকায় মাঝে মাঝে পাহাড়ি ঈগলের ডাক প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। সাদা বরফের মাঝে মাঝে সবুজ রঙের ট্যুরিস্ট কটেজ। যেতে যেতে চোখে পড়ছে বরফের মাঝে বাগান, জমাট বাধা নদীর ওপর বাহারি সাঁকো। কোথাও ক্যাফেটেরিয়া, কোথাওবা স্মারক বিক্রির দোকান - সবই অর্ধেক বরফের নীচে। দূরে নজরে আসছে পাথর-কাঠের জিপসিদের ঘর। ফুলের মরসুমে তাদের দল আবার ফিরবে ঘোড়া নিয়ে। পর্যটকদের যুশমার্গে ফিরে আসার অপেক্ষায় দিন গুনছেন আফজল চাচা। মিঃ নটবরলাল সিনেমাতে শুটিং-এর সময় গানের এক অংশে নাকি তাঁকেও দেখা যায়। কত জমজমাট ছিল সেই দিনগুলি - অমিতাভ দাঁড়িয়ে ছিল দু'হাত দূরেই - তাঁর গলায় রোমাঞ্চ - তা আবার অবসাদে ফিরে আসে কিছুক্ষণের মধ্যেই। এখন পর্যটকেরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে কেন কে জানে! মরসুমে এক রাতের জন্য কিছু পর্যটক আসে, বিদেশিরা এলে হয়তো কিছুদিন কাটিয়ে যান। কিন্তু যুশমার্গ যেন কাশ্মীরের দুয়োরানি - কথা বলতে বলতে বরফ প্রান্তর পেরিয়ে এলাম পাইন-বার্চের জঙ্গলের মধ্যে - পাশে বেশ গভীর খাদ - সেখান দিয়েই জল বয়ে যায় - খরস্রোতা এখন হিমেল - খুব সাবধানে ডানপাশের খাদের অস্তিত্ব খেয়াল রেখে অজানা বরফের আস্তরণে পা ফেলতে হচ্ছে - বেসামাল হলেই সমূহ বিপদ - এভাবে হাঁটুর ওপরে বরফের আবরণ ডিঙোতে

হাঁফ ধরছে - তবে রোমাঞ্চ পুরোদম। একটা সময় চোখে পড়ল দুধগঙ্গার চারপাশে পাথরে বরফের ছাপ। মাঝখানে ক্ষীণস্রোতে বইছে সে - কাছে গিয়ে তাকে ছুঁয়ে দেখার বড় ইচ্ছে করছিল। কিন্তু এখানে বরফ প্রায় তিন-চার ফুট গভীর। আলগা পাথরে পা পড়লে মচকে যেতে পারে। আবার অনেক জায়গা দিয়েই জলের ধারা বইছে। দুধগঙ্গায় মিশেছে তারা - এখন তাদের ওপর বরফ আস্তরণ। পায়ের চাপে তা ভেঙে গেলে অনিবার্য বিপদ। তা সত্ত্বেও আমার উৎসাহ দেখে আফজল চাচা এগোতে লাগলেন। একটা জায়গায় দ্রুত লাফিয়ে চিহ্ন দেখালেন - দূর থেকে দেখলাম বরফের পাতলা আস্তরণের নীচ দিয়ে জল বইছে। প্রায় লাফিয়ে পার হওয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পায়ের চাপে বরফের আস্তরণ ভেঙে সেই বিপদ ঘটল। বাঁ পাটা নীচে চলে গেল জলের ভেতর, ডান পা দিয়ে প্রাণপণে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করছি। তবে আওয়াজে বুঝতে পারছি পায়ের তলায় বরফে ফাটল ধরছে। আফজল চাচা দ্রুত আমার হাত ধরে টেনে তুলেই এক ধাক্কায় সামনে ফেলে দিলেন। বরফের চাঙড় থেকে বেশ কিছুটা দূরে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। বরফে গড়াগড়ি খেয়ে আমার সারা শরীর বরফ সাদা। আর হাঁটু অবধি বরফ, জুতোর ভিতর জল থই থই, প্যান্ট পুরো ভিজে। বেশ করুণ অবস্থাই। একটা উঁচু পাথরে বসে জুতো খুলে উলটে জল ঝরতে দিলাম। পা ঝাড়ছি, ভিজে জিনস, শরীর ঝাড়ছি। ঠাণ্ডায় সব অবশ হয়ে আসছে। তবে এই সফেদ উপত্যকায় সবুজ ঘন পাইন-বার্চের মাঝে খরস্রোতা দুধগঙ্গার বয়ে চলা - পড়ন্ত বিকেলের আলোর আভায় - যেন স্বপ্নলোক নেমে এসেছে।

পাথরের ওপরে বসেই আফজল চাচার সঙ্গে গল্প জুড়লাম - শুনতে লাগলাম কাশ্মীরের কথা - যুশমার্গের কথা - আশার কথা - চিনারের নতুন পাতার আশা - বুলবুলের ফেরার আশা - পর্যটকদের কলরবে নিরালা উপত্যকা মুখরিত হওয়ার আশার কথা। হঠাৎ শুনি গুরুগম্ভীর আওয়াজ - ধ্বনি-প্রতিধ্বনি। খেয়াল করে দেখি আকাশে মেঘ কালো করে এসেছে - এ যেন সাবধান বাণী - ফিরে যেতে বলার ঈঙ্গিত। উঠে পড়লাম। ক্ষণিকের আলাপেও যুশমার্গের সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক গড়ে উঠল। ভিজে জুতোয় পা গলিয়ে হাঁটুর ওপর অবধি বরফে চলা বড়ই কঠিন। লাঠিটা বেশ কাজে লাগছে এবার। আর অবিরত নির্দেশ দিয়ে চলেছেন আফজল চাচা। খাড়া চড়াইয়ের সময় হাত ধরে টেনে তুলছেন। পথ চলতে চলতে জঙ্গল থেকে গাছের পাতা ছিঁড়ে ফিরহানের পকেটে পুড়ছেন। আমাকেও দু'এক ধরণের পাতা দিলেন। ইউনানি চিকিৎসার মূলমন্ত্র এই পাতাগুলো। ঔষধি গুণ সম্পন্ন এইসব পাতা যুশমার্গ থেকে সংগ্রহ করতে আসেন ইউনানি চিকিৎসকেরা। আমার ভিজে বেড়াল হালত দেখে চাচা আমাকে সর্দিজ্বর সারানোর আর গা গরম রাখার ঔষধি দিলেন। কীভাবে খেতে হবে তাও বলে দিলেন। কথায় কথায় জঙ্গল পেরিয়ে আবার ফিরে এলাম বরফ উপত্যকায়। গাঢ় রঙের আকাশের ছায়া বরফের ওপর পড়ে রহস্যময় এক সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে। কালো আকাশ, সফেদ যুশমার্গ, দুপাশে ঘন সবুজ পাইনের সারি, সবুজ রিসর্টগুলোর পাশ দিয়ে রঙিন পতাকাগুলো উড়ছে।

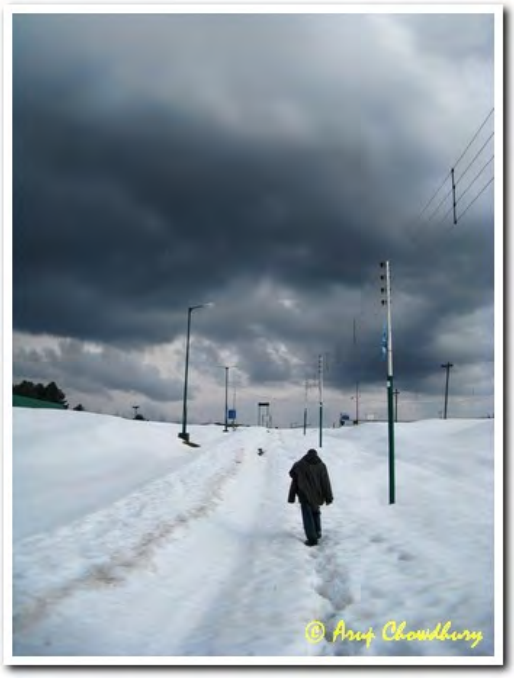

আমার সামনে সামনে হেঁটে চলেছেন কালো ফিরহান পরিহিত এক প্রবীণ কাশ্মিরী। মনের ক্যানভাসে এ ছবি চিরকালীন হয়ে থাকল। আকাশের গর্জন বাড়ছে। অবশ পা দুটোকে যত তাড়াতাড়ি পারি টেনে নিয়ে চলেছি। দৌড়তেই হচ্ছে রীতিমতো। বৃষ্টি থামলেই তুষারপাত শুরু হবে। আর এই নির্জন প্রান্তরে সেটা খুব উপভোগ্য হয়তো হবে না। আফজল চাচার কটেজে পৌঁছে দেখি আবদুল চাচা কাঠের আগুনে হাত সেঁকছেন। ভেজা জুতো খুলে খালি পায়ে আগুনের গরম সেঁক নিয়ে তাতে সাড়া এল। আবদুল চাচা বেরোনোর তাড়া লাগালেন - বরফ পড়া শুরু হলেই আটকে পড়ব। অগত্যা হাঁটু অবধি ভিজে প্যান্ট গুটিয়ে, হাতে জুতো নিয়ে বৃষ্টির মধ্যেই দৌড়ে গাড়িতে। বিদায় নিলাম আফজল চাচার কাছে। তাঁর হাতে দুশো টাকা দিতেই মুখে যেন আলো জ্বলে উঠল - মন ভরে গেল আমার। আবার আসতে বললেন আমায় - হাতে কয়েকদিন সময় নিয়ে - অনেককিছু দেখা বাকী রয়ে গেল যে - নীলনাগ লেক, ফ্রেশনাগ, হালজান, বরগাহ্, লিডর মাড, ত্রিপুর, সঙ্গ-সফেদ কত ট্রেক রুট...। আবার ফিরে আসব - কথা দিয়ে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে গাড়িতে ঢুকে পড়লাম।

হিটার অন করে গাড়ি স্টার্ট দিলেন আবদুল চাচা। ঝমঝম বৃষ্টি আছড়ে পড়ছে উইন্ডস্ক্রিনে। 'ইনশাল্লাহ্' বলে হেডলাইট জ্বালিয়ে গাড়ি ছোটালেন চাচা - যেন অন্য এক মানুষ এখন। সকালের সাবধানী প্রবীণ মানুষটি সারাদিনের সব বাধা-বিঘ্ন পেরিয়ে সবশেষে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াইয়ে যেন ফিরে গেছেন তাঁর যৌবনকালে। স্পিডোমিটারের কাঁটা নড়াচড়া করছে ষাটের আশেপাশে। ওয়াইপারের আঘাতে উইন্ডস্ক্রিন থেকে ছিটকে যাচ্ছে বরফের টুকরো। সফেদ যুশমার্গে নেমে আসছে তুষারের নতুন পরশ। যেন সত্যিই প্রভু যিশুর উপত্যকা - নির্জন, শান্ত, স্বপ্নসুন্দর। স্বপ্নরাজ্য এখন শুধু রিয়র ভিউ মিররে ছুটে চলেছে পিছনের দিকে।

দিনের বেলায় যে প্রবীণকে আমি রাস্তার খানাখন্দ সম্পর্কে সতর্ক করছিলাম সন্ধ্যার প্রায় অন্ধকারে তুষারপাতের ভিতর দিয়ে তার এরকম গতিতে দক্ষ ড্রাইভিং দেখে স্তম্ভিত আমি। ওনাকে কথাটা বলতে, স্মিত হেসে বললেন, 'তাজুর্বা'। তারপর তুষারপাতের সঙ্গে দৌড়ের এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার সওয়ার হলাম - নির্জন পাহাড়ি সর্পিল রাস্তা - পাশের সাদা বাগিচায় পাতাহীন গাছ - শেষ বেলায় গোধূলির আভা, আলো-আঁধারি, সাদা চাদরে মুড়ি দিয়ে রাতঘুমের প্রস্তুতি নিচ্ছে প্রকৃতি - আর তারই মাঝখান দিয়ে দ্রুত গতিতে ছুটে চলেছে আমাদের সফেদ বাহনটি।

চারার-ই-শরীফে পৌঁছাতে পৌঁছাতে বৃষ্টি কমে এল, তুষারপাতও থেমে গেল। দরগায় যাওয়ার আন্তরিক ইচ্ছে থাকলেও সন্ধ্যে নেমে এসেছে, আর কারফিউ-এর এই থমথমে পরিবেশে বারনই করলেন চাচা। তোলা রইল পরের বারের জন্য। গাড়িতে বসেই দুজনে মাথা নত করে প্রার্থনা সেরে নিলাম। গাড়ি আবার ছুটতে শুরু করল।

রাস্তা আরও শুনশান - বৃষ্টি থেমে আকাশও পরিষ্কার হচ্ছে। আকাশ জুড়ে সূর্য ডোবার পালা দেখতে দেখতে গোধূলির রঙ মেখে নামছি আমরা। দূরের বরফ সাদা পাহাড় আর রাস্তার কোলঘেঁষা গাছে গোলাপি বাদামের ফুল যেন আমাদের এই যাত্রার সঙ্গী। আবদুল চাচা এবার হাইওয়ে ধরলেন না। বসতির ভেতর দিয়ে পাড়ার রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চললেন। বললেন, হাইওয়েতে তো আর্মি চেকিং, প্রাণের স্পন্দন কাঁটাতার সেখানে সরিয়ে রেখেছে। লোকালয় দিয়ে গেলে কাশ্মীরের প্রাণের স্পন্দন বুকের গভীরে অনুভব করা যায়।

সন্ধ্যে নেমে এসেছে, রাস্তায় লোকজনের ভিড় বাড়ছে, দোকানপাটও অনেক খোলা। খালি চোখে দেখে সব স্বাভাবিকই লাগছে। আবদুল চাচা বলেন, এটাই কাশ্মীর। সবাই মূল স্রোতে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে চায়। কিন্তু উগ্রপন্থা তা হতে দেয় না। ভায়ে ভায়ে ঝগড়া - রাজনীতির কূটচাল - আফস্পা - সবাই যেন কাশ্মীরের টুঁটি টিপে ধরেছে - একটু স্বাভাবিক হলেই নেমে আসে চরম আঘাত। ভূস্বর্গে এসেও ঘরবন্দী পর্যটক - ঝিলমের জল লাল - বুলবুল ঘরে এসে বসে না। অথচ চিনারের নতুন পাতার মতন শান্ত স্বাভাবিক কাশ্মীরের অপেক্ষায় আশার দিন গোনেন আবদুল চাচারা। যেখানে কেউ ঢিল ছুঁড়ে ক্ষোভ জানাবে না, জানবে 'আজাদি'র প্রকৃত অর্থ।

গন্তব্যে পৌঁছে চাচার হাতে টাকা দিলাম। না গুনে পকেটে ঢুকিয়ে আমার হাতদুটো ধরে বললেন, আজ ভয়ের হার হয়েছে, কারফিউও আজ হেরেছে ভূস্বর্গের সৌন্দর্য প্রেমী এক পাগলের কাছে, কাল আবার হারবে, পরশু কারফিউ রদ হবে, ভূস্বর্গে ভয়ঙ্কর বলে কিছু থাকবে না, আজ আমরা জিতেছি, বেটা খুশ রহেনা, আল্লাহ্ হামেশা তুমহে সলামত রাখনা।

চোখ ভিজে উঠল - এমন দিন জীবনে রোজ রোজ আসেনা। পা বাড়ালাম ডাল গেটের দিকে। আমার সঙ্গীরা নিশ্চয় খুব চিন্তা করছে। আমার ঝুলিতে আজ অনেক কাহিনি - আবদুল চাচার গল্প, ভূস্বর্গে স্বর্গের সন্ধানের গল্প। হাঁটতে হাঁটতে কানে আসে ভারি বুটের আওয়াজ - ডাল গেটে বন্দুক নিয়ে টহল দিচ্ছে জওয়ানেরা। ...

~ কাশ্মীরের তথ্য ~ কাশ্মীরের আরও ছবি ~

অরূপ চৌধুরীর কথায় - মাইক্রোবায়োলজিতে ডিগ্রি ছিল, কিন্তু চার দেওয়ালে আটকে থেকে গবেষণা নয়, প্রকৃতির থেকেই শিক্ষা পেতে কাঁধে ক্যামেরা নিয়ে বেরিয়ে পড়া, অপরিচিত জায়গাতে গিয়ে নতুনকে চেনা, আবার খুব পরিচিত জায়গাতে গিয়েও অজানা কিছুকে খুঁজে পাওয়া হল নেশা। নতুন জায়গাতে গিয়ে সেই জায়গাটা চেনা, সেখানকার মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানো - এটাই যেন বেড়ানোর মূল উদ্দেশ্য। নতুন ভাষা, নতুন গান, নতুন খাবার - সব কিছুর আস্বাদ নেওয়া। পাশাপাশি ভালোলাগার মুহূর্তগুলোকে ফ্রেমবন্দী করা। এটাই আমি। এভাবেই আমি পথ চলছি বেড়ানোকে ভালোবেসে, বেড়ানোর জন্য ছুটি খুঁজে নিয়ে প্রতি মুহূর্তে।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

= 'আমাদের ছুটি' বাংলা আ. র্জাল ভ্রমণপত্রিকায় আপনাকে স্বাগত জানাই = আপনার বেড়ানোর ছবি-লেখা পা

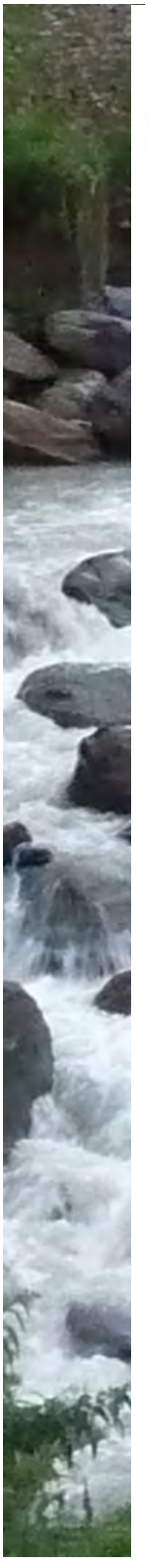

অন্য ভ্রমণ

ভ্রমণ তো বানিয়ে তোলা গল্পকথা নয়, মানুষের সত্যিকারের জীবনকাহিনি। আর তাই ভ্রমণ কাহিনি মনে শুধু আনন্দই এনে দেয় না, চোখের জল অথবা প্রতিবাদের ভাষাও জাগিয়ে দিতে পারে। ট্যুরিজম ইন্ড্রাস্ট্রির সহায়ক বিজ্ঞাপনী প্রচারমাধ্যম ছাড়াও ভ্রমণ কাহিনির বড় পরিচয় বিশ্ব সাহিত্যের একটি অন্যতম ধারা রূপেও। তেমনই কিছু 'অন্য ভ্রমণ' কথা।

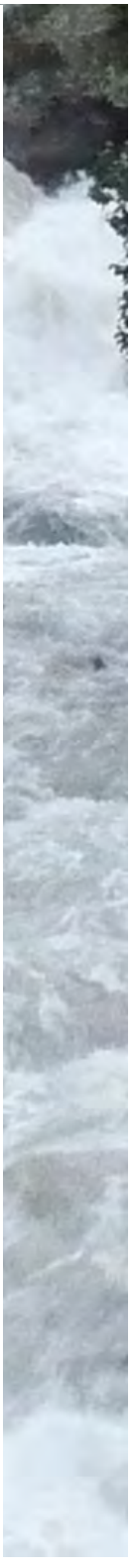

উত্তর খুঁজছে উত্তরাখণ্ড

কাঞ্চন সেনগুপ্ত

মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড দুর্ঘটনাচক্রে হারিয়ে ফেলা কি খুব অস্বাভাবিক? অন্য কোন পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ডকে এতটা গুরুত্ব পেতে দেখা যায় না! এ তো বার্থ সার্টিফিকেটের সমতুল্য! তাই শত ব্যস্ততা, ঝুট-ঝামেলার মধ্যেও সময় বের করে একবার যেতেই হোল মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অফিসে। আর সেখানেই হঠাৎ-ই খুব আচমকা ঘটনাটা ঘটল আমার সাথে... সেইদিনই! এতটাই আকস্মিক যে সামলানোর সময় পেলাম না বিন্দুমাত্র!
অফিসে ঢুকেই কপালগুণে এমন দুজনকে পেয়ে গেলাম যাঁরা আমায় বিস্তারে বুঝিয়ে বলে দিচ্ছিলেন 'কী করনীয়'। যেমন লোকাল থানায় ডায়েরি, একটা অ্যাপ্লিকেশন ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব জায়গা মত জমা-টমা দিয়ে অপেক্ষা, প্রায় মাস-দেড়েক কম করে, তারপর স্কুল থেকে ... ঠিক এই সময়েই দুই সদাশয় মহাশয়ের একজন আলটপকা স্কুলের নামটা জানতে চাইলেন, তারপর জায়গার নাম, আর তারপরই বললেন, "স্কুলে একবার খোঁজ নিয়ে নেবেন, ওখানেই চলে যাবে ডুপ্লিকেটটা"। তৎক্ষণাৎ আমার ভেতর থেকে ফস্ করে বেরিয়ে এল, "স্কুলটা তো আর নেই"! শব্দগুলো যেন ডুক্‌রে উঠল তড়িঘড়ি! নিজেও খানিক ভেব্‌লে গেলাম। কতকাল হয়ে গেল স্কুলটা বন্ধ ... নানা কারণ, সেসবই আমার বিলক্ষণ জানা, অথচ ছেলেবেলার স্কুলটা যে আর নেই এই শূন্যতাটা যেন আজ এই মূহূর্তে গ্রাস করল আমায়। কোন ভেতরে জমাট বেঁধে ছিল, আচমকা ধাঁ করে এক ঘায়ে আমাকে টলিয়ে দিয়ে গেল অভ্যন্তরে।

আমার পুরো কৈশোর সমেত স্কুলটা হারিয়ে যাওয়ার শোক, আমার মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড হারিয়ে ফেলার সংকটকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। খানিক আগেও যা-ছিল ভারী মাথা ব্যথার কারণ, সহসা বুদবুদের মত ভারহীন, অর্থহীন হয়ে গেল। কাউকে বলতে পারিনি তবে নিজেকে গুছিয়ে নিতে কিছুটা সময় লেগেছিল।

গত কালীপুজোর আগে আগে (২৬শে অক্টোবর ২০১৩) উত্তরাখণ্ড যাওয়ার সুযোগ এসেছিল মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার (MSC) নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফ থেকে। রুদ্রপ্রয়াগে আস্তানা গেড়ে নিকটবর্তী দুটি স্কুল ও কিছু বিধ্বস্ত অঞ্চল ঘুরে এসে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা লেখায়-ছবিতে ধরে রাখার জন্য আর্জি আসে খোদ MSC-র থেকে; ওদের জার্নালের জন্য, পরে 'আমাদের ছুটি'র তরফ থেকেও। রীতি মাফিক ভ্রমণ কাহিনি বলা যাবে না হয়তো একে, এ বৃত্তান্ত হয়তো কাউকে প্রলুব্ধ করবে না সে-প্রান্তে ছুটে যেতে; তবে "অপাংক্তেয়, অকিঞ্চিৎকর কোনকিছুই নয়" - এই সারকথা যদি ভ্রমণের নীতি হয়, এই লেখাটি সেদিক থেকে খুব একটা নীতি-বিরুদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে না আশা করি। এ-কথা সত্যি, এমন কিছু ব্যক্তি-বিষয়ের অবতারণা আছে যা ভ্রমণ-কাহিনি পাঠকের কাছে বাহুল্য মনে হতে পারে। তবে যেহেতু সবটুকু নিয়েই ছিল আমার অভিযান, তাই বাদ দিতে পারি নি কিছুই। একে গ্রহণ করলে সমগ্রে নিতে হবে, নয়তো খারিজ করে দিতে হবে একেবারে।

স্কুলটা তো নেই [তিলকনগর GIC]

রুদ্রপ্রয়াগের থেকে শেয়ার জিপে সকাল সকাল রওনা হলাম তিলওয়াড়ার উদ্দেশ্যে - মন্দাকিনীর উজানে আরও সাত কিলোমিটার। তিলওয়াড়ায় গাড়ি ছেড়ে পায়ে হেঁটে ব্রিজ পার হয়ে পিচ-বাঁধানো সড়ক ছেড়ে ধরতে হল পাহাড়ের রাস্তা। ব্রিজের এপারে সুমারি গ্রাম। বাঁ-হাতে মন্দাকিনীকে রেখে পাহাড়ের গা বেয়ে সরু পাকদন্ডি চড়াই ধরেছে সোজা দুশো মিটার প্রায়! নিচে পাহাড় যেখানে নদীর গা ছুঁয়েছে, সেইখানে নদী-বরাবর ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে পাহাড়ের গা। এই পাহাড়েই আমাদের গন্তব্য সরকারি বিদ্যালয় তিলকনগর গভর্নমেন্ট ইন্টার কলেজ, সংক্ষেপে তিলকনগর GIC। প্রাইমারি থেকে ক্লাস টুয়েলভ। যেখানটায় এসে দাঁড়িয়েছি সেখান থেকে সরু রাস্তা পাহাড়ের গা-ঘেষে ডান ও বাঁ দুদিকেই প্রসারিত। আমরা দোনামনা করে বাঁ দিকের রাস্তা ধরলাম। দেখি তখনই নিচ থেকে উঠে এসেছেন এক প্রৌঢ়। স্থানীয় মানুষ। আমাদের দলে মিশেই হাঁটছিলেন। খুব বেশি নয়, মিটার বিশেক যাওয়ার পরেই রাস্তা ডান দিকে বাঁক নিয়ে আবার "S"-এর মতো বাঁ দিকে বেঁকে গেছে। এই ডান দিকের বাঁকের কাছে এসে যখন পৌঁছলাম, তখন সামনে বেশ কিছুটা খোলা। খোলা বলতে পায়ের গোড়া থেকে শুরু হয়েছে খাদ। মানে ধ্বস। আর সেই ধ্বস নিচে মিশেছে মন্দাকিনীর জলে। অনেক নিচে বাঁ দিক ধরে সাবলীল বয়ে চলেছে নদী। আমাদের থমকে দাঁড় করিয়ে দিল ঠিক এইখানটা।

পাড় ঘেষে এক চুনাপাথরের ঢিবি . . .

"আমরা" বলতে, পেশায় ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট ডঃ প্রশান্ত কুমার রায়ের নেতৃত্বে পাঁচজনের টিম, এসেছি মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার নামক একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে। আমরা শুনে এসেছি ষোলো ও সতেরো জুনের বিপর্যয়ে তিলকনগর GIC স্কুলটি ধ্বসে গেছে। আর এখন ঠিক সেই ধ্বংসচিহ্নের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা বাক্যহারা। সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক, মুখে যাঁর সবসময় এক চিলতে মস্করার হাসি লেগেছিল, হাত নাড়িয়ে সামনের ধ্বসে যাওয়া চত্বরটা দেখিয়ে বললেন "এইখানটা জুড়ে ছিল স্কুলের মাঠ"। কিছুতেই ভেবে উঠতে পারছিলাম না যে ঠিক কতখানি অঞ্চল ভেসে গেলে সমতল মাঠ এই গভীর খাদ হয়ে যেতে পারে! একেবারে নদীর পাড় ঘেঁষে এক চুনাপাথরের ঢিবি দাঁতমুখ খিঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দেখে মনে হচ্ছে দৈত্যাকার এক সাদা উইঢিবি।

আমার ভেতর থেকে কে যেন জিজ্ঞাসা করে ফেলল, "আর স্কুলটা কোথায়?" সেই মিটিমিটি হাসির বৃদ্ধ দূরের দিকে তাকিয়ে আলতো ভাবে বললেন, "স্কুলটা তো নেই!" দূরে যেখানে পাহাড়ের ঢাল মুড়ে ডান দিকে ঘুরে গেছে সেই বাঁকের কাছে হলদে-নীল রঙের একটা তোরণের কিছু অংশ দেখিয়ে বৃদ্ধ বললেন, 'ওইটা স্কুলের গেট, সামনের রাস্তাটা স্কুলে যাওয়ার রাস্তা ছিল'। আমরা দেখলাম মিটার পঁচিশ লম্বা পিচ বাঁধানো একটা রাস্তা আমাদের থেকে প্রায় তিরিশ ফুট নিচে লম্বালম্বি পড়ে আছে, যেটা স্কুলের গেট পর্যন্ত গেছে। প্রায় ছ/সাত ফুট চওড়া হবে রাস্তাটা। দেখলে বোঝা যায়, রাস্তাটা স্কুলের গেট পেরিয়ে ডান দিকে ঘুরে গিয়ে পাহাড়ের ওদিকের ঢালের দিকে চলে গিয়েছিল। কিন্তু এখন স্কুলের পরের অংশটা আর নেই। রাস্তা চলে গিয়েছে এক অনিশ্চিত শূন্যের দিকে। পুরো রাস্তাটাই ফেটে আছে, যেমন শীতকালে পা ফাটে। রাস্তার পাশে নীল রঙের চার দেওয়ালের একটা ঘর চোখে পড়ছে। ভাঙ্গা বিস্কুটের পেটির মতো পড়ে আছে।

সামনের রাস্তাটা স্কুলে যাওয়ার রাস্তা ছিল।

আর একটু এগোতেই পায়ের তলার রাস্তা দেখলাম মাটির। জুন মাসের পর আবার নতুন করে কেটে সমান করা হয়েছে। রাস্তার দু'পাশে ওই একই রকম পেটির বাক্সের মতো বাড়ির সারি, যেন মহা ভূমিকম্প সহ্য করেছে এরা। পাহাড়ের ধাপে গড়ে ওঠা এক সমৃদ্ধ বিদ্যালয়ের নমুনা বহণ করে চলেছে এই ধ্বংসপ্রাপ্ত ইট সিমেন্টের দালানগুলি। গায়ের লেখা দেখে এখনও ঠাওর করা যায়, কোনটা লাইব্রেরি, কোনটা শৌচালয়, কোনটা ক্লাসরুম। বৃদ্ধ তখনও সঙ্গ দিচ্ছিলেন আমাদের, এবার যা শোনালেন প্রথম চোটে মনে হল আজগুবি। সেই সদ্য কাটা মাটির রাস্তার দুপাশের পরিত্যক্ত বাড়ি-ঘরগুলো দেখিয়ে বললেন, "এগুলো সব ওইখানে ছিল"। হাত তুলে যে জায়গাটা দেখালেন, তা পাহাড়ের গায়ে আরও তিরিশ ফুট মতো ওপরে। সত্যিই বিস্তীর্ণ পরিসরে পাহাড়টা একেবারে চেঁছে গেছে! "শুধু মকান নয়, এই পেঢ়, ওই পেঢ়, ওইখানে ওই বড় গাছটাও ওই ওপরে ছিল। ওগুলো শেকড় সমেত একভাবে ধ্বসে নেমে এসেছে"। পাঁচজনে এ-ওর মুখ চাওয়া-চায়ি করছি, 'বলে কি বুড়োটা!' এই সামলে উঠতে পারিনি, আর সেই বৃদ্ধ অমলিন হাসতে হাসতে বলে চললেন, "ওই যে নিচে ভাঙ্গা রাস্তাটা দেখলেন, ওটা ছিল এইখানে, যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি"। ওই স্পটে আমাদের 'হাঁ-মুখ'গুলো দেখতে দেখতে আর হাসতে হাসতে পাহাড়ের বাঁকে মিলিয়ে গেলেন তিনি। আমরা নিজেদের মধ্যে বিড়বিড় করতে থাকলাম, 'ওই রাস্তাটা এখানে ছিল! এখানটা ছিল ওখানে! এ কি করে সম্ভব!'

যেন মহা ভূমিকম্প সহ্য করেছে এরা !

অধুনা প্রাইমারি আর ইন্টারমিডিয়েট মিলে একসাথে যেখানে সব ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাস করে সেই জায়গা এই পাহাড়ের একেবারে চূড়ায়। আমাদের উঠতে হবে আর বেশ কিছুটা চড়াই। পাকদন্ডি গেলে আরও তিনশ মিটার তো হবেই। অগত্যা বাড়ির ধ্বংসাবশেষের পাশ দিয়ে শর্টকাটে আমাদের দলকে এগিয়ে নিয়ে গেল সুলভদা। অপেক্ষাকৃত দুর্গম, তবে রাস্তা কম পড়ল অনেকটাই। আমরা যখন পৌঁছলাম তখন পরীক্ষা চলছিল। পাহাড়ের একেবারে মাথায়, একটি ছোট শিব মন্দিরকে ঘিরে, টেম্পোরারি এই ব্যবস্থা, এক ঝলক দেখে মনে হতে বাধ্য,"যেন শান্তিনিকেতন"। অচিরেই চোখে ধরা পড়তে থাকবে গরমিলগুলো। নিদারুণ 'নেই'গুলো চোখে স্পষ্ট হতেই 'শান্তিনিকেতনি' সুখ-ভাবনাটা চরম ঠাট্টা মনে হতে লাগল এই পাহাড়ে। অস্থিরতায় দূরে চোখ রাখলাম। দেখি, ওমা! চৌখাম্বার চূড়া দেখা যায় এখান থেকে!

C/O Sir

মূলতঃ মাস্টারমশাইদের ঐকান্তিক চেষ্টায় সাময়িকভাবে এই পাহাড়ের চূড়ায় স্কুল আবার শুরু করা সম্ভব হয়। তবে সাড়ে সাতশ ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে প্রায় দেড়শ জন অন্যত্র চলে যায়। স্কুলের পাকা বাড়ি ভেঙ্গে যাওয়া এর একমাত্র কারণ না-ও হতে পারে। বাচ্চাদের সঙ্গে আলোচনায় জানতে পারলাম, কেউ কেউ তিন ঘন্টা পায়ে হেঁটে স্কুলে আসে। সহজ যোগাযোগের রাস্তাগুলো ভেসে যাওয়ায় অনেক ঘুরপথ পাড়ি দিতে হয়। উপরন্তু বিপর্যয়ের পর অনেক পরিবারেরই অর্থনৈতিক অবস্থা এতটাই সঙ্গীন যে, বাড়ির বাচ্চাদের রোজ গাড়ি ভাড়া দিয়ে স্কুলে পাঠানো সম্ভব নয়। অগত্যা হস্টন। পাহাড়ের ওপরে এই জায়গায় একটা ছোট মন্দির। একদিকে দু'কামরার একটা পাকা বাড়ি। হেডমাস্টারের ঘর ও অফিস। মন্দিরের অন্য পাশে আরো দু'একটা পাকা ঘর রয়েছে। শোনা গেল এখানে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ছিল। তাদের ঘরগুলো তারা স্কুলকে ব্যবহার করতে দিয়েছে।

এগুলো সব ঐখানে ছিল . . .

চৌখাম্বার চূড়া দেখা যায়

শুধু ঘর নয়, ঘরের ন্যাড়া ছাদেও বসে রয়েছে ছাত্র-ছাত্রীরা। মন্দির লাগোয়া ও তার সামনে বড় গাছের নিচে প্লাস্টিক পেতেও চলছে স্কুল। মাস্টারমশাইদের উদ্যোগেই স্কুলের এক প্রাক্তন ছাত্রকে দিয়ে ওপরে একচালা ছাউনি করে ক্যান্টিন। সামান্য চা-বিস্কুট। এছাড়াও এক পাশে দেখতে পেলাম কয়েকটা চৌখুপি ভিত। এক বেসরকারি বাইক-প্রস্তুতকারক সংস্থা কয়েকটা ঘর বানিয়ে দিচ্ছে। এসবই বাস্তবায়ণে স্কুলের মাস্টারমশাইদের নাছোড় মনোভাবের অবদান সর্বাধিক। মূলতঃ তাঁদেরই উৎসাহে মুকেশজী (শ্রী মুকেশ চেঁয়র) আগ্রহী হন এবং আমাদের তিলকনগর GIC-র খোঁজ দেন।

মুকেশজী [One Man Army]

মুকেশজীকে এই রুদ্রপ্রয়াগ অঞ্চলে প্রায় সবাই চেনে। উনি এখানে রয়েছেন সেই তেইশে জুন, ২০১৩ থেকে। মৃদুভাষী, সদা হাস্যমুখর, অণুপুঙ্খ জ্ঞানের অধিকারী এক নিরলস কর্মী শ্রী মুকেশ চেঁয়র - এই গাড়োয়ালে MSC-র হাত, পা, চোখ, মাথা - সবকিছু! জনসংযোগ ও সঠিক যোগসূত্র যে-কোনও কঠিন কাজকে কতটা সাবলীল করে দিতে পারে, আমরা বিলক্ষণ মালুম পেলাম ওঁর সাহচর্যে। স্থানীয় এক ব্যবসায়ী, কাছেই তাঁর দোতলা বাড়ির দোতলার একটা ঘর ছেড়ে দিয়েছেন MSC-র জন্য। গত জুন মাস থেকে সেখানেই মুকেশজীর আস্তানা। গিয়ে দেখে এলাম, এক-ঘর ডাঁই করা ওষুধের পেটির স্তূপের এক কোণে একটি চার-পায়া। MSC এখানে এখনও আরও একবছরকাল; মাসিক-মেডিক্যাল-ক্যাম্প চালাবে। ক্যাম্প চালু থাকলে আরো দু-এক জন স্বেচ্ছাসেবক যাঁরা আসেন, তাদেরও ঠাঁই হয় এই ঘরেই। ভেতরে ভেতরে যে খুব একটা 'দেশসেবা-দশসেবা' বেলুন ফুলিয়েছিলাম, মুকেশজীর মতো মানুষের সামনে এসে সে বেলুন চুপ্‌সে গেল নিঃসাড়ে। মনে মনে সেলাম জানালাম তাঁকে আর MSC-কে ধন্যবাদ।

MSC [Medical Service Centre]

আমার স্কুলের বন্ধু ও পেশায় সাইকোলজিস্ট ড. প্রশান্ত কুমার রায়ের থেকে প্রথম শুনি MSC-র নাম। অবাক হই এই ভেবে, ৩৫ বছর ধরে যে সংস্থা সারা ভারত জুড়ে সেবার কাজ করে চলেছে, তাদের নামই শুনিনি কোথাও, কোনও অবসরে! প্রশান্তর থেকেই জানতে পারি গত বছরগুলোয় MSC-র কাজ। বিহারে কোশি নদীর বন্যায়, ওড়িশায় এল-নিনো, গুজরাতে ভূমিকম্প, আরো কত কত! সম্প্রতি তাঁরা ডায়রির মত এক পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন, যেখানে তাঁদের এতাবৎ কার্য্যাবলীর বর্ণনা রয়েছে দিনক্রমানুসারে ও ছবিসহ। জুন মাসের সতেরো তারিখের পর থেকে আজ পর্যন্ত উত্তরাখণ্ডের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ২০০-রও বেশি মেডিক্যাল ক্যাম্প করেছে MSC-র স্বেচ্ছাসেবকরা। মানবদরদী জনাকয়েক ডাক্তারবাবুর সদিচ্ছায় জন্ম নিয়েছিল MSC। সংগঠন আজ বিস্তৃত হয়েছে অনেকটা। কাজ করে চলেছে দিনের পর দিন। প্রচেষ্টা করছে, সমস্ত দেশব্যাপী এই উদ্যোগ ছড়িয়ে দেওয়ার। একটা কথা না উল্লেখ করলে অসমাপ্ত থেকে যায়, MSC কোন সরকারি বা বেসরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত NGO নয়। একেবারেই নিজেদের গাঁটের কড়ি খরচ করে গ'ড়ে তোলা ও চালিয়ে যাওয়া একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা।

প্রশান্ত ও আমরা

প্রশান্তরই প্ল্যান। উত্তরাখন্ডে জুন মাসে ঐ বিপর্যয়ের পর পরই MSC-র টিমের সঙ্গে প্রশান্ত একবার ঘুরে গেছে রুদ্রপ্রয়াগ। এই ধরণের প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে খাদ্য-পানীয়-ওষুধের মতো মানসিক স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারেরও প্রয়োজন হয়ে পড়ে মনের দিক থেকে বিপর্যস্ত মানুষগুলোর জন্য। আর সেই দিকটাই সামলাতে এসেছিল প্রশান্ত। ওর কথা মতো, ঠিক একই ভাবে বিপর্যয়ের চার-পাঁচ মাস পরে আর একবার মানসিক স্বাস্থ্যের পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষা প্রয়োজন হয়ে পড়ে উপদ্রুত অঞ্চলের মানুষদের। সেই উদ্দেশ্য সাধনেই আরও একবার MSC থেকে প্রশান্তকে রুদ্রপ্রয়াগ যেতে বলা হয়। এবারের সফরে প্রশান্ত আমাদের চারজনকে তার দলে নেয়। দোয়েল পেশায় প্রশান্তরই মতো সাইকোলজিস্ট, সঞ্জীব আর সুলভ'দার NGO-র হয়ে এইধরনের পরিস্থিতিতে কাজ করার প্রভূত অভিজ্ঞতা, আর আমার সামান্য যাতায়াত রয়েছে বাংলা থিয়েটারের অলিতে-গলিতে। এমন পাঁচমেশালি টিম বানানোর পেছনের রহস্যটা খোলসা করল প্রশান্তই। এবারের ট্রিপে আমরা যাব উপদ্রুত অঞ্চলের স্কুলে, কারণ সেখানে আশেপাশের অঞ্চলের বাচ্চারা জড়ো হয়। তাছাড়াও শিক্ষক-শিক্ষিকারা আসেন বিভিন্ন জায়গা থেকে। এই ভাবেই আমরা কম সময়ের মধ্যে বিস্তৃত এলাকার একটা সামগ্রিক ছবি পেতে চাইছিলাম।

সবটাই প্রশান্তর নেতৃত্বে

স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আমাদের মতো করে আলাপ জমিয়ে, হাসি-ঠাট্টা-গান-গল্প-নাটক-খেলার ছলে তাদের mental assessment-এর রাস্তায় যাব। একাজে স্কুলের মাস্টারমশাইদের সাহায্যও অপরিহার্য, কারণ তাঁরাই সবচেয়ে ভাল চেনেন ছাত্র-ছাত্রীদের। তারপর আমাদের কাজ হবে আমাদের মতো করে সেইসব ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক বিপর্যয় থেকে সামলে ওঠার কিছু সহজ উপায় বাতলে দেওয়া। সবটাই প্রশান্তর নেতৃত্বে। একধাপ এগিয়ে আমাদের প্রচেষ্টায় আরও একটা জরুরি অংশ জুড়ে নিয়েছিলাম। যে-স্কুলগুলোতে যেতে পারব, সেখানে বিভিন্ন ক্লাসের উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রীদের জনাকয়েককে নিয়ে একটি গ্রুপ তৈরি করে দিয়ে আসা, যারা পরবর্তীতে এইরূপ বিপত্তিতে নিজেরা সাবলীল থাকতে চেষ্টা করবে ও পরিপার্শ্বকে স্বাভাবিক রাখতে প্রয়োজনীয় সাইকোলজিক্যাল ফার্স্ট এড দিতে পারবে।
খুব আগ্রহের সঙ্গে পরিকল্পনার শরিক হয়ে যাই। অথচ কাজ শুরু করার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত কিছু ভাসা ভাসা ধারণা ছাড়া, কোনরকম সুস্পষ্ট গাইড লাইন ছিল না আমাদের সুবিধার্থে। নতুন শুধু আমরা নই; সম্ভবতঃ এই ধরণের প্রয়াস এই প্রথমবার হতে চলেছিল, যা-ছিল প্রথাগত সাইকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্টের থেকে একেবারেই আলাদা।

সাইকোলজি

জুন মাসের ষোল-সতেরো তারিখ যখন মন্দাকিনীর অবিরাম ঝাপটায় পাহাড়ের মাটি খসে যাচ্ছে, তখন তিলকনগর GIC-তে চলছিল বর্ষাকালীন ছুটি। আমরা এসে শুনতে পাই আশেপাশের গ্রামের মানুষ প্রায় দশ দিন ধরে একটু একটু করে ধ্বসে যেতে দেখেছে এই স্কুল। এদের মধ্যে বেশ কিছু অবশ্যই এই স্কুলেরই ছাত্র-ছাত্রী। খুব সহজেই অনুমেয় ছিল এই ধ্বংসদৃশ্য বাচ্চাদের মনে কী দুর্বিষহ প্রভাব ফেলবে। অথচ অবাক হলাম আমরা নিজেরাই! শুনলাম, বাচ্চারা নাকি মজা পাচ্ছিল তাদের স্কুলকে ওভাবে ভেঙ্গে পড়তে দেখে। কখনও ক্লাসঘর, কখনো স্টাফরুম, কখনো পুরো প্রেয়ার গ্রাউন্ড খসে খসে পড়ছিল তাসের ঘরের মতো। তাই দেখে বাচ্চারাও আমোদে লুটিয়ে পড়ছিল এ-ওর গায়। মাস্টারমশাইদের সঙ্গে আলোচনার সময়ও কম-বেশি একই রকম মানসিকতার পরিচয় পেলাম। স্থানীয় ভাষায় প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে বলে 'দৈবি আব্‌দা'। তিলকনগরে প্রথমদিন হেডমাস্টারের ঘরে আমরা সবাই এবং হেডমাস্টার ও স্কুলের আরো দু-তিন জন স্যার। প্রশান্ত পুরোটা ব্রিফ করছে সবাইকে, তখনই এক মাস্টারমশাইয়ের জবানিতে ফুটে উঠল অনেকটা - "দেখুন, 'আব্‌দা' তো আসবেই। এবার বড়-সড় হয়েছে, ক্ষয়-ক্ষতি বেশি, তাই সবাই জেনেছে, আপনারাও এসেছেন। কিন্তু আমাদের কাছে তো এ-নতুন কিছু নয়। ফি-বছর লেগেই আছে। তাই আমরা এই নিয়ে খুব বেশি চিন্তিত নই। বাচ্চারাও ব্যাপারটা জানে। দেখুন-না আপনারাই; সবাই তো ঠিকঠাকই আছে। পরীক্ষা দিচ্ছে। হাসছে খেলছে। আগের মতই 'বদ্‌মাসি' করছে। আপনারা এসেছেন ভালো কথা। যা করাবেন ভাবছেন করান। আমরা জরুর হেল্প করব। আজ পরীক্ষার পর সিক্স, সেভেন ও এইটকে পাবেন। ভাগ্যিস পরীক্ষার মধ্যে 'বারিষ' হয় নি! ওই এক মুশকিল জানেন, মেঘ করলেই স্কুল ছুটি দিয়ে দিতে হয়। আরো কয়েকটা ঘর যদি জলদি-জলদি খাড়া করা যেত ..."

মেঘ করলেই স্কুল ছুটি দিয়ে দিতে হয়

সেদিন বাচ্চাদের জন্য রান্না করা মিড-ডে মিল্-এ আমরাও দুপুরের খাওয়া সারলাম। পাঁচজনেই ভাবছিলাম কিভাবে এগোব? কীই-বা করব? কাজ হবে কিছু? অজান্তে কোন অনিচ্ছাকৃত অনিষ্ট না করে বসি। সেরে আসা ক্ষত তাজা হয়ে যাবে নাতো শিশুমনগুলোয়! দেখি, এর মধ্যেই উৎসাহী বাচ্চারা গাছের নিচে ছায়ায় জড়ো হতে শুরু করেছে। দূরে তাকিয়ে দেখলাম চৌখাম্বা ঢেকে গেছে মেঘে।

দ্য হ্যাপি থেরাপি

বিশ্বাস করুন, বাচ্চাদের খুশি করা বেশ কঠিন ব্যাপার। বিশেষ করে পাহাড়ের এই সদা চঞ্চল বাচ্চাদের। এরা সদাই মজায় মজে থাকে নিজেদেরই নিয়ে! এদের খুশি ঢালে ঢালে গড়িয়ে পড়ছে অবিরল। তবে হ্যাঁ, বাচ্চাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা খুব সোজা। সবসময় তো নতুন কিছুর জন্য মুখিয়ে! তার ওপর ভগবানের উপ্‌রি পক্ষপাতিত্ব, বাচ্চাদের সে দিয়েছে অক্লেশে বিশ্বাস করতে পারার শক্তি!
২৯ ও ৩০শে অক্টোবর দু'দিন পর পর আমরা গিয়েছিলাম তিলকনগর GICতে। খুব একটা হইচই বাঁধিয়ে ওদের সাথে মিশে যেতাম প্রথমেই।

দু-এক রকমের মজার খেলা, ব্যস্! আমরা কেমন বন্ধু হয়ে গিয়েছিলাম অনায়াসে! এরপর যখন প্রত্যেকের হাতে একফালি করে সাদা কাগজ ধরিয়ে দেওয়া হত, ওরা গুছিয়ে বসত আরও কোন নতুন খেলার জন্য। mental assessment-এর questionnaire থেকে এক এক করে প্রশ্ন পড়তে শুরু করত প্রশান্ত। প্রতিটা প্রশ্নের জন্য চারটি করে বিকল্প উত্তর (আজকাল চলতি বাংলায় 'অপশন' বলে যাকে) সামনের তেপায়ার ওপর লাগানো ব্ল্যাক বোর্ডে বড় বড় করে লিখে দেওয়া হল এক ছাত্রীর সাহায্যে, হিন্দিতে - (A) কভি নেহি, (B) বহত কম, (C) কভি কভি, (D) প্রায় / যাদাতর্। তেরোটা প্রশ্ন ছিল সর্বমোট। উদাহরণস্বরূপ, "সেই বিপর্যয়ের পর আজও তোমার বার বার সেই ধ্বংসের কথা মনে পড়ে, যখন তুমি চাওনা, তখনও"। বাচ্চাদের বলা হয়েছিল এক থেকে তের ওই সাদা কাগজে পর পর লিখে, প্রতি নম্বরের পাশে শুধু A/B/C/D লিখতে। যে যেমন মনে করে। অনেক ভাবে বোঝান হয়েছিল। বার বার বলে বলে এই কথাটা মাথায় ঢোকাতে হয়েছিল যে এখানে কোন উত্তরই ভুল নয়। সবাই ঠিক। প্রথম দিকে একটু জড়তা থাকলেও, পরে সবাই সড়গড় হয়ে যায়। উত্তরপত্রগুলো জড়ো করে রেকর্ডে রাখা হয়; পরবর্তীতে বিশ্লেষণের জন্য। সেসব কিছু কিছু চোখ বুলিয়ে বা কার্যক্রমের ফাঁকে আলগোছে দু'এক জনের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন ভাবে কথা বলে প্রশান্তরা আঁচ পায় আপাত নির্বিকার এইসব বাচ্চাদের ভেতর, খুব অবচেতনে কোথাও এই ভয়াবহতা ছাপ ফেলে গেছে। মেঘ-বৃষ্টিতে ভয় চেপে ধরে একটুতেই এখন, আগের চেয়ে বেশি করে!

এরপরই আমরা খেলার মধ্য দিয়েই বেছে নিই কুড়ি জনের একটা দল। তাদের ভাগ করে দিই চার ভাগে। চারটি দলকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ জনিত চার রকমের কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড় করানো হয়। দেওয়া হয় একটা করে chart paper আর দুটো করে স্কেচ পেন। পনেরো মিনিটের মধ্যে লিখে ফেলতে বলা হয় তাদের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি। যেমন, বিষয় দেওয়া হয়েছিল, "গতরাতের বন্যায় তোমাদের স্কুল ভেঙ্গে গেছে - কী মনে হল? কী করলে?" ইত্যাদি। মাঝখানের এই সময়টুকুতে সাইকোলজিক্যাল ফার্স্ট এডের কয়েকটি সহজ পন্থা শেখাত প্রশান্ত বাকিদের। ওই চারটি দলের লেখা শেষ হলে, ওদের থেকেই এক এক জন করে ডেকে চার্টগুলো পড়তে বলা হোত। এই পদ্ধতিতে কিছুটা হলেও বাচ্চাদের মনের সঠিক অবস্থাটা ঠাহর করা যেত। পয়েন্টে পয়েন্টে থামতাম আমরা, খুব যত্ন করে বিশদ করা হত কেন এমন হয় মনের মধ্যে! সাথেসাথেই শেখানো হত কীভাবে বেরিয়ে আসবে এর থেকে।

এরপর আমরা পাঁচজনে মিলে অভিনয় করতাম একটা ছোট নাটিকা। বিষয়বস্তু একই; আসল উদ্দেশ্য, শিখে রাখার উপাদানগুলো যেন মনে গেঁথে যায়। নাটক চলতে চলতেই স্কুলের দু'এক জনকে নিয়ে নেওয়া হত সঙ্গে। আবার আমাদের মধ্যে থেকে ছাত্র-ছাত্রী সেজে প্রশ্ন তোলা হত নানারকম। যেগুলো হয়তবা ওদের মনে ঘুরপাক খায়। মুখচোরারাও এভাবে যদি তাদের মনের জিজ্ঞাসা মিটিয়ে নিতে পারে! এই পুরো কার্যক্রমে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করা হোত মাস্টারমশাইদেরও।

তিরিশ তারিখ সন্ধেবেলা যখন রুদ্রপ্রয়াগ ফিরে এলাম, মুকেশজীর সঙ্গে দেখা হতেই আলাপ করিয়ে দিলেন আরেক মাস্টারমশাই শ্রী সিস্‌পল পঁয়রের সঙ্গে। সিস্‌পলজী অন্য আরেকটি GIC-র শিক্ষক। রথোড়া GIC। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে এই স্কুলটিও প্রায় সাত/আট কিলোমিটার দূরে। তবে অন্য দিকে। অলকানন্দার পাড় ধরে যেতে হয়। সিস্‌পলজীর অনুরোধে আমরা একত্রিশ তারিখ সকালে বাসে চেপে রওনা দিলাম রথোড়া। স্কুলটি কোন ভাবে বিপর্যস্ত হয় নি এই ঘটনায়। স্কুলের বাচ্চারা যেসব জায়গা থেকে আসে, সেখানেও বাড়ি-ঘর অধিকাংশ অক্ষত। শুধু স্কুলে আসার রাস্তা বা যোগাযোগ কোথাও কোথাও ভেসে গেছে বা ধসে গেছে। এখানে আমরা NSS-এর একটা গ্রুপ পেলাম, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে তৈরি করা। NSS-এর পুরো কথা হোল National Social Service। আমাদের কাজের পক্ষে যা খুব সহায়ক। এছাড়াও স্কুলের পাশেই DIET নামে একটি টিচার্স ট্রেনিং সেন্টার থেকে প্রায় কুড়িজন ট্রেনী শিক্ষক-শিক্ষিকাও যোগ দিলেন আমাদের কার্যক্রমে। DIET-এর কর্ণধার শ্রী আনন্দ জগ্‌ওয়ান উপস্থিত ছিলেন রথোড়ায় হেডমাস্টারমশায়সহ অন্যান্য স্যারেদের সঙ্গে আমাদের আলোচনায়। আমাদের প্রস্তাবনায় শ্রী জগ্‌ওয়ান যারপরনাই উৎসাহিত হয়ে নিজে আমাদের কাজের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করলেন। শুধু তাই নয়, DIET-এর ট্রেনীদের এনে হাজির করলেন আমাদের প্রোগ্রামে। আমরা আরো সুচারু প্রসারের রাস্তা দেখতে পেলাম, যা সত্যিই আশাব্যঞ্জক। রথোড়া GIC তে আমরা ছাত্র-ছাত্রীদের চারটে দলেই ভেঙ্গেছিলাম, তবে এবার দলগুলিতে ট্রেনী টিচারদেরও যোগ দিতে বলি। Chart Paper আর পেন দেওয়ার পর বিষয় দেওয়া হয়। এবার বিষয়গুলি ভাঙ্গা হয় 'দৈবি আব্‌দা'-র চারটি ধাপে, (1) Precaution, (2) Rescue, (3) Relief এবং (4) Rehabilitation। স্টুডেন্ট-টিচারে মিলে দারুণ জমে গেল সমস্তটা। আমরাও ভাগাভাগি হয়ে মিশে গিয়েছিলাম ওদের সাথে। শেষ-পাতে নাটিকা। তার মধ্যে মধ্যেই পড়া হতে থাকল ছাত্র-ছাত্রীদের চিন্তা-ভাবনাগুলো।

ওই সীমিত সময়ের মধ্যে আমাদের প্রয়াসের কার্যকারীতা টের পাওয়া সম্ভব নয়, তবে সামগ্রিকভাবে যে সাড়া পেলাম, তাতে কিছুটা হলেও আশ্বস্ত হওয়া যায় যে, পরবর্তীতে 'দৈবি আব্‌দা'-র সামনে অন্তত এই ছাত্র-ছাত্রীরা ও শিক্ষকরা নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থেকে অদৃষ্টকে দুষবেন না শুধু!

অদৃষ্ট

মুকেশজী বলছিলেন বিশ্ব উষ্ণায়ণের বিষয়টা তো আছেই, কিন্তু যদি আমরা আমাদের পর্যবেক্ষণকে শুধু কেদারনাথের এই ঘটনায় আবদ্ধ করি, তাহলে দেখতে পাব হেলিকপ্টারের ক্রমাগত ওঠা-নামা চলেই চলেছে কেদার মন্দির খোলার পর। একটা আকাশে গর্জাতে গর্জাতে অপেক্ষা করে, নিচেরটা জায়গা ছেড়ে উঠলে এ নামবে। এসবের প্রভূত কম্পন ও ইঞ্জিনের গরম ভাপ। তাছাড়াও হর্ রোজ প্রায় বারোহাজার ঘোড়া/খচ্চরের যাতায়াত (যেখানে মাত্র তিন হাজার সওয়ারির বেশি একদিনে ঐ তীর্থে ভিড় করা উচিত নয়)। সর্বোপরি লক্ষ-লক্ষ পুন্যার্থীতে মিলে মিশে একেবারে শিবালয় সরগরম। এত অত্যাচারে যদি চর্‌বালি হিমবাহ গ'লে গিয়ে ধড়াম করে আছড়ে পড়ে নিচে চর্‌বালি তালের জলে, আর সেই বিপুল জলরাশি তাল থেকে উছলে সরু পাহাড়ি নদীর দু'পাড় ছাপিয়ে প্রায় বিশ/তিরিশ ফুট জলপ্রাচীর সৃষ্টি ক'রে এই পুন্যভূমির দিকে ধেয়ে আসে, তবে তাকে কি শুধুই প্রকৃতির রোষ বা অদৃষ্ট বলে এড়িয়ে যাবেন! আরও আছে। এর বীজ যে আরও আগে পোঁতা হয়ে গিয়েছিল। ইংরেজ আমলেই এইসব পাহাড়ে ছড়ানো হতে থাকে পাইনের বীজ। তাদের দরকার ছিল কাঠ। পাইন কাঠ এতই হাল্কা, প্রায় পুরোটাই ভেসে থাকে জলের ওপর। আর অনায়াসে নিচে সমতলে নেমে যায় ভেসে ভেসে। বিনা ট্রান্সপোর্টেশন খরচে প্রয়োজন মতো কাঠ নিচে সমতল থেকে সংগ্রহ করে নিলেই হল! এই কারণে জায়গাটির নামই হয়ে গেল কাঠগুদাম। পাইন প্রচুর পরিমাণে জল টেনে নদীপারের মাটি ঝুরঝুরে করে দেয়। মাটির ধারণক্ষমতা যায় কমে। যখন হড়কা বানে নদীর দু'ধারের সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে নিঃশেষে, সবচেয়ে সহজে রকেটের গতিতে নদীর জলে বয়ে চলেছে বিশাল বিশাল পাইন আর পাইন। পাইনের ওপরের বাকলও অত্যন্ত পাতলা, তাই নিমেষে পাথরে-পাড়ে ধাক্কা খেয়ে গাছগুলির ডালপালা ছাল-চামড়া চেঁছে উঠে যায়। সাদা আস্ত পাইন কান্ড প্রকান্ড মিসাইলের মতো জলের তোড়ে বয়ে আসে হাজারে হাজারে বুলেটের গতিতে। ওই মারাত্মক গতিতে অত বড় বড় লগ্ যখন নদীর বাঁকে বাঁকে সজোরে এসে পাড়ের মাটিতে ধাক্কা মেরেছে, বিশাল বিশাল গর্ত করে দিয়ে গেছে বিশ/তিরিশ ফুট উঁচু পাড়ের দেয়ালে। সেই গর্তে বন্যার জল ঢুকে নির্দয় ভাবে ধুয়ে নিয়ে গেছে পাড়ের মাটি, সঙ্গে এখানকার মানুষের সহায়-সম্বল-প্রাণ সবকিছু।

স্রোতের উপরিতলে ভাসমান পাইন-লগের ধাক্কায় মুহুর্মুহু ভেঙ্গে পড়েছে সেতু। কম-বেশি দেড়শ ব্রিজ ভেঙ্গেছে দু'দিনের বন্যায়। যোগাযোগ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় বিপর্যস্তরা বেরোতে পর্যন্ত পারেনি এলাকা ছেড়ে। পুরোটাই অদৃষ্ট? মানুষের কোন হাত নেই! যত্রতত্র অপরিকল্পিত ড্যাম নির্মাণ, আর তার রাবিশ জমা করা হচ্ছে দিনের পর দিন নদীর পাড়ে। হড়কা বানে সমস্ত রাবিশ নদীগর্ভে গিয়ে অগভীর করে দিচ্ছে নদীকে। নদী নদীখাত থেকে উপচে খেয়ে চলেছে নদী পাড়ের ভিটে-মাটি - সবই 'দৈবি আব্‌দা' বলে এড়িয়ে যাওয়া যায়? মুকেশজীর প্রশ্নের কোন উত্তর ছিল না আমাদের কাছে। চুপ করে রইলাম। মুকেশজী আমাদের নিয়ে চললেন মন্দাকিনীর দুই শিকার বিজয়নগর ও শিল্লী গ্রাম দুটো দেখাতে।

জল-ছবি

বিজয়নগর ও শিল্লী অজ পাড়া-গাঁ নয়। তিলওয়াড়া থেকে উখিমঠ যাওয়ার রাস্তায় প্রায় দশ কিলোমিটার, মন্দাকিনীর উজানে গড়ে ওঠা দুটি সমৃদ্ধ কসবা। শিল্লী পেরিয়ে গিয়ে বিজয়নগর। এখানে মন্দাকিনী বাঁক নিয়েছে - প্রায় আধখানা চাঁদের মত। তিলওয়াড়া থেকে গাড়ি নিয়ে আমরা যখন বিজয়নগর পৌঁছলাম তখনও বিকেল অনেকটা বাকি। যে জায়গায় গাড়ি থেকে নামলাম, সেটা বাজার। আশপাশের দোকানপাট, লোকজনের যাতায়াত দেখে বোঝার উপায় নেই মাত্র দশ পা এগিয়ে ধ্বংসের অবশেষের যে বিভীষিকা দেখব তা মুহূর্তে আমাদের সমস্ত স্নায়ুর দম আটকে দেবে! ভাষায় বিস্তারিত বর্ণনার চেষ্টা হয়ে পড়বে এতই অসার যে নিজের অক্ষমতায় নিজেরই বিরক্ত লাগবে। অকুস্থলে সশরীরে গিয়ে দাঁড়ানোর পর ভয়-মিশ্রিত এক রোমাঞ্চ শুধু নয়, সারাটা চেতনা গ্রাস করে নেবে একমাত্র প্রশ্ন, 'তবে কী প্রচণ্ড ছিল সে প্রলয়ের ক্ষণ! বিশ্বাস হয় না, এও কি সম্ভব!' ক্যামেরায় তোলা ছবি যদিবা তার কিঞ্চিৎ আভাস দিতে পারে। আমি তাই এখানে শুধু কয়েকটি ছবি তুলে দিলাম -

প্রথমে বিজয়নগর :

১) গাড়ি যেখানে নামালো সেখানে থেকে রাস্তা দু'ভাগ হয়ে গেছে। একভাগ গেছে সোজা পাহাড়ের গা-ঘেঁষে, বেশ চওড়া রাস্তা। পিচবাঁধানো, কিন্তু সামনেই রাস্তা বন্ধ। রাস্তার ওপর মেরাপ খাটিয়ে অস্থায়ী দোকান বা কোন কিছুর কাউন্টার করা রয়েছে। রাস্তার আরেকটা ভাগ, পাথুরে মাটির, আগের রাস্তা থেকে ভাগ হয়ে সোজা নিচে নেমে গেছে। নিচে... আরও নিচে, একেবারে নদীর সমান্তরালে... অগত্যা চলাচলের উপায় করা হয়েছে। আমরাও নেমে গেলাম সেই দিকেই। সমস্ত যাতায়াতই তো ওই পথ ধরে!

রাস্তা দু'ভাগ

২) এক জায়গায় ট্রলি লাগানো এপার-ওপার। চার/পাঁচজন করে পারাপারের ইন্তেজাম। এমাথা-ওমাথা দড়ি ধরে নাগাড়ে টেনে চলেছে দু'জন দু'জন। শুধু নদীটুকু পারাপারের নিমিত্ত অসহায় যাত্রী ঠাঁয় দাঁড়িয়ে এক/দেড় ঘন্টা।

ট্রলী লাগানো এপার-ওপার

নদীর ধারের একটা পাথরে দাঁড়িয়ে যখন আগের পিচবাঁধানো রাস্তার দিকে তাকালাম। সামনে শুধু মাটি আর আলগা পাথরে মেশানো প্রায় প্রায় চল্লিশ ফুটের এক মস্ত দেওয়াল, সামনের সমস্ত কিছু আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। বাঁকের যে নাজুক মোচড়ে আমরা এখন দাঁড়িয়ে, ঠিক এখনই যদি সেই সেদিনের হড়কা আবার ধেয়ে আসে, আমাদের সটান গেঁথে দেবে ঐ দেয়ালে। তারপর আবার ধুয়ে নিয়ে যাবে যত্নে!

৩) দাঁড়িয়ে আছি একটা দোকান ঘরের তলায়। দোকানটা ওপরে, ওই পরিত্যক্ত পাকা রাস্তার ধারে ছিল। এখনও তাই আছে। দোকানের চারপাশের দেওয়াল অনেকটা আগের মতই, কিন্তু দোকানের মেঝে বলে কিছু আর নেই। আমি এই তলা থেকে দেখতে পাচ্ছি দোকানের ভেতরে দেওয়ালের গায় করা ছোট ছোট অসংখ্য র‍্যাক। কিসের দোকান ছিল ওটা? বোঝার উপায় নেই। আগে কখন কোন দোকানের ভেতর এই অ্যাঙ্গল থেকে দেখিনি। দোকানের যেটুকু এখনও টিকে আছে, সেটুকুকে টিকিয়ে রাখতে দোকানের মালিক পেল্লায় চারখানা নতুন পিলার বানিয়েছেন নতুন করে। পিলারের খরচ দোকানের থেকে বেশি হবে নির্ঘাত!

দোকান-ঘর

৪) নদী ধুয়ে চেটে-পুটে গেছে পাথরের ওপরের মাটি। বাড়িটা ঠাকুরঘর সমেত পাথরের ওপর বসে পড়েছে। কতদিন থাকবে, পরের বর্ষা?

বাড়িটা ঠাকুর-ঘর সমেত পাথরের ওপর বসে পড়েছে

৫) এই রাস্তারই ওইখানটায় তিনদিন আগেই এক স্কুলছাত্রীর মাথায় এই রাক্ষুসে দেয়াল থেকে চাঙড় পড়ে যায়। মেয়েটি বাঁচেনি।

(৬) ঐখানটায় তিন দিন আগেই . . .

৭) ক্রমশঃ আমরা বিজয়নগর থেকে শিল্পীর দিকে ফিরে আসছিলাম। সূর্য ঢলে পড়ছে। নদীর পাড় ধরে এবার খেয়াল করতে পারছি শুধুই ক্ষত। তারই মধ্যে খেলা করছে বাচ্চারা।

৬) রাস্তার পাশের বাড়ি হড়কে নেমে গেছে নদীর ধারে। তার ছাদ বিস্কুটের মতো ভেঙ্গে পড়েছে।

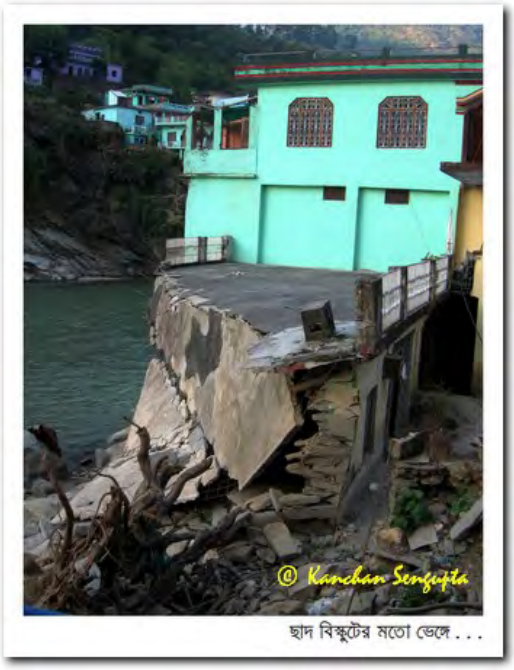

ছাদ বিস্কুটের মতো ভেঙ্গে . . .

৭) রাস্তার এবড়ো-খেবড়ো কিনার ঘেষে দাঁড়িয়ে আছে লোহার একটা প্যাঁচানো সিঁড়ি দশ/বারো ফুট। সিঁড়িটা সংলগ্ন ছিল যে বাড়িটার একপাশে সেই গোটা বাড়িটাই লা-পতা! গা-শিরশিরানি অলৌকিক লাগছে ঘর-ছাড়া সিঁড়িটাকে।

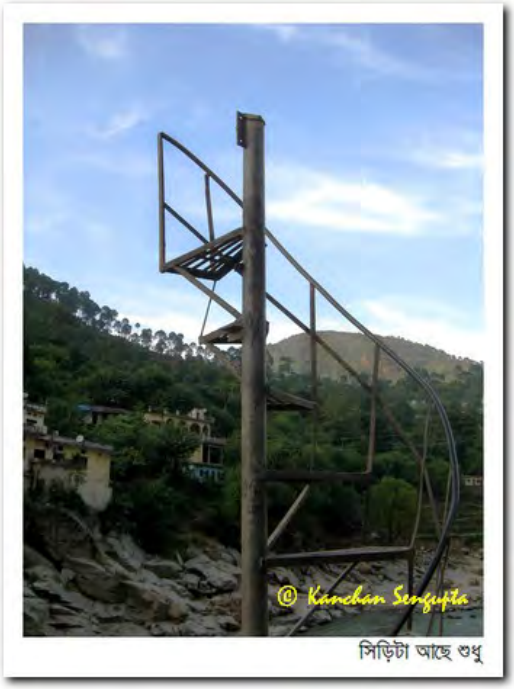

সিড়িটা আছে শুধু

৮) বিজয়নগরের মতো এখানেও একই ভাবে ট্রলিই একমাত্র ভরসা নদী পারাপারের। শিল্পীর এক সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ীর সঙ্গে আলাপ জমল। ওপারটা দেখিয়ে বললেন, "যেখানে ট্রলি থেকে নামছে লোকজন, তার সামনেই বেশ বড় পাথরের চাতাল ছিল। তার ওপর ছিল একটি তিনতলা বাড়ি। জানি বিশ্বাস করবেন না, নদী বইতো এখান থেকে কুড়ি কুড়ি ফুট নিচ দিয়ে"!

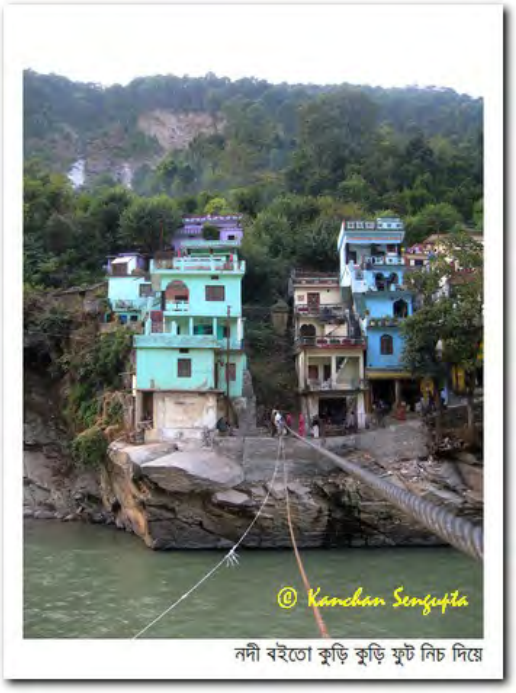

নদী বইতো কুড়ি কুড়ি ফুট নিচ দিয়ে

রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে নিচে খাদ যেখানে নদীর সঙ্গে মিশেছে, সেখানেই পাথরের স্তূপের ওপর একটা জায়গা আঙ্গুল তুলে দেখালেন, "ওখানে আমার দোকান ছিল"! পায়ে পায়ে পৌঁছে গেলাম ওঁর বাড়ি। তিনতলা সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ি। পাহাড়ে যেমন হয়, তৃতীয় তলা রাস্তার সমান সমান, বাকি দুটো তলা রাস্তা থেকে নিচে... ঢালে। তারও নিচে ছিল বিশ ফুটের পিলার। বাড়ির ভেতরে ঢোকা থেকে কেউই নিজেদের আটকাতে পারলাম না (এক মুকেশজী ছাড়া)। হতবাক হওয়ার তখনও অনেক বাকি। কুড়ি ফুট পিলারের পুরোটাই মাটির তলায়। দেখা যাচ্ছে না অংশমাত্রও! মনমোহিনী মন্দাকিনী উচ্ছল বয়ে চলেছে একতলার বারান্দা ছুঁয়ে। সামনের বহতা জলে আঁক কেটে প্রশান্ত বলল, "এই ছড়ানো জায়গাটুকুতে বাগান করেছিলেন এনারা"! দোতলায় যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, বস্তুত সেই জায়গাটুকু এখন নদীর ওপর ঝুলন্ত! এখান থেকে গজ-দশেক দূরে নদীর স্রোতের ওপর মাথা তুলে আছে ওই পাথরটা, পূর্বে অতটাই ছিল নদীর সীমানা। পড়ন্ত বিকেলের আভায় ভারি মায়াবী একটা আলতো বাঁক নিয়েছে মন্দাকিনী এখানে। ফের বাড়ির দিকে ঘাড় ঘোরাতেই চোখে পড়বে দোতলার বারান্দা, রান্নাঘর আর ঘরগুলোতে, মেঝে থেকে প্রায় অর্ধেক পলি পড়ে আছে। তাতে আটকে আছে হাট করে খোলা দরজা, লাল তোবড়ান বাইসাইকেল, কাঠের চেয়ার, লোহার আলমারি আর গোমড়ানো মুহূর্তরা। কুলকুল বয়ে চলা নদীর সাথে সাথে শনশন বয়ে যাওয়া বাতাস বেচালে ঢুকে পড়লে এই নিথর নিবাসে, হাঁকপাঁক করতে করতে বেরোনোর পথ চায়। এবাড়ির বাসিন্দারা আশ্রয় নিয়েছেন তিনতলায়। যেতেই ঝকঝকে ছোট্ট স্টেইনলেস স্টীলের গ্লাসে শীতল জল দিলেন। এটা গাড়োয়ালের রেওয়াজ। তারপর এলো চা। আতিথেয়তার কমতি নেই। এই শিল্পীতেই নাকি ত্রাণের নামে বস্তা বস্তা জামা-কাপড় এসেছিল - সবই ছেঁড়া-ফাটা ও ময়লা। ছুঁয়েও দেখেননি কেউ। বোধ হয় নদীর জলেই ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। মুকেশজী বলছিলেন, এক স্থানীয় শিক্ষকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে হঠাৎ করে দশ লক্ষ টাকা। সরকারের কাছে জিজ্ঞাসা করে কোন সদুত্তর পাওয়া যায় নি। প্রচুর অর্থ, খাদ্য, বস্ত্র, ওষুধ এসেছে উত্তরাখণ্ডে এই ক'মাসে, কিন্তু সুষ্ঠ বিলি-বন্টন হোতে পারনি কোথাও। সরকার তথা দেশি-বিদেশি বড় বড় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, কারোরই নজর নেই সেইদিকে। ত্রাণের অসম বন্টন হেতু একটি লজ্জাজনক ক্ষতির খতিয়ান দিয়ে শেষ করব লেখাটি।
ঘটনাটা শিল্পীরই। এ অঞ্চলে বহু বছর ধরে বহু মানুষ বসবাস করছেন বা ব্যবসা করছেন বাড়ি ভাড়া নিয়ে। দীর্ঘদিনের সখ্যতায় বাড়ির মালিক ও ভাড়াটেদের মধ্যে মধুর সম্পর্ক। বিপর্যয়ের পর শিল্পীতে ত্রাণ এলো, কিন্তু অপর্যাপ্ত। বিলি-ব্যবস্থার 'বাবামশাইয়েরা' সিদ্ধান্ত নিলেন - 'যেসব বাড়ির মালিক তাদের বাড়ি খুইয়েছেন এই বন্যায় তাদের মধ্যে ত্রাণের এই সামান্য ক'টি টাকা সমান ভাগে ভাগ করে দেওয়া হোক, কারণ তাঁদের ক্ষতিই সবথেকে বেশি'। বাস্তব চিত্র কিন্তু অন্যরকম। যাঁর বাড়ি গেছে তাঁর হয়ত ক্ষতি হয়েছে পঞ্চাশ হাজার টাকার। কিন্তু ওই বাড়িটি যে ব্যক্তি ভাড়া নিয়ে তাঁর দোকান চালাতেন, তাঁর হয়ত পাঁচ লক্ষ টাকার মাল ভেসে গেছে জলে। প্রাপ্য তাঁদেরও কিছু কম নয়! কিন্তু বুঝবে কে? ফলস্বরূপ এত বছরের সম্পর্কেও চিড় ধরিয়ে দিল বন্যা, যে ভাবে ফাটাল মাটি। সবটাই দৈব নয়! অদৃষ্টও নয় সবসময়! মানুষ নিজের দায়টা মাথা পেতে আর কবে স্বীকার করবে?

পরিশিষ্ট – কোটেশ্বর

ঠিক যেখানটায় এসে দাঁড়িয়েছি এই পড়ন্ত বিকেলের আলোয়, এখান থেকে গোটা বিশেক তো হবেই, পাথর বাঁধানো সিঁড়ি নিচে একটা চাতাল। সিড়ির বাঁ-পাশে খাড়া পাহাড়ের পাথুরে দেওয়াল। সিঁড়ির ডান দিকে বেশ খানিক সমতল টেবিল। সমতলের আরো ডান দিকে ঝুপ করে পাহাড়ের গা নেমে গেছে সোজা অলকানন্দার জলে। পিছনে শঙ্করাচার্যের আশ্রম এই অতিকায় পাহাড়ের ঢালে বড় বড় গাছের ছায়ায়, আর সামনে থেকে বয়ে আসছে সবজে অলকানন্দা, লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে মুখোমুখি এসে সিঁড়ির পায়ের কাছের পেল্লায়-পেল্লায় পাথরগুলোয় ধাক্কা খেয়ে আমাদের ডান পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে রুদ্রপ্রয়াগের দিকে মন্দাকিনীর সাথে মিশতে। পাহাড়ের গায়ে এই আশ্রম থেকে রুদ্রপ্রয়াগ কিলোমিটার-খানেক তো হবেই; বেশিও হতে পারে।
প্রথমদিন তিলকনগর GIC থেকে রুদ্রপ্রয়াগ ফেরার পথে প্রয়াগের কাছাকাছি অলোকানন্দার ওপরের ব্রিজটার গোড়ায় টাটা সুমো থেকে নেমে পড়লাম তড়িঘড়ি। দলপতি প্রশান্ত বলল, 'তাড়াতাড়ি যদি পা চালাতে পারি, সূর্য আকাশে থাকতে থাকতে কোটেশ্বর পৌঁছে যাব'। প্রাকৃতিক ভাবে তৈরী হওয়া পাহাড়ের দেওয়ালে সংকীর্ণ গুহা, যাকে আদতে কোটর বলাই মানানসই। আর সেই কোটরের মেঝেতে রয়েছে ছোট-বড় স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গ। তাই কোটেশ্বর। প্রশান্তর তাড়া দেওয়ার কারণ হোলো আশ্রমের হাতায় দাঁড়িয়ে অলকানন্দার দিকে তাকালেই সমস্ত মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এক সুউচ্চ গর্জ... নদীখাত থেকে উত্তুঙ্গ উঠে যাওয়া এক দানবিক চট্টান; একটাই পাথুরে চাঁই। প্রশান্তর কথা মতো, পশ্চিম থেকে কনে-দেখা নরম আলো যখন ঐ চট্টানের গায় আলতো মেখে থাকে, তখন ঐ দানবকেও ভারি মায়াবী লাগে নাকি!

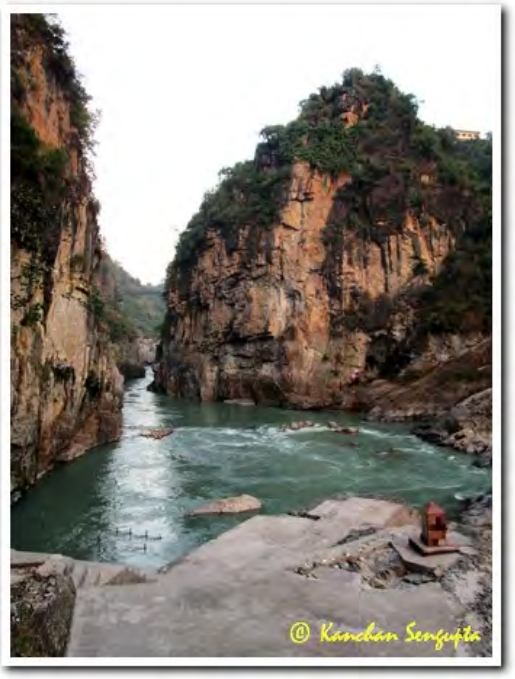

পাহাড়ের মুশকিল হোলো দিগন্ত ছোঁয়ার অনেক আগেই সূর্য কোনো একটির আড়ালে গা ঢাকা দেয়। অলকানন্দার পাড় ধরে পা চালাচ্ছি আর ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পিছনে দেখছি। এই রাস্তায় কিছুদূর এগিয়ে গেলেই ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের দপ্তর; একটাও কি গাড়ি এপথে আসবে না! ঠিক তাই, সাদা এম্বাসেডর, প্রথমে অরাজি, তারপর রাজি, বেশ কিছুটা ওপরে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। গাড়ি থেকে রাস্তায় পা দিয়ে দেখি, পাশের খাদ ধরে যদি নেমে যাই তবে ওই দেখা যাচ্ছে আশ্রমের মন্দিরের চুড়া। আরে হ্যাঁ, শিবের খাস-তালুকে চাক্ষুস করে এলাম রাধা-কৃষ্ণের মন্দির। যাই হোক, সরু পাকদন্ডি একখান রয়েছে ঠিকই, তবে তা কোথাও স্পষ্ট, কোথাও পাহাড়ের গায়ের ঝোপঝাড় ও ধ্বসে যাওয়া মাটির আড়ালে আবছা। প্রায় ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে এসে পৌঁছলাম আশ্রমে। আশ্রম প্রধান শিবানন্দ মহারাজের সঙ্গে দেখা করে, প্রশান্তর আগের ট্রিপের রেফারেন্স দিয়ে, নমো নমো করে আমাদের পরিচয় দিয়ে, আশ্রমের পাথর বাঁধানো তকতকে এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে ছুটলাম সেই কাঙ্ক্ষিত সৌন্দর্যের আশায়। আর ঠিক যেখানটায় এসে দাঁড়িয়েছি এই পড়ন্ত বিকেলের আলোয়...

আমাদের দেরি হয়ে গেছে। সূর্য বসেছে পাটে। গর্জের গায়ের আলো ম্রিয়মাণ। তবু ওই অতিকায় গর্জের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়, চোখ ফেরানো সহজ হয় না অত। গর্জের একদিক নদীর ওপারের সঙ্গে সংযুক্ত। অন্যদিকটা যদি আর খানিকমাত্র নিজেকে ছড়াতে পারত, তাহলেই অলকানন্দার ওপর এখানেই এক অনতিক্রম্য প্রাকৃতিক বাঁধ তৈরি হয়ে যেত, আর তা ঘটলেই এই অঞ্চলের ভূগোল-ইতিহাস সব অন্যরকম হয়ে যেত। এ প্রলাপ মনে হতে পারে, হোক গে...আমার তো ওখানে দাঁড়িয়ে প্রথম ঝটকায় তাইই মনে হল। তবে তা হয় নি। অলকানন্দার প্রবাহ ওইখানটায় চেপে সরু হয়ে গেছে এবং সেই সরু অংশ দিয়ে নদী গর্জের গা-ঘেঁষে ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে বয়ে চলেছে। ওই সরু অংশটার ঠিক ওপরে... অনেক ওপরে, গর্জের প্রায় পেটের সঙ্গে নদীর এপারটা একটা লোহার ব্রিজ দিয়ে সংযুক্ত। বুঝলাম, যেখানটায় গাড়ি থেকে নেমেছি, সেখান থেকে আরও এগিয়ে গেলে ওই রাস্তা ধরেই, আগে গিয়ে কোথাও পাহাড়ের সেই জায়গাটায় পৌঁছনো যায় যেখান থেকে ব্রিজটার সাহায্যে গর্জের ওপরে যাতায়াত করা যায়।

আমাদের পিছন পিছন এসে দাঁড়িয়েছেন মহারাজ। শোনালেন, দুর্যোগের সময় ঐ সরু অংশটা দিয়ে যে দানবিক জলস্তম্ভ ধেয়ে এসেছে তা আর একটু হলে ওপরের ঐ ব্রিজটাকেও ভাসিয়ে নিয়ে যেত। খুব জোর বেঁচেছে। আমাদের চোয়াল ঝুলে গেল এই কথা শুনে, তারপর মনের মধ্যে যেই শুরু হয়েছে ফিসফাস, "একটু বাড়িয়ে বলছেন না কি!", ঠিক তখনই... ... ঠিক তখনই আমরা যেখানটায় এসে দাঁড়ালাম, সমতল টেবিল মতো ভূ-খণ্ডটিকে ডানপাশে রেখে, এখন ঐ অংশটা ঠিক আমাদের পায়ের পাতার লেভেলে। এখান থেকে গোটা বিশেক সিঁড়ি নিচে সেই চাতাল, চাতালের বাঁ-হাতে কোটেশ্বরের কোটোর আর সামনে দিকে আরো গোটা দশেক সিঁড়ি নেমে গেছে সোজা নদীতে। পাথরের সিঁড়ি। ধাপগুলো বেশ উঁচু উঁচু। মোদ্দা কথা যা বোঝাতে চাইছি, আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছি এসে, এখান থেকে নদী এখন, নয় নয় করে তিরিশ ফিট মতো নিচ দিয়ে বয়ে চলেছে। আর কী আশ্চর্য এখান থেকে ডান দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম, আমাদের পাশেই সেই সমতল টেবিলের মতো জায়গাটার ওপর একটা প্রকাণ্ড পাইন কাণ্ডের খণ্ড পড়ে আছে ছাল ছাড়ানো অবস্থায়। আমাদের ভুরু আরও একটু কপালে তুলে দিয়ে মহারাজ বললেন, প্রলয়ের সময়ে নদী এই ভীম-কাণ্ডটি ঘটিয়েছে! ঐ প্রকাণ্ড গুঁড়িটি ভাসিয়ে এনে এর ওপরে তুলে ফেলেছে! তার ঠিক পাশের সিমেন্ট নির্মিত অফিস ঘরটি নাকি সদ্য সারিয়ে তোলা হয়েছে! না মেনে উপায় রইল না মহারাজের দেওয়া আগের তথ্যটিও নির্ঘাত খাঁটি... রীতিমতো সাক্ষ্য রয়েছে আমাদের চোখের সামনে!

জুতো, বেল্ট, লেদার ওয়ালেট রেখে মোহাবিষ্ট আমরা ক'জন নেমে গেলাম নিচে ওই চাতালটায়। বাঁ-দিকে পাহাড় ও ডান হাতে এই চ্যাপ্টা টেবিল টুকরোটুকুকে রেখে সিঁড়ির ধাপ নেমে গেছে ওই চাতালে। বাঁ-দিকের খাড়া দেওয়াল এখানটায় এসে S-এর মতো আলতো বাঁক নিয়ে আরো একটু বাঁ-দিকে সরে গিয়ে চাতালটিকে বাঁ-দিকে প্রসারিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। বেশ একটা করিডোর মতো ওই পাথুরে দেওয়ালের গায় গাঁথা। চাতালের খালি দিকে লোহার রডের রেলিং বার বার বলছে যেন, 'আমি আছি, ভয় নেই, এগিয়ে যাও'। নদী এখান থেকেও বেশ নিচে। সেই পাথুরে দেওয়াল অল্প বাঁয়ে বেঁকেই আবার ডান দিকে বেঁকে গিয়ে S-টাকে সম্পূর্ণ করেছে, তারপর আর কোনো দিকে না বেঁকে সটান চলে গেছে নদীর পার ধরে। ওপর থেকে যত নিচে নেমে আসছিলাম সিড়ি ভেঙ্গে, নদীর আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা জলের আওয়াজও স্পষ্ট হচ্ছিল ক্রমে ক্রমে। চাতালটায় নেমেই বাঁ-হাতে তাকিয়ে দেখলাম S-এর বাঁকের মুখেই ওপর থেকে এক ঝোরা ঝমঝমিয়ে আছড়ে পড়ছে সেই করিডরের ওপর। আর ঝোরা পেরিয়েই S-এর দ্বিতীয় বাঁকের কোলটাতে সেই গুহামুখ। অর্থাৎ শিব দর্শনে যেতে হলে ঝোরার জলে শুদ্ধ হয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। গা বাঁচানো গেলেও, পা-দুখানি ভেজাতেই হবে। প্যান্ট গুটিয়ে এগিয়ে গেলাম। গুহার ভেতর অন্ধকার। সঙ্গের মোবাইল আর ক্যামেরার ফ্ল্যাশের আলোয় যা দেখলাম, পাহাড়ের এই ভেতরটা একাধিক রকমের পাথরের মিশ্রণ বলে মনে হোলো, আর তাদের গা বেয়ে সর্বদা চুইয়ে পড়ছে জল। ভেতরের পাথর মসৃণ হয়ে ক্ষয়ে ক্ষয়ে জন্ম দিয়েছে শিবলিঙ্গ-রূপ আকৃতির।

গুহা থেকে বেরিয়ে খানিক জলের কাছে গেলাম - বরফ-শীতল, খানিক পা রাখলাম ধবধবে সাদা বালিতে - বালিও একইরকম শীতল, একেবারে নদীর জলে পা-ছুঁইয়ে যখন সেই প্রকাণ্ড গর্জের দিকে তাকিয়েছি, আর ওই উঁচু ব্রিজটাকে দেখছি... একসাথে সবাই পরস্পরকে একই কথা বলে ফেললাম, "এখন যদি হঠাৎ করে আবার ওই বিশাল বিশাল..." গা ছমছম করে উঠল। চারপাশে বেশ আবছায়া নেমে এসেছে। তাড়াতাড়ি উঠে এলাম সিঁড়ি দিয়ে।

শিবানন্দ মহারাজের দপ্তর-কাম-বেডরুমে সবাই বসলাম। আমাদের কাজ সম্বন্ধে বেশ উৎসাহ দেখালেন। 'দৈবি আব্‌দা'র সঙ্গে মানসিক বিপর্যয়ের প্রকোপ যে বাড়ে তার সম্যক অভিজ্ঞতার কথা ভাগ করে নিলেন আমাদের সঙ্গে। আশ্রমটির ট্রাস্টি বোর্ডের আনুকুল্যে মেডিক্যাল ক্যাম্পও চালানো হয়েছিল সেই বিপদের দিনে। এমনকি মানসিক স্বাস্থ্যের কথা ভেবে একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞকেও আনা হয়েছিল। সেই বিশেষজ্ঞ ও তাঁর অদ্ভুত সব বায়নাক্কা সামাল দিতে শেষে এঁদের জেরবার অবস্থা। তাছাড়া মেডিক্যাল ক্যাম্পের ফ্রি ওষুধের সন্ধানে জুটে যেতে লাগলো যত ফেরেব্বাজের দলও... সেইসব গল্প চলতে লাগলো বেশি করে দুধ আর চিনি দেওয়া চা সহযোগে। আমাদের হুঁস ফিরলো শাঁখের আওয়াজে। আরতির সময় হয়ে গেছে। মহারাজের থেকে বিদায় নিয়ে যখন বাইরে এলাম, চারিদিক ঝুপ্পুস আঁধার। কোথাও কোথাও পাহাড়ি কুঁড়ে বা দোকানঘর থেকে টুকি টুকি আলো। নদীর পার ধরে রাস্তা...হাঁটতে হাঁটতে একসময় দূরে অন্ধকারের গায়ে দেখা গেল হলুদ-সাদা জোনাক পোকা। দলপতি বলে উঠলেন, "ওই যে রুদ্রপ্রয়াগের বাজার"।

দ্য হ্যাপি থেরাপী

কাঞ্চন সেনগুপ্তের ছেলেবেলা কেটেছে ইস্পাত নগরী দুর্গাপুরে। কর্মসূত্রে কলকাতায়। ২০০০ সাল থেকে বেসরকারি কনস্ট্রাকশন ফার্ম সিমপ্লেক্সের সঙ্গে যুক্ত। ভালো লাগে লেখালেখি, ছবি তোলা, বেড়ানো। আবার কখনওবা সময় কেটে যায় ছবি আঁকা বা টুকিটাকি হাতের কাজে।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00
Like Be the first of your friends to like this.
tell a Friend

আমাদের ছুটি
ইচ্ছে হলেই...
বেড়ানোর কথা আর ছবি নিয়ে বাংলা ই-ম্যাগাজিন
আমাদের বাংলা | আমাদের দেশ | আমাদের পৃথিবী | আমাদের কথা
= 'আমাদের ছুটি' বাংলা আন্তর্জাল ভ্রমণপত্রিকায় আপনাকে স্বাগত জানাই = আপনার বেড়ানোর ছবি-লেখা পাঠানোর আমন্ত্রণ রইল =

অন্য ভ্রমণ

ভ্রমণ তো বানিয়ে তোলা গল্পকথা নয়, মানুষের সত্যিকারের জীবনকাহিনি। আর তাই ভ্রমণ কাহিনি মনে শুধু আনন্দই এনে দেয় না, চোখের জল অথবা প্রতিবাদের ভাষাও জাগিয়ে দিতে পারে। ট্যুরিজম ইন্ড্রাস্ট্রির সহায়ক বিজ্ঞাপনী প্রচারমাধ্যম ছাড়াও ভ্রমণ কাহিনির বড় পরিচয় বিশ্ব সাহিত্যের একটি অন্যতম ধারা রূপেও। তেমনই কিছু 'অন্য ভ্রমণ' কথা।

শান্তিনিকেতন থেকে ধাত্রীদেবতার সন্ধানে

শুদ্ধসত্ত্ব ঘোষ

রেললাইনটা পার হয়েও দেখছি ব্যাপারটা থামেনি। ভেবেছিলাম প্রান্তিক যখন পেরিয়ে গেলাম তখন নিশ্চয় আর এমন দেখবনা। ভাবনাটাই ভুল ছিল। রাস্তাটা রেললাইন পার হয়ে বাঁ দিকে বেঁকে চলেছে আমার গন্তব্যের দিকে। যাওয়ার পথের দু'ধারের মাঠে বিভাজন এখন আর আলে থেমে নেই। আগে থেমে যেত। একটা খেতের সঙ্গে অন্য একটা খেতের তফাত বোঝাতে লাগে আল। সেই সরু আল এখনও আছে। তবে ক'দিন থাকবে তা বলা ভারি মুশকিল। বিভাজন রেখা কাঁটাতারের বেড়া, যেন একেকটা সীমান্ত একেক দেশের। প্রান্তিকের দিকটা ভরে উঠেছে ফার্ম হাউস, আবাসন আর বেসরকারি ইস্কুল-কলেজে। বেশ একটা নগরায়ণ চলছে। সেই নগরায়ণের মূল ভোক্তা কলকাতা এবং বিদেশের বাঙালিরা। তাঁরা বাড়তি সম্পদ ব্যয় করে বাড়ি কিনে রাখছেন, বৃদ্ধাশ্রমে থাকার ব্যবস্থা করছেন, পারলে কেউ কেউ জমি কিনছেন রিসর্ট বানাতে। কলকাতা এবং অন্যান্য অঞ্চল থেকে যাঁরা নানা শান্তিনিকেতনী উৎসবে বেড়াতে যান তাঁরা স-গাড়ি সেখানে ডেরা ফেলেন। হোটেলে বাউল আসে গান শোনাতে, তাঁরা সংস্কৃতি করেন।

এই শান্তিনিকেতনটা ক্রমশ বাড়ছে। বাড়ছে গত শতাব্দীর শেষ দিক থেকেই। দুটো স্পষ্ট বিভাজন হয়ে গিয়েছে। একদিকে পুরোনো শান্তিনিকেতনী ও অন্যদিকে নবীন শান্তিনিকেতনী। এই দুই বিভাজনে বেশ একটা দ্বন্দ্ব লেগেই আছে। সেই ক্রমশ বেড়ে চলার নজির দেখছি আমার চলার পথের দু'ধারে। কংকালীতলা অব্দিও ধানের খেতে পড়ে আছে সিমেন্টের খাম্বা। তাতে কাঁটাতার দিয়ে এলাকা চিহ্নিত করা আছে। চাষের জমি পাল্টে যাচ্ছে বাস্তু জমিতে। এখানে কয়েকটা কূট প্রশ্ন উঠে আসে। মানুষকে তো থাকতে হবে। তাহলে জমি যদি না পাওয়া যায় থাকবে কী করে! অতএব লোকসংখ্যা বাড়লে জমির চরিত্রও বদলাবে স্বাভাবিকভাবেই। এই অবদি যদি ভাবনাটাকে ধরা যায় তাহলে ভুল খুব বেশি কিছু নেই। কিন্তু যদি অন্য দিকটা একটু দেখা যায় তাহলেই নজরে আসবে সমস্যাটা। এই যে এত এত বাড়ি হচ্ছে এখানে নিয়মিত থাকছেন ক'জন? বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই থাকছেন না। মাঝেমধ্যে বেড়াতে যাচ্ছেন। এমন অবস্থা কিন্তু পুরোনো শান্তিনিকেতনীদের ক্ষেত্রেও হচ্ছে। তাঁদের নবীন প্রজন্ম এখন কার্যোপলক্ষে বাইরে বাইরে থাকেন। সেখানে অনেকেই নিজেদের বাসস্থান করে ফেলেছেন। শান্তিনিকেতনের বাড়িকে কেউ বানিয়েছেন গেস্ট হাউস, কেউ রেখে দিয়েছেন নিজেদের ও বন্ধুদের বেড়াতে যাবার সুবিধের জন্য।

সম্পদ যদি কারও বাড়তি থাকে তাহলে সে এটা করবেই। অধিকাংশই হয়তো বলবেন যে এতে ভুল কী আছে! চলতি জীবনের চলতি নিয়মের দিক থেকে কোনো ভুল নেই। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে জায়গাটার নাম শান্তিনিকেতন। বোলপুরকে যিনি নিছক বোলপুর থেকে শান্তিনিকেতন বানিয়েছেন তাঁর দিক থেকে দেখলে বোধহয় কিছু সমস্যা দেখা দেবে। কিন্তু কথা হচ্ছে সবই যখন তাঁর নামে তাহলে দেখব নাই বা কেন! গীতিকবিতা লিখে নোবেল পেয়ে গেলেন যখন সেখানেই থেমে গেলে পারতেন। থামলেন না। তার বদলে সেই অর্থের সমস্তটা ব্যয় করলেন তাঁর আশ্রম গড়ে তুলতে। নোবেল জয়ের অনেক আগে থেকেই এই প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন। তাকেই আরেকটু বড় আকার দিতে শুরু করলেন সেই অর্থে। দেবেন্দ্রনাথের গড়া 'শান্তিনিকেতন' বাড়িটা একটা অঞ্চলের চিহ্ন হয়ে দাঁড়াল যে তার পেছনে রয়েছে ওই অমানুষিক প্রচেষ্টা। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম থেকে শুরু করে পরবর্তী বিশ্বভারতী পর্ব অবধি নিজের প্রায় সমস্তটাই ঢেলেছেন এখানে রবীন্দ্রনাথ। নিজে ও বন্ধুবান্ধব থাকবেন বলে ঢালেননি। শিক্ষা ও চেতনা ও সংস্কৃতি বিস্তার করতে চেয়েছিলেন। তাতেই ক্ষান্ত হননি। গড়ে তুলেছিলেন শ্রীনিকেতন-ও। কৃষি ও হস্তশিল্প এবং ক্ষুদ্রশিল্প বিকাশের ভাবনা ছিল।

জীবনের শেষ শ্রমবিন্দুটাও ব্যয় করেছেন দেশের কাজ করতে। দেশ গড়ার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে। অসুস্থ শরীর নিয়ে ভারতের শহরে শহরে বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান করেছেন। যা দেখে গান্ধীকেও বলতে হয়েছে এই বয়সে এই অসুস্থ শরীর নিয়ে গুরুদেব এ কাজ করে বেড়াচ্ছেন এ লজ্জার বিষয়! বিড়লাকে বলেছেন সাহায্য করার জন্য। কিন্তু দেশের লোক বোধহয় লজ্জা পায় না। পেলে যাঁরা

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রভূমির গরিমায় সম্পদ সঞ্চয় করে চলেছেন, সম্পদ ব্যয় করছেন নিজেদের ভাল থাকার আশায় তাঁরাও বোধহয় দেশ-দশ নিয়ে আরেকটু ভাবতেন। বাড়ির নাম শুধু খেয়া, বলাকা, সোনার হরিণ রাখলেই যে রবীন্দ্রচর্চা হয়না তা বুঝতেন।

যদি বুঝতেন তাহলে কৃষকের জমিকে বাস্তুতে রূপান্তরিত করার আগে ভাবতেন কী হল কৃষকের যে এমন করে নিজের সামান্য সম্পদটুকুও বেচে দিতে হচ্ছে তাকে! যে পথ দিয়ে চলেছিলাম সেখানে জমির পর জমি রুক্ষ। জল ওঠে না। এমনকী শ্যালোর থেকেও ৩০০-৩৫০ ফুটেও জল ওঠে না। মাটির নীচের জলভাণ্ডার এখন ৫০০ ফুটের বেশি নেমে গিয়েছে। এ অবস্থায় পাম্প চালালে সে জ্বলে নষ্ট হয়ে যাবে। জল এত কম উঠবে যে বিদ্যুৎ শেষত তাকেই পোড়াবে। এ পরিসংখ্যান আশেপাশের গ্রামের থেকে পাওয়া। সরকারি শিলমোহর নেই, কিন্তু যার জমি তার দুঃখ আছে এতে। জলভাণ্ডার গড়া, বৃষ্টির জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা, এ সমস্ত নিয়ে কেউই ভাবেননি। নদী সেচের কথা কহতব্যই নয়। নদী সেচ এক কাহিনি হয়ে থেকে গিয়েছে। দুবার চাষ তো পরের কথা, একবারই হতে চায় না। ক্ষেতের ধান ক্ষেতেই শুকোচ্ছে। বর্ষার জলে চাষের আশ করেও লাভ নেই। মানুষেরই লোভ উষ্ণায়ণ হয়ে আছড়ে পড়েছে। তাই চাষার করার কিছু নেই। জমির পর জমি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, বদলে যাচ্ছে বাস্তুজমিতে।

যাচ্ছিলাম লাভপুরের পথে। তারাশঙ্করের দালানকোঠা দেখার বাসনায়। রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন থেকে তারাশঙ্করের সাধনার দিকে চলেছিলাম। যেতে যেতে ভাবছিলাম এঁদের লেখার কথা। নিখিলেশ জমিদার। ঘরে বাইরে উপন্যাসের সময়কাল স্বদেশী আমল, বঙ্গভঙ্গের সময়কাল। বিলিতি দ্রব্য পোড়ানো হচ্ছে নিয়ম করে। সন্দীপ, ঘোরতর স্বদেশী নেতা, একেই মহান কাজ বলে চিহ্নিত করে আশেপাশের সকলকে উদ্বেল করে তুলেছে। এমনকী নিখিলেশের ঘরণী বিমলাকেও সে তার জালেই আটকাতে পেরেছে। যাবার পথে কেবল মনে পড়ছিল নিখিলেশের কথা। এ এক এমন সময় বেঁচে আছি যে সব কথা মনে পড়ার কথাও বটে। নিখিলেশের কথার এক জায়গায় নিখিলেশ বলছে, 'এরা মনে করে আমি খুব হিসাবি, আমি কৃপণ। আমার স্বদেশী কারবারের হিসাবের খাতাটা এদের খুলে দেখাতে ইচ্ছা করে। আর, সেই-যে একদিন মাতৃভূমিতে ফসলের উন্নতি করতে বসেছিলুম তার ইতিহাস এরা বুঝি জানে না! ক' বছর ধরে জাভা মরিশাস থেকে আখ আনিয়ে চাষ করালুম; সরকারি কৃষিবিভাগের কর্তৃপক্ষের পরামর্শে যত রকমের কর্ষণ বর্ষণ হতে পারে তার কিছুই বাকি রাখি নি, অবশেষে তার থেকে ফসলটা কী হল? সে আমার এলাকার চাষিদের চাপা অট্টহাস্য। আজও সেটা চাপা রয়ে গেছে। তার পরে সরকারি কৃষিপত্রিকা তর্জমা করে যখন ওদের কাছে জাপানি সিম কিম্বা বিদেশী কাপাসের চাষের কথা বলতে গেছি তখন দেখতে পেয়েছি সে পুরোনো চাপা হাসি আর চাপা থাকে না। দেশে তখন দেশসেবকদের কোনো সাড়াশব্দ ছিল না, বন্দেমাতরং মন্ত্র তখন নীরব। আর সেই-যে আমার কলের জাহাজ-- দূর হোক সে-সব কথা তুলে লাভ কী? দেশহিতের যে আগুন ওরা জ্বালালে তাতে আমারই কুশপুত্তলি দগ্ধ হয়ে যদি থামে তবে তো রক্ষা।

শিলাইদহে এককালে চাষ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বিলিতি পন্থায়। সে চাষের কাহিনিই উঠে এসেছে এখানে। সে চাষে কাজ হয়নি। হয়েছিল পরের বার স্থানীয় চাষী দিয়ে করা চাষে। কলের জাহাজ করেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। তার পরিণতিও আমাদের জানা। শেষমেশ বিলিতি কোম্পানির সঙ্গে প্রতিযোগীতা ছাড়াও কর্মচারীরাই ডুবিয়েছিল সব। নিখিলেশের বিলিতি বর্জনে আপত্তি ছিল না, ছিল তার ঘটা-পটায়। নিখিলেশের দেশের কাজে আপত্তি ছিল না, ছিল দেশকে মাতৃকল্পনায় পুজো করে তার সর্বনাশ করার কাজে। দেশ যদি মা হয় তাহলে সে দেশ তো হিন্দুর দেশ, মুসলমানের হবে না। মুসলমানের তো পৌত্তলিকতায় আপত্তি। শুধু তাই না, পল্লীসমাজকে নিজের হাতের তালুর মতন চিনতে পারার যে গুণ নিখিলেশ দেখিয়েছিল, যে সংস্কারমুক্তি দেখিয়েছিল সে তো আশ্চর্য্য! তার জমিদারীর মুসলমানেরা গো-হত্যা করাকে ধর্মনিষ্ঠ হিন্দুর মতনই অপছন্দ করতো। কিন্তু বিলিতি দ্রব্যের ধ্বংস যে তাদের অর্থনীতির ধ্বংস ডাকছিল, তাদের কাপড়ের ব্যবসা বন্ধ করে অবাঙালীদের কলের কাপড় মোটা দামে কেনার রাস্তা করছিল, সে তো তাদের নজর এড়ায়নি। শুরু হল গো-হত্যা। তখন হিন্দুদের মাথাদের নিখিলেশ বলেছিল ধৈর্য্য ধরতে। প্রতিক্রিয়ায় যা হচ্ছে তা থেমে যাবে সময়ে। কিন্তু ইংরেজি পড়া ছোকরা তো এ ভাবনার শরিক না। তাকে নিখিলেশ একটি চমৎকার কথা বলেছিল। দেশকে, পল্লীকে সে যদি না জানতো তাহলে এ কথা বলা চলতো না। বলেছিল, "আমি বললুম, এ দেশে মহিষও দুধ দেয় মহিষেও চাষ করে, কিন্তু তার কাটামুণ্ড মাথায় নিয়ে সর্বাঙ্গে রক্ত মেখে যখন উঠোনময় নৃত্য করে বেড়াই তখন ধর্মের দোহাই দিয়ে মুসলমানের সঙ্গে ঝগড়া করলে ধর্ম মনে মনে হাসেন, কেবল ঝগড়াটাই প্রবল হয়ে ওঠে। কেবল গোরুই যদি অবধ্য হয় আর মোষ যদি অবধ্য না হয় তবে ওটা ধর্ম নয়, ওটা অন্ধ সংস্কার।"

রবীন্দ্রনাথ জানতেন। মুরগীর পোলট্রি, মৌমাছি চাষ, ডেয়ারির পাশাপাশি হাঁসের চাষও শুরু করেছিলেন। এলমহার্স্টের সময় বোলপুরের গ্রামে গ্রামে ষাঁড় দেওয়া হয়েছে গরু উৎপাদনের জন্য। কালে কালে কো-অপারেটিভ হয়েছে। আখ, তিল, অন্যান্য শাকসব্জীর চাষও শুরু করেছিলেন। আজকেও শুখার মরসুমে সেই চাষ কিছু দেখছিলাম প্রান্তিক ছাড়িয়ে, লাভপুরের পথে। নিখিলেশ তাই তার পল্লীকে জানতো। সে জানা যে কত

সত্য জানা তা আজ-ও আমি দেখতে পাই। সে জানা যে কত ব্যাথার জানা তা জানতে আমার বাকী নেই। 'ঘরে-বাইরে' তে রবীন্দ্রনাথ আঁকছেন পঞ্চুর জীবনকে। নিখিলেশের বয়ানে সে জীবন আমরা পড়ি - "পঞ্চু আমার মাস্টারমশায়ের একজন ভক্ত। কেমন করে এর সংসার চলে তা আমি জানি। রোজ ভোরে উঠে একটা চাঙারিতে করে পান দোক্তা রঙিন সুতো আয়না চিরুনি প্রভৃতি চাষার মেয়েদের লোভনীয় জিনিস নিয়ে হাঁটু-জল ভেঙে বিল পেরিয়ে সে নমঃশূদ্রদের পাড়ায় যায়; সেখানে এই জিনিসগুলোর বদলে মেয়েদের কাছ থেকে ধান পায়। তাতে পয়সার চেয়ে কিছু বেশি পেয়ে থাকে। যেদিন সকাল সকাল ফিরতে পারে সেদিন তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে বাতাসাওয়ালার দোকানে বাতাসা কাটতে যায়। সেখান থেকে ফিরে বাড়ি এসে শাঁখা তৈরি করতে বসে-- তাতে প্রায় রাত দুপুর হয়ে যায়। এমন বিষম পরিশ্রম করেও বছরের মধ্যে কেবল কয়েক মাস ছেলেপুলে নিয়ে দু-বেলা দু-মুঠো খাওয়া চলে। তার আহারের নিয়ম এই যে, খেতে বসেই সে একঘটি জল খেয়ে পেট ভরায়, আর তার খাদ্যের মস্ত একটা অংশ হচ্ছে সস্তা দামের বীজে-কলা। বছরে অন্তত চার মাস তার এক বেলার বেশি খাওয়া জোটে না।"

এই যে জীবন, এই পল্লীগ্রামের জীবন! বদলেছে বিস্তর এমন কথা বললে অন্যায় হবে। হ্যাঁ, জব কার্ড এসেছে। একশো দিনের প্রকল্পের খেলা। কথা ছিল এর বিনিময়ে দেশের জন্য সম্পদ সঞ্চিত হবে। হল কত? হিসেব নিতে গেলে এক অদ্ভুত জানার সম্মুখীন হতে হয়। বোলপুরের এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল আগের দিন। তিনি বলছিলেন যে তিনি তাঁর একটি ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছেন। দিয়েছেন এই জব কার্ডের সৌজন্যে। মজুর মাটি কাটার জন্য চাইছেন ঘন্টায় তিনশো টাকা। বলছেন যে দিতে পারবেন বলে মনে হয় না! এই মজুররা দলানুগত। একটি অঞ্চলের যতজন বিপিএল তালিকায় আছেন তাঁদের জব কার্ড চলে যাচ্ছে নেতার হাতে। নেতা টাকা তুলছেন, বিলি করছেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই যা পাওয়ার কথা কয়েকজন পাচ্ছে তার থেকে বেশি। আর অনেকেই কম পাচ্ছে। কিন্তু নিয়মিত পাচ্ছে। সুতরাং তার মদ এবং আনুষঙ্গিকের খরচ উঠে যাচ্ছে। সে আর কাজ করতে যাচ্ছে না। মাঠের পর মাঠজুড়ে তাই এখন যন্ত্রে ধান কাটার কাজ চলছে। ভাববেন না এ শুধু পশ্চিমবঙ্গের কথা। এ আমি বিহার কী প্রতিবেশী ঝাড়খন্ডেও দেখে-শুনে এসেছি। শ্রমবিমুখতার এই যে উৎসব শুরু হয়েছে এর শেষ হবে ওই শ্রমিককেই হত্যা করে।

এই যে দলকেন্দ্রিক তথা নেতাকেন্দ্রিক পল্লীজীবন সেও তো আজকের কথা নয়! সে কথা অনেককাল আগেই বলে গিয়েছেন তারাশঙ্কর। তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, যাঁর বাড়ি যাবার উদ্দেশ্য নিয়ে চলেছিলাম লাভপুরের পথে, তিনি তো অনেককাল আগেই এ ছবি একরকম এঁকে গিয়েছেন 'গণদেবতা'য়। গ্রামের জমিদার চৌধুরীদের হাত থেকে ভূসম্পত্তি চলে গেল ছিরু পাল বা শ্রীহরি পালের হাতে। ছিরু পালের সম্পর্কে যা বলছেন সে কথা যে গ্রামে গ্রামে জেলায় জেলায় আজ কতজনের সম্পর্কে খাটে তা বলাই বাহুল্য - "ছিরু বা শ্রীহরি পালই এই দুইখানা গ্রামের নূতন সম্পদশালী ব্যক্তি। এ অঞ্চলের মধ্যে বিশিষ্ট ধনী যাহারা, ছিরু ধন-সম্পদে তাহাদের কাহারও চেয়ে কম নয় – এই কথাই লোকে অনুমান করে। লোকার চেহারা প্রকাণ্ড; প্রকৃতিতে ইতর এবং দুর্ধর্ষ ব্যক্তি। সম্পদের জন্য যে প্রতিষ্ঠা সমাজ মানুষকে দেয়, সে প্রতিষ্ঠা ঠিক ঐ কারণেই ছিরুর নাই। অভদ্র, ক্রোধী, গোঁয়ার, চরিত্রহীন, ধনী ছিরু পালকে লোকে বাহিরে সহ্য করিলেও মনে মনে ঘৃণা করে, ভয় করিলেও সম্পদোচিত সম্মান কেহ দেয় না।"

সামান্য চাষ-আবাদ থেকে গোমস্তা, গোমস্তা থেকে জমিদার হয়েছে সে। এই যে স্বল্পবিত্তের উচ্চ আসনে এসে বসে পড়া তাতে মহৎ কিছু ঘটেনি। উচ্চবিত্তের আসনে বসে সে উচ্চবিত্তের শিক্ষা-সংস্কারের দেখনদারি পালিশটুকু ছাড়া এক প্রকাণ্ড এক ক্ষমতার স্পর্ধার তামাশায় পরিণত হয়েছে। তেমনি অনিরুদ্ধ কর্মকার যখন চণ্ডীমণ্ডপ থেকে ভোগ উঠিয়ে নিয়ে যায় তখনও আর কেউ প্রতিবাদ করে না। দেবু ঘোষ চেষ্টা করেও উপায় পায় না। আবার এই অনিরুদ্ধ কর্মকার শহরে গিয়ে দোকান দেবে। তার অর্থের প্রয়োজন। গ্রামে সে অপ্রতুল। তাকে আর ধমকেও সামলানো যাবে না। এও এক রূপান্তর বটে। নীচের মহল চলাচল করছে। তার উপর যে শোষণ হয়ে এসেছে তার জাল কেটে সে বেরোতে চাইছে। কিন্তু বেরিয়ে সে সামগ্রিকভাবে নীচের মহলের কোন্ উপকার সাধন করবে? যা করবে তা তো তার নিজের জন্য শুধু। এ সব হচ্ছে এমন এক সময় যখন যুদ্ধের ঘনঘটা শেষ।

"আঃ, সেই তেরশো একুশ সালে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে পঁচিশ সালে; আজ তেরশো উনত্রিশ সাল – আজও বাজারের আগুন নিবিল না। কঙ্কণার বাবুরা ধূলামুঠা সোনার দরে বেচিয়া কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আনিতেছে আর কালীপুরের জমি কিনিতেছে মোটা দামে। ধূলা বৈকি! মা কাটিয়া কয়লা ওঠে – সেই কয়লা বেচিয়া তো তাহাদের পয়সা। যে-কয়লার মন ছিল তিন আনা, চোদ্দ পয়সা, আজ সেই কয়লার দর কিনা চোদ্দ আনা। গোদের ওপর বিষফোড়ার মত – এই বাজারে আবার প্রেসিডেন্ট পঞ্চায়েতি ঘুচাইয়া ট্যাক্স বাড়াইয়া বসাইল ইউনিয়ন বোর্ড। বাবুরা সব বোর্ডের মেম্বর সাজিয়া দণ্ডমুণ্ডের মালিক হইয়া বসিল – আর দাও তোমরা এখন ট্যাক্স!"

দ্বারকা চৌধুরীর এই বিশ্লেষণে তার স্বার্থ থাকলেও গ্রামীণ পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার এই পরিবর্তনও সুদূরপ্রসারী। মূল্যবৃদ্ধির এই আগুণ ঘরকে ঘর পোড়াচ্ছে। অনিরুদ্ধর শহরে যেতে চাওয়ার নেপথ্যে এই অর্থের প্রচণ্ড অনটনের কাহিনীও আছে। গ্রামের চণ্ডীমন্ডপটির আর সে দিন নেই। ওখানে বরং কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক হলে লোক হাতজোড় করে বসে থাকবে। দেবু ঘোষ যতই পুরোনো ব্যবস্থার মাধ্যমে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার কথা ভাবুক না কেন তার রাস্তা আর নেই আজ। কিন্তু নতুন সময় কেমন হচ্ছে? তার কথাও একরকম বলেছে 'গণদেবতা'।

"চণ্ডীমণ্ডপটা এবার ছাওয়ানো হয় নাই,

বর্ষায় এবার ওটা পড়িয়া যাইবে। গ্রামের লোক ছাওয়ায় নাই, শ্রীহরিও হাত দেয় নাই। শ্রীহরি ওটা ভাঙিতে চায়। এবার দুর্গাপূজার পর সর্বশুদ্ধা ত্রয়োদশীর দিন সে ওখানে দেউল তুলিবে, পাকা নাটমন্দির গড়িবে। চণ্ডীমণ্ডপ এখন সত্যসত্যই শ্রীহরির। শ্রীহরিই এখন এ গ্রামের জমিদার। শিবকালীপুরের জমিদারি সে-ই কিনিয়াছে। চণ্ডীমণ্ডপ তাহার নিজস্ব। ইহার মধ্যে অনাচ্ছাদিত চণ্ডীমণ্ডপের দেওয়ালগুলি বৈশাখের ঝড়ে, কাদায় ভরিয়া গিয়াছে। কত পুরাতন দিনের বসুধারার চিহ্নগুলির একও আর দেখা যায় না।"

সমস্ত প্রাচীন যখন ভাঙলো তখন নবীনকে গড়ার জন্য কোনো দিশা ছিল না। দেবু ঘোষ, জমির মাপজোকের বিরোধে জেল খেটে এসে গ্রামে নায়ক হল বটে, কিন্তু সে সংস্কারক না। তার উচ্চাশা আছে। সেও ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য হতে চায়, প্রেসিডেন্ট হবার স্বপ্ন দেখে। তার আদর্শ এক অলীক আদর্শ। সে আদর্শ দিয়ে পাতুলাল মুচি, তারা নাপিত, গিরিশ ছুতারদের চলবে না। যতই চণ্ডীমণ্ডপ আর গ্রামের সদ্‌গোপ মাতব্বর চাষারা স্থিতাবস্থা চেয়ে থাকুক সে আর আসার না। কিন্তু যা আসবে তার জন্যও যে কোনো পরিকল্পনা ছিল না।

তারাশঙ্করের দালানকোঠা 'ধাত্রীদেবতা'র দিকে লাভপুরের সিমেন্টের গলি দিয়ে এগোতে এগোতে ভাবছিলাম সেই কথা। পঞ্চায়েত বদলালো। ভূমি সংস্কারের ঢাক বেজে বেজে ক্লান্ত হল। তবু জব কার্ডের রমরমা। তবু সেই দল তথা নেতাতন্ত্রই একমাত্র অগতির গতি। জমিদার-মহাজনের জায়গা নিয়েছে নেতা। সে জ্বালিয়ে দিতে বললে ঘর জ্বলবে, রাখলে লোক থাকবে। কিন্তু তাতে দেশের কি হল? যে দেশের এখনো শতকরা আশীভাগ জমির সঙ্গে সম্পর্কিত সেই দেশের এই মানুষগুলোর এ কেমন উন্নয়ন হল? এর জন্য কি শুধু সরকার দায়ী? সরকারেরা দায়ী? আমরা দায়ী নই? আমরা যারা শান্তিনিকেতনে বেড়াতে যাই, পল্লীপ্রকৃতির শোভাতে আহা-উহু করি, বাড়ি বানাই, বার্ধক্যের হিসেব নিকেশ করি বৃদ্ধাশ্রমে থাকারা তারা কি পল্লীকে সত্যি চিনতে চেয়েছিলাম? চেয়েছিলাম তার বেদনাকে বুঝতে, জানতে, তার উপায়সাধন করতে? আমরা কি শহরের উত্তেজনায় মনে রেখেছিলাম যে আমাদের আত্মীয়টি পড়ে আছে পল্লীর রূপে সামান্য দূরে?

যেতে যেতে মনে হলে যেন এক প্রাচীন গ্রীক ট্র্যাজেডির মতন ব্যাপার। সকলেই আমরা জানি ও মানি যে দেশের আর কিছু হবার নেই। তার ঋণ, তার দারিদ্র তার চিরস্থায়ী শোভা। এমন জমিদারি ব্রিটিশেও বানাতে পারেনি। অমোঘ নিয়তির মতন সকলেই আমরা মেনে নিয়েছি এ সব। গ্রামে গ্রামে যে সবুজ এখনো কিছু দৃশ্যমান তার গায়ে যে প্রতিদিনের রক্তের ছিটে লেগে থাকে, খবরের কাগজ আর টেলিভিশনে সে ছিটে দেখে আমরা তাক করি কার দিকে বন্দুক ঘোরাবো তার! কোন দলকে বলবো, কোন দলের হয়ে বলবো সে ভাবনা গুছিয়ে নিই। কিন্তু আয়নার সামনে দাঁড়াই না। যদি আজ দল, নেতা এ সমস্ত দোর্দণ্ডপ্রতাপ হয়ে থাকে তাহলে তাকে হতে দিয়েছি আমরা। দেশের শাসন ও সংস্কারের সামান্যতম কাজটুকু থেকেও নিজেদের প্রত্যাহার করে নিয়ে তাকেই দিয়েছি সমস্ত ভার। নিজেদের জীবনের আহ্লাদ থেকে এক মুহূর্তও মুখ সরাতে অক্ষম বলে এ দায় আমরা নিতে পারিনি। ঘরে-বাইরেও তাই যখন আগুন লেগেছে তখনও গণদেবতা জাগেননি। সে আগুন আর জাগরণের কাহিনিকারদের শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলাম। এসেছিলাম আগুন ধরার আগেই তাকে নেভানোর প্রচেষ্টার কারিগরের দেশে। ভেবে দেখলাম তিনিও একা, তারাশঙ্করও একা। এ দেশের ধাত্রীদেবতা শান্তিনিকেতনের সন্ধান না পেয়েই চলে গিয়েছেন। আমরা তাঁকে যেতে দিয়েছি।

আপাদমস্তক সৃজনশীল মানুষ শুদ্ধসত্ব-র লেখনীর অবাধ বিচরণ গদ্য, কবিতা, নাটক, সঙ্গীত, সাংবাদিকতা - সৃষ্টির নানান আঙিনাতেই। কাগজের পাতায়, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রের পর্দায় বা পর্দার আড়ালে, আন্তর্জালের অলিগলিতে সর্বত্রই রেখেছেন তাঁর সৃষ্টিশীলতার সাক্ষর। তাঁর অন্যরকম ভাবনায় উঠে এসেছে মহাভারতের নতুন রূপ। প্রকৃতির বুকে নিয়ে গিয়েছেন মগ্ন এক নাট্য আয়োজনকে, নাট্যশিক্ষা প্রসারের জন্য আয়োজন করেছেন লোকনাট্যশিক্ষার থিয়েটার ট্যুরিজম। ভ্রমণ আর জীবনের রঙ্গমঞ্চকে মিলিয়ে দিয়েছেন এভাবেই । আসলে বেঁচে থাকা আর সৃষ্টিশীলতা তাঁর অভিধানে সম অর্থ বহন করে।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

= 'আমাদের ছুটি' বাংলা আন্তর্জাল ভ্রমণপত্রিকায় আপনাকে স্বাগত জানাই = আপনার বেড়ানোর ছবি-লেখা পাঠানোর আমন্ত্রণ রইল =

বেড়িয়ে এসে আপনার অভিজ্ঞতাগুলো যেমনভাবে শেয়ার করতে চান কাছের মানুষদের সাথে - ঠিক তেমনি করেই সেই কথাগুলো ছোট্ট করে লিখে পাঠিয়ে দিন ছুটির আড্ডায়। ছয় থেকে ছেষট্টি আমরা সবাই এই ছুটির আড্ডার বন্ধু। লেখা ডাকে বা নির্দিষ্ট ফর্মে মেল করে পাঠালেই চলবে। লেখা পাঠাতে কোনরকম অসুবিধা হলে ই-মেল করুন - admin@amaderchhuti.com

চিনাইবিলের সন্ধানে

এ.এস.এম. জিয়াউল হক

ছবির হাটে বসে বিকেলে আড্ডা দিচ্ছিলাম সবাই, এমন সময় জায়েদের ঘোষণা, "আগামীকাল সকালে ঢাকার বাইরে কোথাও থাকতে চাই", "কোথায়"? আমাদের সবার প্রশ্ন? "সিরাজীবাজার", জায়েদের ছোট্ট উত্তর। "সেটা আবার কোথায়"? ঢাকা থেকে সিলেট যাওয়ার পথে ছোট্ট একটি রেলওয়ে জাংশন, আশপাশে অনেক জঙ্গল এবং ছোট ছোট টিলা আছে। আগেরবার রেমা-কালেঙ্গা থেকে আসার পথে ওর নাকি চোখে পড়েছিল।
ব্যস, নতুন একটা জায়গা দেখার লোভ আমাদের পেয়ে বসল। তখনই ছবির হাট থেকে উঠে যার যার বাসায় রওনা হলাম রাতের ট্রেন ধরব বলে। সেই সূত্র ধরেই গত ২০ জুন চিনাইবিল থেকে ঘুরে এলাম আমরা ছ'জন।
৯:৫০ -এ ট্রেন, সবাই সময়মতো এলেও সম্রাট ভাই পারল না, শাহবাগের জ্যামে আটকা পড়ে গেছে। কী আর করা, আমরা পাঁচ জন : আমি, ফাহিম, জায়েদ, শান্তনু এবং ইমরান ট্রেনে উঠে পড়লাম। সম্রাট ভাই ফোনে জানাল, বাসে রওনা দিচ্ছে। ইতিমধ্যে ট্রেনে বসে আমরা আবিষ্কার করলাম, জায়গাটার নাম আসলে শাহজীবাজার এবং ট্রেন এই জংশনে থামে না। কিছুদূর গিয়ে শায়েস্তাগঞ্জ স্টেশনে নামতে হবে।
রাত ৩:১০ -এ ট্রেন আমাদের শায়েস্তাগঞ্জ নামিয়ে দিল। ইতিমধ্যে সম্রাট ভাই পৌঁছে গেলেন। ভোরের আলো একটু ফুটে উঠলে আমরা একটা টেম্পু ঠিক করলাম শাহজীবাজার, ওয়াবদার মোড় পর্যন্ত। ছোট ছোট টিলার পাশ দিয়ে রাস্তাটা খুবই সুন্দর। ভোর ৫:২৪ -এ পৌঁছে কাঙ্খিত শাহজীবাজার। সকালের নাস্তা করে একটু সামনে এগোতেই দেখলাম রেললাইনের সঙ্গেই রয়েছে ৩৬০ আউলিয়ার এক জন, হজরত শাহ্ সোলেমান ফতেহ আলী (রহঃ) এর মাজার।

চিনাই বিলের পথে

ভোর ৭:২৪ এ আমরা হাঁটা শুরু করলাম মাজারের উল্টো দিকের বাগানের রাস্তা ধরে। উঁচু-নিচু পাহাড়ি পথ এবং আগের রাতের বৃষ্টিতে জংলা জায়গায় জোঁক এবং সাপের ভয় থাকলেও আমরা হাঁটতে লাগলাম। ভোরের স্নিগ্ধ নিস্তব্ধতায় এবং আশপাশের সবুজ পরিবেশে হাঁটতে বেশ ভালো লাগছিল। কিছুক্ষণ পর আমরা একটা বড় ইঁটের রাস্তায় পড়লাম। দু'পাশে জঙ্গল এবং বাগানের এই রাস্তায় এত সকালে খুব কমই মানুষ দেখা যাচ্ছিল। অনেক পাখিরও দেখা পেলাম। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধে হাঁটার পর হঠাৎ ডানদিকে গাছের ওপরে শব্দ শুনে দেখি বেশ কয়েকটি বন মোরগ। জঙ্গলের এই বাসিন্দারা এত সকালে আমাদের দেখে হয়ত একটু বিরক্তই হয়েছে। আরও কিছুদূর হাঁটতেই বাগানের এক শ্রমিককে দেখতে পেলাম অনেকগুলো কাঠ পিঠে করে নিয়ে যাচ্ছে, তাঁর কাছ থেকেই প্রথম জানতে পারলাম চিনাইবিলের কথা।
আসলে এই অঞ্চলটিতে মূলত অনেকগুলো বাগান আছে। এর মধ্যে রয়েছে টী-স্টেট, রাবার বাগান, ইউক্যালিপটাস বাগান ইত্যাদি। তার ভিতরে ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে মানুষের বসতি। কিছুদূর সামনে এগোলেই আমরা পড়ব লালচান টি-এস্টেট এর সীমানায়। লালচান টি-এস্টেট বাংলাদেশের অনেক পুরনো একটি চা বাগান এবং এর উৎপাদিত অধিকাংশ চা পাতা রপ্তানি হয় যুক্তরাজ্য সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। প্রায় ২০০০ একর জায়গা জুড়ে এই টি-এস্টেট অবস্থিত। এখানকার ম্যানেজারের নাম ইস্কান্দার হাসান চৌধুরী, ভদ্রলোক খুবই মিশুকে। এই লালচান টি-এস্টেট-এর সীমানার মধ্যেই রয়েছে প্রাকৃতিক লেক, চিনাইবিল।
যাই হোক, হাঁটতে হাঁটতে একসময় পৌঁছে গেলাম লালচান টি-এস্টেট এর ফ্যাক্টরিতে। এখানে কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করলাম

চিনাইবিল এর উদ্দেশ্যে।

পথ

আশপাশের পরিবেশ এবং মানুষের ব্যবহার দেখে বুঝতে পারছিলাম, এখানে পর্যটকরা খুব একটা ঘুরতে আসে না। কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশের দিক থেকে এই জায়গাটি কিন্তু সুন্দর। এর মাঝে আমরা ছোট্ট একটি গ্রামে পৌঁছলে শুরু হোল তুমুল বৃষ্টি। সবাই ক্যামেরা বাঁচানোর জন্য পলিথিন প্যাক করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লে আমি আর সম্রাট ভাই সামনের দিকে হাঁটতে লাগলাম। তীব্র রোদের ভিতরে মুষলধারে বৃষ্টি, এক অদ্ভুত প্রাকৃতিক খেলা। ছোট্ট একটি টিলার পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একসময় পৌঁছে গেলাম চিনাইবিলের পাড়ে। চারপাশে ছোট ছোট পাহাড় আর তার মাঝে অপরূপ চিনাইবিল। একটি ছোট বাঁধ তৈরি করে বিলের পানিকে সেচের জন্য ব্যবহার করা হয়। শীতকালে এই বিলের পানিতে অনেক অতিথি পাখিও দেখা যায়।
গোসল করার জন্য বাঁধের পানিতে নেমে পড়লাম। প্রায় ঘণ্টা দুই পানিতে থাকার পর দুপুর বারোটার দিকে আবার হাঁটা শুরু করলাম। এবার যে পথে এসেছি সেই পথে না গিয়ে "গুচ্ছগ্রাম" এর দিকে এগোলাম। সেখান থেকে আরেকটু এগোতেই দুপুর ১:৩০ নাগাদ পৌঁছে গেলাম তেমুলিয়া বাজার। এখান থেকে টেম্পু এবং সিএনজি ছাড়ে শায়েস্তাগঞ্জ এর উদ্দেশ্যে। পথে লেকের আরও একটি শাখা চোখে পড়ল।
তেমুলিয়া বাজারে একটি ছোট্ট খাবারের হোটেলে বিশ্রাম নিলাম আমরা। সবাই ক্ষুধার্ত, কিন্তু ভাতের কোন ব্যবস্থা নেই। অতঃপর সিঙ্গারা, নিমকি এবং চা দিয়েই পেটপুজা করতে হোল। এরপর ব্যাকপ্যাক মাথায় দিয়ে সবার ক্লান্তি নেমে এল ঘুমের রাজ্যে।
দুপুর ২:৩০ নাগাদ আমরা টেম্পু নিয়ে রওনা হলাম শায়েস্তাগঞ্জ এর দিকে। রাস্তা খুবই বাজে। শায়েস্তাগঞ্জ নেমে ভাগ্যক্রমে ট্রেনে সিটও পেয়ে গেলাম। যথারীতি ট্রেনের সিটে বসা মাত্র আবার ঘুম এবং একেবারে ঢাকা।

চিনাই বিল

চমৎকার একটি ডে-ট্রিপ এর জন্য চিনাইবিল সত্যিই খুব ভালো জায়গা। বিশেষ করে বার্ড ওয়াচারদের জন্য এটি আদর্শ। তবে অবশ্যই হাঁটার মানসিকতা নিয়ে যেতে হবে। বাগানের ভিতরে কোন পাবলিক ট্রান্সপোর্ট নেই। কিছু শুকনো খাবার এবং পানি সঙ্গে রাখতে হবে। ম্যানেজারের অনুমতি সাপেক্ষে রাতে ক্যাম্পফায়ারও করা যাবে।
ঢাকা থেকে ট্রেনে অথবা বাসে করে চলে যাবেন শায়েস্তাগঞ্জ। সেখান থেকে টেম্পু বা সিএনজি নিয়ে শাহজীবাজার। উল্টোভাবে তেমুলিয়া বাজার দিয়েও যেতে পারেন। তবে শাহজীবাজার যাওয়ার রাস্তাটা খুব সুন্দর। শাহজীবাজার নেমে বামের রাস্তা ধরে হাঁটলে একসময় একটি গেট পাবেন। সেটার ডান পাশ থেকেই জংলা ট্রেইল চলে গেছে বাগানের ভিতরে। বড় রাস্তায় পড়লে বাগানের যে কাউকে লালচান টী-এস্টেট অথবা চিনাইবিল-এর কথা জিজ্ঞেস করলেই রাস্তা দেখিয়ে দেবে।

ভ্রমণপ্রেমী জিয়াউলের স্বপ্ন সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়ে প্রকৃতি আর বিভিন্ন ধরনের মানুষের জীবনের সঙ্গে পরিচিত হওয়া।

কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00
Like Be the first of your friends to like this.
tell a Friend

একটুকরো ডুয়ার্স

ঔরব দে

পুজোর ছুটিতে দশমীর দিন বেরিয়ে পড়েছিলাম ডুয়ার্সের উদ্দেশে। সকালে শান্তিনিকেতন থেকে ব্যাণ্ডেল পৌঁছে তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেসে পরেরদিন আলিপুরদুয়ার। স্টেশন থেকে গাড়ি ভাড়া করে ৩৮ কিমি দূরে রাজাভাতখাওয়া পৌঁছলাম। আমাদের রাতের বাসস্থান সংলগ্ন মামনি ট্রেকারস হাট। দুপুরে নেচার ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার ঘুরে রসিকবিল পাখিরালয়। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবটা চোখে বেশ পীড়া দিল। ব্রিজ পেরোতে গিয়ে চোখে পড়ল নদীর জলে আবর্জনা ভাসছে। আগে এখানে বোটিং-এর ব্যবস্থা ছিল, এখন বন্ধ আছে। মিনি চিড়িয়াখানায় দেখা মিলল হরিণ আর চিতাবাঘের। রসিকবিল থেকে ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে এল। ফেরার পথে অরণ্যের মধ্যে গাড়ি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। হেডলাইটের আলোয় দেখি রাস্তা পার হচ্ছে একদল হাতি!

বক্সা ফোর্ট

পরদিনের গন্তব্য জয়ন্তী। জয়ন্তী যাওয়ার পথেও চোখে পড়ল হাতির দল গাছের ডাল ভেঙে পাতা চিবোচ্ছে। ভুটান পাহাড়ের নীচ দিয়ে জয়ন্তী নদী বয়ে চলেছে। নদীতে জল ছিল না। শুকনো খাতে নানা আকারের নুড়ি পাথরের মেলা। জয়ন্তী থেকে গেলাম বক্সা ফোর্ট দেখতে। সান্তারাবাড়ি পর্যন্ত গাড়ি। পোর্টারের কাছে মালপত্র দিয়ে আমরা হাঁটা শুরু করলাম। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ঘন্টার শব্দের মত এক ধরনের পোকার আওয়াজ শুনতে পেলাম। চার কিলোমিটার চড়াই পেরিয়ে পৌঁছলাম রোভার্স ইন-এ। এখানেই থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। দ্বিপ্রাহরিক আহার সেরে আরও এক কিলোমিটার রাস্তা উঠে বক্সা ফোর্ট। ফোর্টের ভাঙাচোরা কয়েকটা দেওয়াল এখনও পুরোনো ইতিহাসের সাক্ষ্য বহণ করছে। ভেতরে গাছের ডালে বসে রয়েছে একজোড়া ধনেশ পাখি। ফোর্টের বিপরীতে সবুজ পাহাড় চোখ টানল অনেকক্ষণ।

সন্ধ্যেবেলা নেমে এলাম হোটেলে। মালিক ইন্দ্রশঙ্কর থাপা আমাদের নিয়ে গেলেন হোটেলের পিছনে তাঁর নিজের হাতে তৈরি ভিউপয়েন্টে। সেখানে অনেক রাত অবধি চলল আড্ডা। নিজেই গান গেয়ে, নেচে, গল্প শুনিয়ে আড্ডা জমিয়ে তুললেন রীতিমতো।

পরদিন সকালে বক্সা পাহাড় থেকে নেমে রওনা দিলাম জলদাপাড়ার দিকে। পথে রায়মাটাং নদী দেখে জলদাপাড়া পৌঁছতে দুপুর হয়ে গেল। সেদিন আর কোথাও যাওয়া গেল না। প্রায় তিনঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে জিপ সাফারির টিকিট পেলাম। সকাল সাতটায় জিপ সাফারি শুরু হল। হলং বাংলোর সামনে দুটো গন্ডার চোখে পড়ল। আরও এগিয়ে একটা হরিণ আর একটা ময়ূর ছাড়া পুরো সাফারিতে আর কোন জন্তু চোখে পড়ল না।

হোটেলে ফিরে ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়ে পড়লাম খয়েরবাড়ি রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারের দিকে। খাঁচার ভেতরে বাঘ-চিতাবাঘ দেখে গরুমারা অভয়ারণ্যের পথে পাড়ি দিলাম। রাস্তায় চোখে পড়ল নানান চা বাগান। দুপুর একটা নাগাদ গরুমারা পৌঁছালাম। এখানে আমাদের ঠিকানা লেক ভিউ রিসর্ট। দুপুর তিনটে নাগাদ জিপ সাফারি শুরু হল - একটা গাড়িতে ছ'জন করে ধরে। ধীরে ধীরে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করলাম। কিন্তু দু'ঘন্টা অরণ্য সফর করেও এক ময়ূর ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না।

পরদিন সকালে মূর্তি নদীর ধারে কিছুক্ষণ কাটিয়ে ফিরে চললাম শিলিগুড়ির দিকে।

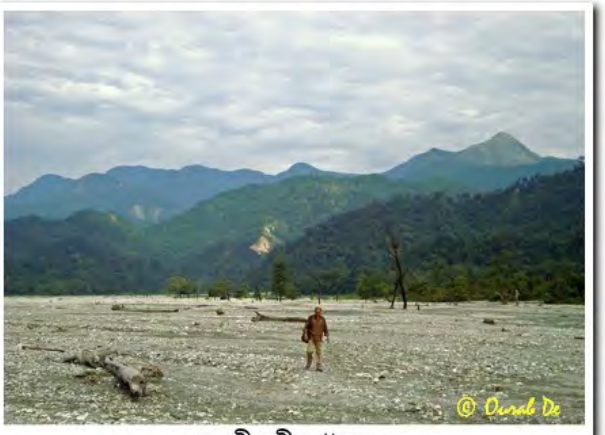

জয়ন্তী নদীর খাতে

~ ডুয়ার্সের তথ্য ~ ডুয়ার্সের আরও ছবি ~

ইঞ্জিনিয়ারিং-এর তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ঔরব দে ভালোবাসেন বেড়াতে।